ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত
ব্যাঙাচি
ষষ্ঠ সংখ্যা
অক্টোবর ২০২০ । ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭
গুজব

ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক অনলাইন প্লাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য বাঙালী সমাজ থেকে বিজ্ঞানের নামে ছড়ানো অপবিজ্ঞানকে সমূলে উতপাঠন করা এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার।

আমরা কট্টরপন্থী বিজ্ঞানের সৈনিক।

আমাদের-

ফেসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/groups/bcb.science/

ফেসবুক পেইজ: https://www.facebook.com/bcb.bangachi

ওয়েবসাইট: https://bangachi.com

ইমেইল: contact@bangachi.com

টুইটার: https://twitter.com/bcb_bangachi

অক্টোবর ২০২০ ।। আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭

প্রথম বর্ষ ।। সংখ্যা ০৬

সম্পাদক: তানভীর রানা রাব্বি।

সহ-সম্পাদক: মাহতাব মাহদী, জয়শ্রী রায় পুজা।

সম্পাদনা সহযোগী: ইমদাদুল হক আফনান, নাসিম আহমেদ, আসিফ আফতাব সোহাগ, টিম ব্যাঙাচি

লে-আউট ডিজাইন: রায়হান, প্রজেশ দত্ত ।

প্রচ্ছদ অঙ্কন: মেহরাব সাবিত সিদ্দিকী।

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী, সমুদ্র জিত সাহা।

প্রকাশনী: ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান।

ব্যাঙাচি আমাদের বিসিবির সন্তান। প্রতিমাসে বিসিবির সেরা লেখা গুলো নিয়ে এই ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হয় যা আপনাদের ভালোবাসায় অব্যহত রয়েছে। আপনারাও চাইলে কাজ করতে পারবেন আমাদের সাথে। যোগাযোগ করুন উপরে উল্লিখিত মানুষগুলোর যে-কারো সাথে বা আমাদের এই ই-মেইলে, contact@bangachi.com ।

লেখা পাঠাতে চাইলে উপরের ই-মেইলে নিজের নাম সহ আপনার আর্টিকেলটি পাঠিয়া দিন।

সম্পাদকীয়......

ধরা যাক, আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কি জানেন 'গুজব' বলে কোনো শব্দ আসলে অভিধানে নেই?" উত্তরে কী বলবেন?

আপনার উত্তর যদি হয়, "তাই নাকি! এখন কী হবে?" তাহলে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, যারা গুজবে কান দেয় বা গুজব ছড়ায় আপনি তাদের মধ্যেই একজন। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মনােবল ভেঙে দেওয়া এবং নিজস্ব বাহিনীর মনোবল, উৎসাহ এবং তেজ বাড়ানোর জন্য সুকৌশলে গুজব রটানো হত। তবে হালের আলাােচিত বিষয় সামাজিক গুজব এবং সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর গুজব। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকেও ছাড়া হয়নি। মানুষের মুখে রটানো মিথ্যা গল্পকে 'গুজব' বলেলে অনেক ক্ষেত্রে 'ভুল তথ্য' এবং 'অসঙ্গত তথ্য' এই দুইকে বোঝাতে 'গুজব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেটা বর্তমান সাােশ্যাল মিডিয়াতে হরহামেশাই চোখে পড়ে।

১৯৯০ সালের দিকে আফ্রিকান-অ্যামেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তখন 'Tropical Fantasy' নামে বাজারে একটা কোমল পানীয় বের হয়। এটি বাজারে আসার সাথে সাথে গুজব রটে যায় যে এই পানীয় খেলে কৃষ্ণাঙ্গরা বন্ধ্যা হয়ে যাবে। এই গুজবের কারণে ওই পানীয়টির ৭০ শতাংশ বিক্রি কমে যায়। এমনকি মানুষ ওই পানীয় সরবরাহকারীর ট্রাকের ওপর হামলাও করেছিল বেশ কয়েকবার।

একটি গুজবের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, এটা কোনো মানুষের মতামত না হয়ে কোনো তথ্য সংক্রান্ত বিবৃতি হবে। গুজবটি প্রচারযোগ্য হতে হবে। গুজব এমন হবে, যেখানে মানুষ যা জানতে চাইছে তার উত্তর সেটার মধ্যে আছে। প্রাসঙ্গিকতা থাকায় সেসব তথ্যকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভাববে এবং গুজবটি হতে হবে অনিশ্চিত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য। অর্থাৎ, যা যাচাই-বাছাই করা সম্ভব নয়। এসকল বিষয়গুলো কোনো গুজবের মধ্যে থাকলে সেটা ছাড়ানোর প্রবণতা অতি।

ঠিক তখন পরিস্থিতি যদি হয় অনিশ্চিত, মনের মধ্যে যদি উদ্বেগ কাজ করে, সঠিক সত্য পাওয়া থেকে যদি মানুষ বঞ্চিত থাকে, তখনই সেই গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সঠিক সত্য তথ্য থেকে যাতে মানুষ বঞ্চিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে এবারের ব্যাঙাচি 'গুজব' সংখ্যা। তো তাহলে দেরি না করে ঝাপিয়ে পড়ুন গুজব খণ্ডনের দুনিয়ায়।

তানভীর রানা রাব্বি

সম্পাদক, ব্যাঙাচি

ব্যাঙাচিকে সুন্দর এবং বিশুদ্ধরূপে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যারা অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন বানান সংশোধনে এবং ভূমিকা রেখেছেন তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে- তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বানান সংশোধনের সেনাপতিগণ

নাবিলা তাসনিম

রাকিন শাহরিয়ার

এ আর মুবিন

মুস্তফা কামাল জাবেদ

রাহুল খান

আবু রায়হান

বানান সংশোধনের সহযোগী যোদ্ধা

জাহিদুর রহমান
আফীফাহ্ হক মীম
মুশফিকুর রহমান
রাশেদা নাসরিন সুমনা
রিজুফা জামান শোভা
আদিন নুর
নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য
রওনক শাহরিয়ার আকাশ
স্বপ্নীল জয়ধর
সব্যসাচী দাশ নির্ঝর
তাসনিম বিনতে সাইফ
নিবেদিতা রায় নিতু
মুনতাসির রহমান তামিম
রাজীব সূত্রধর
ফারিয়া আরেফিন মালিহা
আজমল ফুয়াদ হামযাহ্
দিগন্ত ইসলাম
আশরাফুল ইসলাম

আমাদের ব্যাঙাচি পরিবারের বাকী সদস্যগণ যারা আমাদের ব্যাঙাচির বড় হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন নিয়েছেন, আমাদের সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন এবং ব্যাঙাচিকে এই রূপে আপনাদের সামনে এনেছেন, তাদের প্রতিও অসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আপনি যদি কাজ করতে যান আমাদের সাথে তাহলে সম্পাদক বা প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করুন। লে-আউটের জন্য আমাদের টিমে লোক প্রয়োজন। আর বানান সংশোধনে নিজেকে যদি মনে করেন দক্ষ তবে আমাদের বানান সংশোধনের সেনাপতিদের সাথে যোগাযোগ করুন। ম্যাগাজিন পড়ে অবশ্যই রিভিউ দিবেন। আপনাদের রিভিউ, আমাদের পরিশ্রমের প্রেরণা।

সূচিপত্র

আত্মার ওজন

নাঈম হোসেন ফারুকী

ডক্টর ম্যাকডুগাল ১৯০৬ সালে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে আত্মার ওজন ২১ গ্রাম। তাছাড়া তিনি এ-ও প্রমাণের চেষ্টা করেন, মানুষের আত্মা আছে, অন্য প্রাণীদের নেই।

তাঁর পরীক্ষার জন্য দরকার ছিল এমন সব রোগী ঁযাঁরা মৃত্যুর সময় খুব কম নড়াচড়া করবেন। ছয়জন মৃতপ্রায় মানুষ বেছে নেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে চারজন যক্ষ্মা রোগী, একজন ডায়াবেটিসের রোগী, আরেকজন অজানা রোগের। মৃত্যুর আগে আগে এঁদের একটা ওজন মাপার মেশিনে ওঠানো হয়।

মানুষের পরীক্ষার পর তিনি পনেরোটা কুকুরের ওপরও পরীক্ষা চালান। তাঁর পরীক্ষার উপযুক্ত কুকুর তিনি পাননি। ধারণা করা হয়, তিনি কুকুরদের বিষ খাওয়ান।

ফলাফল:

একজন মানুষ মৃত্যুর সময় ২১ গ্রামের মতো ওজন হারান। একজন প্রথমে ওজন হারান কিন্তু পরে তাঁর ওজন বেড়ে যায়। দুজন মৃত্যুর সময় ওজন হারান, কিন্তু পরে আরও বেশি ওজন হারান। এই ডেটা তিনি নিজেই বাদ দেন পরীক্ষার ত্রুটির জন্য। কুকুরদের তেমন কোনো ওজন হারাতে দেখা যায়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় ঘামের হিসাব বাদ দেওয়া হয়েছে ম্যাকডুগালের পরীক্ষা থেকে। ম্যাকডুগাল যন্ত্রে শুয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দেখেছেন, ওজনের তেমন কোনো হেরফের হয়নি। তাই মৃত্যুর সময় বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের ওজন সামান্য ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

ফিজিশিয়ান অগাস্টাস ক্লার্ক ম্যাকডুগালের পরীক্ষার ব্যাখ্যা দেন এরকমভাবে : মৃত্যুর সময় লাংসের কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শরীরের কুলিং সিস্টেম ফেইল করে। তাই মৃত্যুর সময় ঘামের পরিমাণ বেড়ে যায়, যেখান থেকে ২১ গ্রামের হিসাব আসে। কুকুরদের ঘর্মগ্রন্থি না থাকায় তাদের কপালে আত্মা না থাকার অপবাদ জোটে। তাছাড়াও একেকজনের একেক রকম ডেটা, মাত্র ছয়জনের ওপর এক্সপেরিমেন্ট, তার ওপর দুইটা ডেটা বাদ দেওয়া, এসব কারণে ম্যাকডুগালের এক্সপেরিমেন্ট সায়েন্টিফিক কমিউনিটির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

টেলিপ্যাথেটিক

জাভেদ ইকবাল

ফেইসবুকে কিছুদিন পরপর নতুন হুজুগের আবির্ভাব হয়। সাম্প্রতিক হুজুগ টেলিপ্যাথি, প্যারাসাইকোলজি ইত্যাদি। এগুলোর পক্ষে দুটো গল্প খুব চলছে।

প্রথম গল্প, অ্যামেরিকার কোনো এক হাসপাতালে ক্যারোলিন নামে এক মহিলা এসে জোসেফ নামে এক লোকের খবর চায়। তারপর দেখা যায়, জোসেফ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে, কিন্তু মহিলা সেটা আগেই টের পেয়েছিল। এই ধরনের সব গল্পের মতোই, ‘কোনো এক হাসপাতালে’ এই ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালের নাম বলা হয় না। কারণ নাম দিলেই ধরে ফেলার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আজব ব্যাপার, ফেইসবুক বা ক্রিপি-পাস্তা টাইপের ওয়েবসাইট বাদে আর কোথাও এই গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেন? কারণ গল্পটা ভুয়া। যদি সত্যি হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য কোনো সূত্র ধরে কাহিনিটা বলা হতো।

দ্বিতীয় গল্প মার্ক টোয়েনকে নিয়ে।

মার্ক টোয়েন টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করতেন। এটুকু সত্যি। মার্ক টোয়েন আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে মানসিক যোগাযোগ ছিল; তাঁরা একে অন্যের অসম্পূর্ণ বাক্য শেষ করতে পারতেন, একে অন্যের কথা মনে করলে সপ্তাহখানেক পরেই চিঠি পেতেন। সেগুলোর বর্ণনা একটা ফেইসবুক গ্রুপে ছিল, সেটার স্ক্রিনশটেই কেন এমন হয় সেটার ব্যাখ্যা দিয়েছি।

মার্ক টোয়েনের আরেকটা বিখ্যাত ঘটনা, যেটা তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে; তার বন্ধু ও প্রাক্তন সহকর্মী ড্যান ডি কুইল, যাঁর সাথে ৬৬ বছর দেখা/কথা হয়নি, তাঁর কাছ থেকে একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া নিয়ে, যে বিষয়ের ওপরে টোয়েন নিজেই কাজ করছিলেন। সমস্যা হচ্ছে :

ক) টোয়েন এই ঘটনার সাক্ষী মেনেছেন এক লেখায় নিজের স্ত্রীকে, অন্য লেখায় অন্য এক আত্মীয়কে।

খ) দুই লেখায় উল্লিখিত তারিখের তফাতও আছে।

গ) ড্যান ডি কুইলের সাথে তাঁর ৬৬ বছর দেখা বা কথা হয়নি, সেটা প্রমাণিত মিথ্যা কথা।

ঘটনা হচ্ছে, মার্ক টোয়েন আর ড্যান কুইল মিলে একটা বই লিখছিলেন। এটা মার্ক টোয়েনের তাঁর বইকে বর্তমান সময়ের ভাইরাল করার বা হাইপ তৈরি করার চেষ্টা ছিল বলে সন্দেহ করা হয়, কারণ

তিনি একেকবার একেক কথা লিখেছেন এই ঘটনা নিয়ে।

এটাকে টেলিপ্যাথির প্রমাণ বলার কোনো অবকাশ নেই।

Some of the Bonanza business as Twain narrated it does not prove out. A copy of the letter Twain sent in reply to De Quille's letter survives. His dates are off. He tells De Quille his wife, Livy, was there when the mail came; in the magazine piece, Twain's witness is another relative. Those are peccadillos. Less so the pretense that he had not seen and had hardly thought of De Quille for eleven years" and did not even know if De Quille was alive. "That's fudged," said Mac Donnell. "He knew how to create buzz; how to quicken plot."

আরও পড়ুন

জিহ্বার স্বাদ
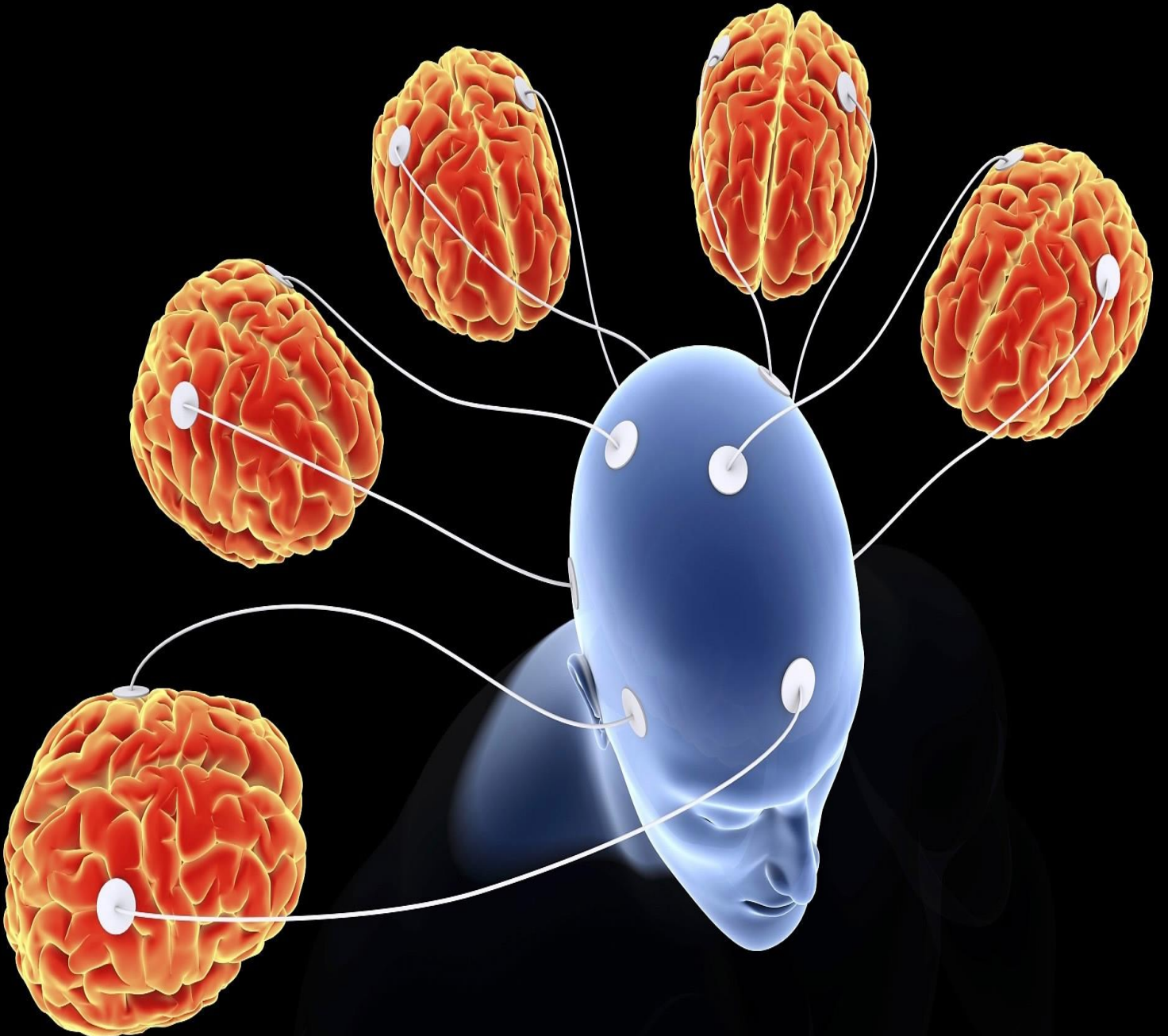
আবু রায়হান

“জিহ্বার নির্দিষ্ট কোনো অংশ নির্দিষ্ট কোনো স্বাদগ্রহণে সাহায্য করে।”

আমাদের মাঝে এই ভুয়া তথ্যটা খুব প্রচলিত। হাইস্কুলের বিজ্ঞান বইয়ের Tongue ম্যাপে টেস্ট বাড ও টেস্ট রিসেপ্টরের উপস্থিতির ভিত্তিতে জিহ্বাকে মোট ৩ থেকে ৪টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

তথ্যটা কোথাও কোথাও কিছুটা এভাবে রটেছে : জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের taste bud বা স্বাদ কোরক/কুঁড়ি থাকে। যেমন : জিহ্বার

সামনের অংশে মিষ্টি, শেষের অংশে টক এবং দুই পাশে যথাক্রমে নোনতা ও তিক্ত/তিতা স্বাদের টেস্ট বাড ও রিসেপ্টর থাকে।

আবার কোথাও বলা আছে, “জিহ্বার সামনের অংশে মিষ্টি/নোনতা, দুই পাশে টক, পেছনের অংশে তিতা স্বাদ কোরক থাকে। মাঝখানে স্বাদ কোরক না থাকায় আমরা জিহ্বার মাঝখানটায় কোনো বিশেষ স্বাদ পাই না।”

৬ষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠায় এমনই লেখা আছে। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক এর বইগুলোতেও এমনটা লেখা আছে।

এ তথ্যটা ভুল। এটা প্রায় শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে প্রচলিত একটা মিথ। প্রকৃতপক্ষে জিহ্বার বিভিন্ন অংশ

(জিহ্বার সামনের/পেছনের/দুই পার্শ্ব) একইসাথে বিভিন্ন রকম স্বাদ ডিটেক্ট করতে পারে; জিহ্বার কোনো নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কোনো স্বাদ ডিটেক্ট করে এমন নয়। তাছাড়া বলা হয়েছে জিহ্বার মাঝের অংশে কোনো টেস্ট বাড বা স্বাদ কোরক নেই যা আরেকটি ভুয়া কথা। জিহ্বার সমস্ত অংশেই টেস্ট বাড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাছাড়া কেবল জিহ্বা নয়, জিহ্বার ওপরের দিকে কোমল তালুতে এবং গলার দিকেও টেস্ট বাড পাওয়া যায়।

জিহ্বার প্রতিটি অংশেই বিভিন্ন ধরনের স্বাদ কুঁড়ি বা টেস্ট বাড মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। মানুষ জিহ্বার সব অংশই সকল রকম স্বাদ নিতে পারে। তবে টেস্ট বাডের উপস্থিতি জিহ্বার এক অংশের চেয়ে আরেক অংশে কম-বেশি হতে পারে এবং একই টেস্ট বাড জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে থাকতে পারে, সেই কারণে স্বাদেরও তারতম্য ঘটতে পারে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে টেস্ট বাডসমূহের ক্রিয়া, ঘনত্বের মাঝে পার্থক্য থাকতেই পারে।

যেমন : মিষ্টি স্বাদের প্রতি সেন্সিটিভিটির ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু মহিলারা জিহ্বার অগ্রে টক স্বাদের প্রতি ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি সেন্সিটিভ।

আমাদের পুরো জিহ্বাতে প্রায় ৮ হাজারটি টেস্ট বাড আছে যেগুলো বিভিন্ন প্রকার টেস্ট গ্রহণে সক্ষম। বিভিন্ন টাইপ টেস্ট রিসেপ্টর কোষে মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করছে।

প্রচলিত ভুল চিত্র
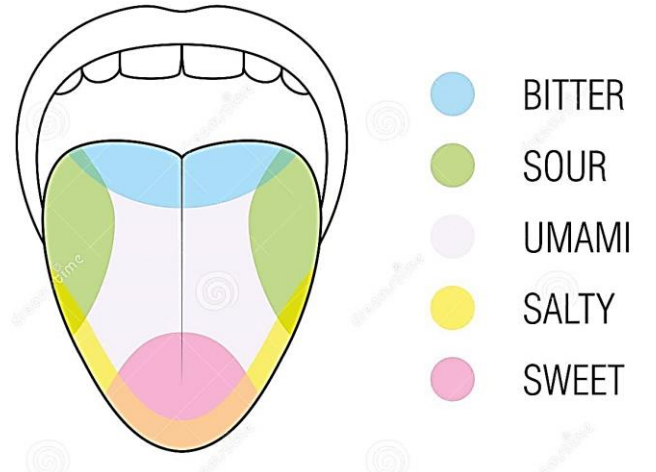
অর্থাৎ, জিহ্বার নির্দিষ্ট কোনো অংশে কোনো নির্দিষ্ট টেস্ট বাড ও টেস্ট রিসেপ্টর অবস্থান করে না; বরং পুরো জিহ্বাতেই বিভিন্ন প্রকার টেস্ট বাড এবং

তাতে থাকা বিভিন্ন প্রকার টেস্ট রিসেপ্টরগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে। তার মানে জিহ্বার নির্দিষ্ট কোনো অংশ কোনো নির্দিষ্ট টাইপ স্বাদ গ্রহণ করে না; বরং জিহ্বার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম।

তাছাড়া ভুয়া তথ্যমতে, ,জিহ্বার সামনে বাম পাশে নোনতা স্বাদ পাওয়ার কথা, কিন্তু আপনি যদি জিহ্বার পেছন দিকে বা জিহ্বার যে-কোনো সাইডেই লবণ রেখে দেখেন তাহলে খেয়াল করে থাকবেন যে সব সাইডেই নোনতা স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়া আপনি আপনার জিহ্বার পেছন দিকে একটু চিনি রেখে দেখেন, সেখানেও মিষ্টি স্বাদ পাবেন; ওসব ভুয়া তথ্যমতে সেখানে আপনার কোনো মিষ্ট স্বাদ পাওয়ারই কথা না। (এখনই লবণ জিহ্বার বিভিন্ন অংশে রেখে কথাটার সত্যতা যাচাই করে নিন।)

পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়া মিথ

নাঈম হোসেন ফারুকী

পৃথিবী ঘোরা সত্ত্বেও আমরা পড়ে যাই না কেন?

পৃথিবীর বিষুবীয় ব্যাসার্ধ, r = 6,378 km. পরিধি 2πr = 40,074 km = 40,074 x 1,000 m

এই দূরত্ব পৃথিবী অতিক্রম করে 24 ঘণ্টায় = 86,164 সেকেন্ডে।

তার মানে পৃথিবীর রৈখিক বেগ = 40,074 x 1,000 m / 86,164 s = 465.1 ms-1

তাহলে কেন্দ্রবিমুখী ত্বরণ,= v2/r = (465.1)2/(6,378 x 1,000) = 0.0339 m/s2

এর তুলনায় অভিকর্ষজ ত্বরণ g = 9.81 ms-2 প্রায়

9.81/0.0339 = 289.38 গুণ বেশি শক্তিশালী।

তাই আমরা ছিটকে পড়ি না।

প্যারিডোলিয়া

আবু রায়হান

১.
রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, হঠাৎ মেঘের দিকে তাকিয়ে যেন অবিকল একটি হাতির শুঁড় দেখতে পেলেন! বাজার থেকে সবজি কিনে এনেছেন, হঠাৎ তার মধ্যে কোনোটিতে চোখে পড়ল মানুষের শরীরের আকৃতি! এমনকি কড়াইতে ডিম ভাজতে গিয়ে দেখলেন সেখানে যেন মানুষের মুখের একটি অবয়ব ফুটে উঠেছে!
এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই আমরা হরহামেশাই। বেশিরভাগ মানুষই এসব ঘটনাকে ‘কাকতালীয়’ বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কেউ কেউ ভাবতে বসেন এর ব্যাখ্যা নিয়ে।

২.
আবেগপ্রবণ বা ভাবপ্রবণ হয়ে এলোমেলো, এলোপাথাড়ি, কাকতালীয় বা অর্থহীন কোনো তথ্য থেকে কোনো অর্থপূর্ণ নিদর্শন খোঁজার প্রবণতাকে বা শুধু অনুভূতির ভিত্তিতে অসংশ্লিষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত নয় এমন কিছু ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিল খুঁজে পাওয়াকে মনোবিজ্ঞানীরা এক ধরনের সাময়িক মনোবৈকল্য বলে ভাবেন।
‘সম্পর্কহীনতার অর্থপূর্ণতা’ খোঁজার এই প্রবণতাকে বলা হয় “অ্যাপোফেনিয়া” (Apophenia)। এটা অনেকটা বাংলা প্রবাদের 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'-এর ভ্রমকে সত্য মনে করে রজ্জু বা দড়িকে সাপ ভেবে নেওয়ার মতো। আবার অ্যাপোফেনিয়ারই একটু অংশ, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা, বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় থেকে আমরা যে সকল অর্থপূর্ণ কোনো ইঙ্গিত বের করে ফেলি এবং সেটিই বিশ্বাস করতে শুরু করি, সেই কৌতূহল প্রবণতাকেই বলা হয় 'প্যারিডোলিয়া' (Pareidolia), যা দুটি গ্রিক শব্দ ‘Para’ (যার অর্থ ‘পরিবর্তিত’) এবং ‘eidolon’ (যার অর্থ ‘আকৃতি বা অবয়ব’) নিয়ে গঠিত।
বিশেষত ছবি বা শব্দ থেকে অস্পষ্ট কোনো নিদর্শনকে স্পষ্ট বলে মনে করা হলো প্যারিডোলিয়া। এতে ভ্রান্তি, বিভ্রম ও ভুল উপলব্ধিকেই সত্য দাবি করার এক ধরনের গোঁয়ারতুমি দেখা যায়।

৩.
এর সহজতম উদাহরণ পাওয়ার জন্য একটি বৃত্ত আঁকুন। তার ভেতর দুইটি ছোটো বিন্দু আঁকুন ও নিচে আড়াআড়িভাবে একটি দাগ দিন। ব্যস, হয়ে গেল ‘মানুষের মুখ’! কোনো ছোটো শিশুকেও যদি মানুষের মুখ আঁকতে বলা হয় সেও সম্ভবত এভাবেই আগে আঁকবে। অথচ সত্যিকার অর্থে এই বৃত্তের সঙ্গে মানুষের চেহারার তেমন কোনো মিল নেই। তারপরও এমন আকৃতি দেখলে মানুষের মুখ ছাড়া আর কোনো কিছুই মাথায় আসবে না।

৪.
আকাশে যখন মেঘের মিলন হয় তখন আমরা খুবই অদ্ভুত একটি কাজ করি। সেটি হচ্ছে মেঘের হাজারো-লক্ষ আকৃতির মাঝে নিজের কল্পনায় আসা আকৃতিটি খুঁজে বেড়ানো। মেঘ-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো না কোনো অবয়ব খোঁজার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে পেয়েও

যাই। মুখের আকৃতি, ঘোড়ার আকৃতি, ড্রাগনের আকৃতি, হাতের ইশারা, কোনো শব্দ, সংখ্যা, প্রতীক, বাংলা অথবা ইংরেজি অক্ষর, মানুষের মুখ, হাসিমুখ, গোমড়া মুখ ইত্যাদি কত কিছুই না মিলিয়ে ফেলি।
মজার বিষয় হচ্ছে যে মাঝে মাঝে অবয়বগুলো এতটাই স্পষ্ট হয়ে যায়, যেন মনে হয় প্রকৃতি সত্যিই আমাদের সাথে মজা করছে। কিন্তু আসলে এগুলো প্রকৃতির সহজাত সৃষ্টি। বলতে পারেন এক ধরনের ধোঁকা!
প্যারিডোলিয়া নিয়ে এযাবৎকালে বৃহত্তম গবেষণা চালাচ্ছে জার্মানির গবেষণা প্রতিষ্ঠান অনফর্ম্যাটিভ। টেক জায়ান্ট গুগলের সহায়তায় ‘গুগল ফেইসেস’ নামে এ গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে গুগল ম্যাপস। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন স্থান খুঁজে যাবতীয় প্রাকৃতিক প্যারিডোলিয়া একত্রিত করা হচ্ছে এর আওতায়। এছাড়াও প্রতিদিন বিশ্বের আনাচেকানাচে আবিষ্কৃত অদ্ভুত সব প্যারিডোলিয়া সংগ্রহে রাখা হচ্ছে।

৫.
গত বছর একটি চিকেন নাগেটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মুখাবয়ব ফুটে উঠেছিল, যা পাঁচ হাজার পাউন্ডেরও বেশি দামে নিলামে বিক্রি হয়। বছর দশেক আগে ভারতের ব্যাঙ্গালুরে একটি রুটিতে যিশুর চেহারা দেখা গিয়েছিল, যা দেখতে ওই বছর ব্যাঙ্গালোরে হাজির হয়েছিলেন ২০ হাজারেরও বেশি ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান। পিঠার মধ্যে দেখা গেছে মাদার তেরেসার মুখ। এমনকি কিছুদিন আগে ব্রিটেনের সোয়ানসির একটি সাধারণ বাড়ি সামাজিক মিডিয়ায় আলোড়ন তুলেছিল, যার জানালা-দরজা-ছাদের গঠন দেখে অ্যাডলফ হিটলারের কথাই মনে পড়ে। এছাড়া কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেতলিতেও হিটলারের অবয়ব দেখা গিয়েছিল! ১৯৯৪ সালে তো যুক্তরাষ্ট্রের এক নারী টোস্টে কামড় দিয়ে শিল্পী ম্যাডোনার অবয়ব দেখতে পেয়েছিলেন, যা তিনি সংরক্ষণ করে রাখেন আরও দশ বছর।

৬.
এর বাইরেও গাছপালায়, পাথরে, পাহাড়ে, মাটিতে প্যারিডোলিয়ার প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পেরুর মার্কাওয়াসিতে মানুষসহ নানা জীবজন্তুর আকৃতির পাথরের অভাব নেই। ফ্রান্সের এবিহেন্স পর্বতমালায়ও মানুষের মুখের আকারের পাহাড়-চূড়া দেখা যায়। স্যাটেলাইট থেকে তোলা সাগর-মহাসাগরের অনেক ছবিতে মানুষ, পশুপাখির ছবি দেখা যায়।
এছাড়া ১৯৭৬ সালে ভাইকিং ওয়ান মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের ছবি তুললে তাতে অবিকল মানুষের মুখাবয়ব দেখা যায়, যা বিজ্ঞানীদের হতভম্ব করে দেয়। মূলত, সে সময় থেকেই তারা জরুরিভাবে প্যারিডোলিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তীতে পৃথিবীতেও একইভাবে প্যারিডোলিয়ার বিভিন্ন নমুনা খুঁজে পেয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন, ব্যাপারগুলো নিছক কাকতালীয় নয়।

৭.
গুগল ফেইসেসের প্রধান সেড্রিক কাইফারের মতে, “প্যারিডোলিয়া এতই আসল যে একে কাকতালীয় পর্যায়ে ফেলার কোনো যুক্তি নেই। এর আরও গূঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে।”
কিন্তু কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? কেনই বা মস্তিষ্ক তুচ্ছ সব জিনিসকে রীতিমতো জ্যান্ত করে চোখের

এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?
হাভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. নুচিন হাজিখানির মতে, "এটি বিবর্তনের ফল। জন্ম

থেকেই মানুষ এরকম বিশেষ কিছু প্যাটার্ন শনাক্ত করতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। এসব ক্ষেত্রে নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতাও তেমন কাজে লাগায় না মস্তিষ্ক, অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। হোক তা ঠিক বা ভুল।"

সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ফ্রেঞ্চ জানান, "প্যারিডোলিয়ার রহস্য লুকিয়ে আছে লাখ লাখ বছর আগের প্রাচীন মানুষদের মধ্যে। তাদের বেঁচে থাকার জন্য এটি প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতিকূল পরিবেশে থাকার কারণে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে তাদের হিংস্র প্রাণী থেকে সতর্ক থাকতে হতো। মাটির কোনো দাগকে বাঘের পায়ের ছাপ মনে হলে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করতে হতো তাদের। কিংবা কোনো ঝোপঝাড় দেখে হঠাৎ হিংস্র পশু বলে মনে হতো।প্রাচীন মানুষের বুদ্ধিমত্তা তখনো পরিণত না হওয়ায় এসবকেই তারা বিপদের লক্ষণ বলে ধরে নিত, যার ফলে প্রতি মুহূর্তে আরও সতর্ক থাকতে পারত।"

আবার অনেক গবেষক বলেন যে মানুষের মস্তিষ্কের তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্যারিডোলিয়া জড়িত। মস্তিষ্ক অনবরত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আকার, আকৃতি, রং, প্যাটার্ন তৈরি করতে থাকে, যার সঙ্গে হঠাৎ আশপাশের পরিবেশের কোনো প্যাটার্ন মিলে গেলে প্যারিডোলিয়া তৈরি হয়।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের নিউরোসায়েন্টিস্ট সোফি স্কটের মতে, "প্যারিডোলিয়ায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটে।"

তিনি জানান, "যে ব্যক্তি যে ধরনের চিন্তা বেশি করে, সে সেই ধরনের প্যারিডোলিয়া বেশি দেখে। যে পশুপাখি ভালোবাসে, সে মেঘের মধ্যে হাতি দেখে। যে ধার্মিক, সে টোস্টে যিশুর ছবি দেখে।" তিনি মনে করেন, এখানে প্রকৃতির কৃতিত্ব যতটা, তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব মানুষের স্বভাব-চরিত্রের।

এছাড়া প্যারিডোলিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একবার মনে গেঁথে গেলে তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যেমন- যে ফলের মধ্যে একবার মানুষের অবয়ব চোখে পড়েছে, প্রতিবার সেই ফলের দিকে তাকালেই সবার আগে মানুষের অবয়বটি চোখে পড়বে। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক সেই ভ্রমকে সত্যি হিসেবে ধরে পাকাপাকিভাবে মস্তিষ্কে বসিয়ে নেয়, যে কারণে চাইলেই কোনো বিশেষ প্যারিডোলিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলেই প্যারিডোলিয়ার সঙ্গে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অসংখ্য প্যারিডোলিয়াকে তাই ধর্মীয় নিদর্শন বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার ইঙ্গিত বলে মেনে নিচ্ছেন মানুষজন।

৯.

আসলে এই ধরনের মুখমণ্ডল শনাক্ত করার প্রবণতা মানুষের মস্তিষ্কের কর্টেক্সে খুব দ্রুত পরিবহন করে। এই উদ্দীপনা পরিবহনের ক্ষমতা অন্যান্য উদ্দীপনার চেয়েও দ্রুততর এবং মস্তিষ্কও সেই উদ্দীপনায় খুব দ্রুত সাড়া প্রদান করে। তাই আমরা খুব সহজেই মুখমণ্ডল আকৃতির নয় এমন বস্তুর মধ্যেও মুখমণ্ডল খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। ম্যাগনেটো এনসেফালোজি পদ্ধতিতে মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষের আকৃতি মনে হওয়া ১৬৫ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী

হয়। তাহলে একটু ভাবুন, কত দ্রুততার সাথে আমরা কল্পনা করে ফেলি!

আমরা তো জানি প্যারিডোলিয়া হচ্ছে অ্যাপোফেনিয়ার একটি অংশ। কিন্তু অ্যাপোফেনিয়ারও কিছু মজার উপাংশ আছে। যেমন:

Over fitting : যখন কোনো তথ্য মূল গবেষণার পরিবর্তে শুধু বিশেষ কোনো তথ্যকে সন্তুষ্ট করে।

Gambler’s fallacy: জুয়াড়ির হেত্বাভাস যা মূলত তাস, লটারি বা জুয়াতে প্যাটার্ন খোঁজার প্রবণতা।

Hidden meanings: লুক্কায়িত বা প্রচ্ছন্ন অর্থ যেমন : ভাগ্য গণনা, ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্যোতিষবিদ্যা, হাত দেখা বা অ্যাস্ট্রোলজিকে সত্য ভাবা।

Confirmation bias: নিশ্চিতকরণ পক্ষপাত, যাতে ধারণা ও বিশ্বাসকে সত্য ভেবে ও বিপরীত ধারণাকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বাস মোতাবেক সমাধান খোঁজা হয়।

সমান্তরাল মহাবিশ্ব

যেখানে সময় অতীতের দিকে যায়

জাভেদ ইকবাল

সমান্তরাল মহাবিশ্বের সন্ধান মিলেছে?

- না, নাসা এমন কোনো কথা বলেনি।

দক্ষিণ মেরুতে একটা গবেষণাগার আছে, যেটা নিউট্রিনো ধরার চেষ্টা করছে। তারা ৩৭ কিলোমিটার উঁচুতে বিশাল বড়ো বেলুনের সাথে অ্যান্টেনা লাগিয়ে রেখেছে। এটার নাম 'অ্যানিটা' (Antarctic Impulsive Transient Antenna or ANITA)

নিউট্রিনোকে কিছু আটকাতে পারে না। ধারণা করা হয়, আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি করে নিউট্রিনো যাচ্ছে। যদি নিউট্রিনো খুব শক্তি অর্জন করে, তাহলে খুব সংবেদনশীল যন্ত্র দিয়ে পরমাণুর সাথে নিউট্রিনোর সংঘর্ষ ধরা যায়। অ্যানিটা সেই কাজই করছে। নিউট্রিনো মহাকাশ থেকে আসার কথা, কিন্তু অ্যানিটা গত কয়েক বছরে দেখেছে যে মহাকাশ থেকে না এসে পৃথিবীর ভেতর থেকে কিছু নিউট্রিনো আসছে বলে মনে হয়।

আমাদের জানা পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে গবেষকরা বলেছিলেন, প্যারালাল ইউনিভার্স একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। নিউ সায়েন্টিস্ট (খুব সিরিয়াস ম্যাগাজিন), যেখানে সম্পূর্ণ আর্টিকেলটা পড়তে টাকা দিয়ে গ্রাহক হওয়া লাগে, একই হেডলাইন ব্যবহার করেছে কিন্তু আসলে আলোচনা করেছে এরকম একটা কাল্পনিক মহাবিশ্বের। যেহেতু সম্পূর্ণ লেখাটা পড়তে টাকা দেওয়া লাগে, তাই অনেক পত্রিকা শুধু ভূমিকাটা পড়েই বাকিটা নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে।

অ্যানিটার মূল গবেষক পিটার গরহাম বলেছেন, যখন আর কোনো ব্যাখ্যা টিকে থাকবে না, তখন প্যারালাল ইউনিভার্স নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে, এখন সেটা করার দরকার নেই।

Gorham, who is the principal investigator of ANITA, told ScienceAlert, "We have encountered a small number of anomalies in our data, and once we have exhausted all of the possible explanations within the 'Standard Model' of physics, only then is time to consider other ideas that push those

at the point where parallel universes are necessary!"

তাই, "সমান্তরাল মহাবিশ্ব যেখানে সময় অতীতের দিকে যায়" আপাতত কল্পবিজ্ঞানের জগতেই থাকুক।

গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র ৩ সেকেন্ড

মারফুল জাহান মারফি (মারফি মেসাবাহ)
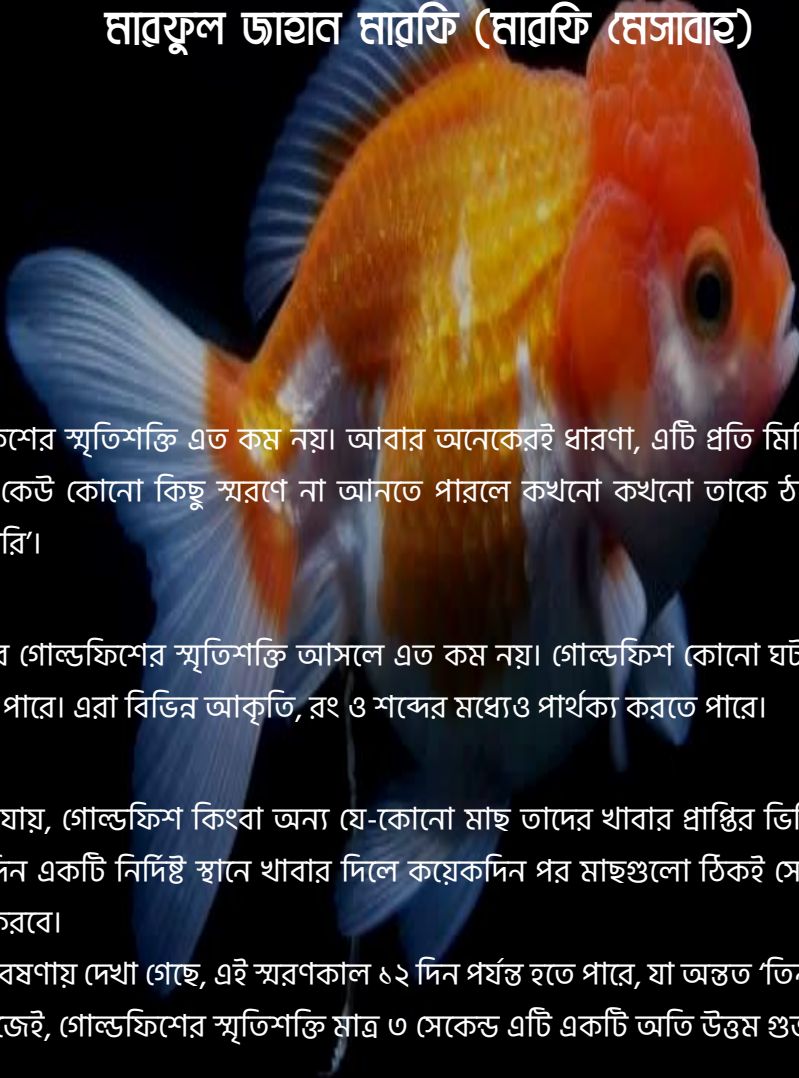
না, ভাই। গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি এত কম নয়। আবার অনেকেরই ধারণা, এটি প্রতি মিনিটে/সেকেন্ডে ৬৬২০টি স্মৃতি ভুলে যায়। কেউ কোনো কিছু স্মরণে না আনতে পারলে কখনো কখনো তাকে ঠাট্টা করে বলা হয় তার 'গোল্ডফিশ মেমোরি'।

সে যাহোক, বাস্তবে গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি আসলে এত কম নয়। গোল্ডফিশ কোনো ঘটনা কমপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। এরা বিভিন্ন আকৃতি, রং ও শব্দের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারে।

গবেষণায় পাওয়া যায়, গোল্ডফিশ কিংবা অন্য যে-কোনো মাছ তাদের খাবার প্রাপ্তির ভিত্তিতেও স্থান মনে রাখে। মাছেদের কয়েকদিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিলে কয়েকদিন পর মাছগুলো ঠিকই সেই একই জায়াগায় এসে খাদ্য অনুসন্ধান করবে।
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই স্মরণকাল ১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে, যা অন্তত 'তিন সেকেন্ড' সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই, গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র ৩ সেকেন্ড এটি একটি অতি উত্তম গুজব।

কোভিড-১২ টোটকা

মনিফ শাহ চৌধুরী

আদাতে থাকে gingerols ও shogaols।

আদার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিও আছে। তাই ঠান্ডা লাগার সাথে রিলেটেড কোনো রেসপিরেটরি ব্যাকটেরিয়াকে বংশবিস্তার করতে দেয় না। এভাবে উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে আনে।

আবার আদার সলিউশন বা ভেজা আদা কিংবা আদার রস রেসপিরেটরি কিছু ভাইরাসকেও ধ্বংস করে। তাই এখানেও কার্যকরী উপসর্গ কমাতে পারে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত নয়।

আদায় যে কেমিক্যাল থাকে, তা গলায় প্রদাহ কমায়।

প্রচুর antioxidants থাকে যা প্রদাহের কারণে কোষের ক্ষতি হতে দেয় না।

চায়ের ব্যাপারটাও প্রায় একই।

আবার গরম কোনো পানীয় খেলে গরমের কারণে সর্দি নরম হয়ে আসে, একই সাথে ট্রাকিয়া একটু চওড়া হয়, যার ফলে ciliated cells খুব সহজেই সেগুলোকে ঠেলে গলার কাছে নিয়ে আসতে পারে।

মধুর ব্যাপারটার খুব জোরালো প্রমাণ নেই যে এটা ওজন কমাবেই।

একটা স্টাডি আছে, এখানে, সুক্রোজের বদলে মধু খেলে ওজন কমার পক্ষে ডেটা আছে। উল্লেখ্য, সুক্রোজের বদলে। অর্থাৎ, আমি সুক্রোজও খেলাম আবার মধুও খেলাম, আর আমার ওজন কমে গেল তা নয়। কিন্তু সুক্রোজের বদলে মধু খেলে ওজন কম বাড়বে সাধারণের তুলনায়।

আবার আরেকটা স্টাডি, এখানে দেখানো হয়েছে যে মধু ক্ষুধার অনুভূতি তৈরিকারী হরমোনের ইফেক্ট কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ, কম ক্ষুধা লাগা মানে কম খাওয়া। অর্থাৎ, কম ওজন বেড়ে যাওয়া।

কালোজিরার ব্যাপারটাও ইন্টারেস্টিং।

এখানে ১১টা স্টাডি পেপার আছে ৭৮৩ জনের উপর হওয়া ইনভেস্টিগেশনের। এখানে দেখানো হয়েছে, গড়ে ২.১ কেজি ওজন ও ১.৪ ইঞ্চি কোমরের সাইজ কমেছে, কালোজিরা ব্যবহারে ৬-১২ সপ্তাহের মাঝে। অবশ্যই প্লাসিবোর সাথে compare করে।

ডুবে যাওয়া জাহাজে

জাভেদ ইকবাল

ডুবে যাওয়া জাহাজে বা লঞ্চে, এমনকি গাড়িতেও বাতাস আটকে থাকে। এটাকে এয়ার পকেট বলে। এটা নতুন না। বাংলাদেশেও এই ঘটনা আগে ঘটেছে। যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস থাকা, সেখানে এক বা একাধিক মানুষ থাকা, সময়মতো উদ্ধার হওয়া, এগুলোর সম্ভাবনা অতি অতি কম, কিন্তু শূন্য না।

উলটে যাওয়া জাহাজে বাতাসের বাবলে মানুষ থাকা নিয়ে একটা সিনেমাও হয়েছে (পোসাইডন অ্যাডভেঞ্চার-(১৯৭২)। আমার সমবয়সীরা বিটিভিতে সেই সিনেমাও দেখেছেন। সেবা প্রকাশনী মনে হয় বইটার বাংলাও প্রকাশ করেছিল। সিনেমাটার ট্যাগ লাইন ছিল - NMOᗡ ƎᗡISd∩ '˥˥ƎH

তারপর ২০০৬ সালে এটার রিমেক হয়েছে আবার।

সুতরাং বাংলাদেশে একজন মানুষের এভাবে বেঁচে যাওয়ায় বিজ্ঞানের সাথে কোনো সংঘাত নেই। তবে আপনি যদি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন, ওই লোকের পা ধোয়া পানি কিনে মাথায় ঢালতে পারেন।

কিন্তু সময় আর এয়ার পকেটের আকারের মধ্যে সম্পর্কটা কীরকম? একজন মানুষ দিনে ৫৫০ লিটারের মতো অক্সিজেন নেয়।

বাতাসের এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। সুতরাং, মোট বাতাস লাগবে ২,৭৫০ লিটার বা ২,৭৫০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার। তিন দিনে লাগবে ৮,২৫০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার। সেটার ঘনমূল নিলে আসে ২০২ সে.মি.। অর্থাৎ, যদি ২ মিটার প্রতি বাহুর একটা ঘনক (কিউব) নেওয়া হয়, তাহলে সেখানে তিন দিন বাঁচার মতো বাতাস থাকবে। মানুষ সাধারণের চাইতে কম অক্সিজেনেও বাঁচতে পারে। সুতরাং, আরও ছোটো এয়ার পকেট হলেও এটা সম্ভব।

নাইজেরিয়ার উপকূলে আড়াই দিন ডুবে থাকা জাহাজ থেকে একজনকে উদ্ধার করা হয়।

বেঁচে যাওয়া মানুষটার মাথা অসম্ভব ঠান্ডা ছিল। আমি হলে সম্ভবত পাগল হয়ে যেতাম এই অন্ধকার জীবন্ত কবরে বসে বসে।

ইউটিউবে গাড়ির এয়ার পকেটের অনেক ভিডিয়ো আছে।

পূর্বলেখন গুজব

সব্যসাচী দাশ নির্ঝর

প্রোগ্রামিং আজ সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন। ব্যাবসা-বাণিজ্য, পড়ালেখা, ইন্ডাস্ট্রি; কী নয়! আর প্রোগ্রামিং অনেক বেশি জনপ্রিয় হওয়ায় এ সম্পর্কে মিথ বা গুজব এর প্রচলনও বেশ জমজমাট। এখানে প্রোগ্রামিং নিয়ে বেশ কিছু প্রচলিত গুজব খণ্ডন করা হয়েছে।

প্রোগ্রামার হতে হলে আপনার IQ ১৬০+ হতে হবে:

অবশ্যই না। প্রোগ্রামার হতে হলে আপনার দরকার ধৈর্য, ভালো রিসোর্স, লেগে থাকার মানসিকতা আর প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি ভালোবাসা। এসব কিছুতে আইকিউ (IQ) খুব হাই হতে হয় না। সুতরাং, আপনি প্রোগ্রামার হতে চাইলে আইকিউ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

শুধু বয়স্করাই প্রোগ্রামিং করতে পারেন :

এ গুজবটা শুনলে বেশ প্রাচীন-প্রাচীন ভাব আসে। অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই আগে মনে করা হতো ছোটোরা পারবে না বা এমন মনমানসিকতা ছিল। কিন্তু এখন আমরা সবাই জানি ছোটো থেকে কোনো কিছু শেখা শুরু করলে বরং ভালো, সেই বিষয়ের প্রতি আলাদা এক ধরনের প্যাশন কাজ করে। তাছাড়া ছোটো থেকে কোনো কিছু শেখা শুরু করলে দক্ষতাও অনেকের থেকে বেশি থাকে, কারণ সেক্ষেত্রে আপনি তাদের থেকে আগে চর্চা শুরু করেছেন।

একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে এক সপ্তাহই যথেষ্ট:

দাঁড়ান! আপনি অনন্ত জলিল নন। মানে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কত বড়ো ভাঁওতাবাজি। হাজার হাজার অত্যন্ত দক্ষ প্রোগ্রামার তাহলে প্রতিনিয়ত নিজেকে ভাষা শেখায় নিয়োজিত রাখতেন না। তাছাড়া একটি ভাষার লাইব্রেরি অনেক বড়ো। আপনি ২৪ ঘণ্টা শিখতে থাকলেও তা এক সপ্তাহে শিখতে পারবেন না। আর এই জার্নির আসলে শেষ নেই সেরকম। তো এক সপ্তাহে আসলে একটি পুরো প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার চিন্তা কীভাবে আসতে পারে তা আমার জানা নেই।

ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য সব syntax মুখস্থ করা লাগে :

এটা ভাবাও হাসির কাজ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে এই গুজবটি সৃষ্টি হওয়ার বা ছড়ানোর কারণ বেশ যৌক্তিক মনে হয়। এর একটি যথার্থ কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, এখানকার উচ্চ মাধ্যমিকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বই বা এর পরীক্ষা পদ্ধতিকে। এক্ষেত্রে পরীক্ষায় কোড লিখতে হয় পরীক্ষার খাতায়। যারা প্রোগ্রামিং করেন তারা জানেন ব্যাপারটা কতটুকু হাস্যকর। এক্ষেত্রে পরীক্ষায় তারাই ভালো করবে যারা ভালো করে কোডগুলো মুখস্থ করে ও খাতায় লিখতে পারবে। এক্ষেত্রে কোড সে বুঝে লিখল না কি, তা আসলে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না এবং ফলস্বরূপ ব্যাপারটা খুব বাজে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের

একটা বড়ো অংশ না বুঝেই মুখস্থ করছে যে বেশি ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারবে তাকে বলা হবে প্রোগামিং অংশে সে ভালো। ব্যাপারটা মারাত্মক ক্ষতিকর। যার ফলস্বরূপ এরকম গুজবের সৃষ্টি হচ্ছে যে syntax মুখস্থ করতে পারলেই প্রোগ্রামার ভালো। আদতে syntax মুখস্থ করা এখন অকাজ। প্রোগ্রামিংয়ের মূল লক্ষ্য হলো প্রবলেম সলভ করা। Syntax এর জন্য তো ইন্টারনেট আছেই; কোনো জায়গায় আটকে গেলে সেখান থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে।

পাইথন (বা X) বেস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ:
এই গুজবটি এখন পর্যন্ত আমার শোনা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তা এটাকে গুজব বলছি, তার মানে কি বেস্ট কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নেই? এই প্রশ্নের উত্তর শেষে দিচ্ছি। আগে ব্যাপারটা একটু বুঝি।

বেস্ট বা শ্রেষ্ঠ তকমা লাগানোর হিড়িক আজকাল বেশ দেখা যায়। আচ্ছা, বলুন তো Asus না কি Samsung শ্রেষ্ঠ? আপনি হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা ও পছন্দ থেকে যেকোনো একটা বলে দেবেন। কিন্তু Asus এর মতো Samsung এর কি Laptop/PC আছে? আর Samsung এর মতো ফোন মার্কেট কি Asus এর আছে? তার মানে আসলে একনিষ্ঠভাবে কোনো জিনিসকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। তবে কোনো নির্দিষ্ট প্যারামিটার বা মানদণ্ড বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সেক্ষেত্রেও আসলে প্রথমটাই শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয়টা ভালো না এমন নয়।

প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর ক্ষেত্রেও আসলে ব্যাপারটা এরকমই। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর বিচারের ক্ষেত্রে কোনটা কীসে লাগবে, কোনটার ধরন কী, কোনটা আপনি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ইত্যাদি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার কাজের পছন্দের ক্ষেত্র যদি হয় Data Science, AI, framework তাহলে most preferable language হলো Python. আর যদি আপনার ইচ্ছা থাকে Web Developer হিসেবে কাজ করার তাহলে most preferable language হলো JavaScript.

আবার, উল্লিখিত দুটি ভাষাই অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আপনি যদি প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করতে চান, সেক্ষেত্রেও এইদুটো ভাষার কোনো একটি দিয়ে শুরু করতে পারেন। এখন আপনি যদি কাজ করতে চান ওয়েবসাইট নিয়ে, তাহলে Python যত জনপ্রিয়ই হোক না কেন সেটা পারফেক্ট না, যদিও অনেক web framework দিয়ে ডেভেলপ করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার পরিস্থিতি অর্থাৎ আপনার পছন্দ, কাজের ধরন, এফিশিয়েন্সি ইত্যাদি ফ্যাক্টর আপনাকে ভাষা চুজ (choose) করতে সাহায্য করে। ওই পরিস্থিতিতে কোনটা বেস্ট তা আসলে ওইসব ফ্যাক্টর বলে দেয়।

সব কোডিংই প্রোগ্রামিং কিন্তু সব প্রোগ্রামিং কোডিং নয়:
কোডিং করা প্রোগ্রামিং এর বড়ো একটি অংশ, তবে পুরোটা নয়। ব্যাপারটা এরকম যে প্রোগ্রামিং নামক
বিষয়ের ফলিত শাখা হচ্ছে কোডিং। কোনো একটি প্রবলেম সলভ করতে ভাবতে হয়, অ্যালগরিদম দাঁড় করাতে হয়, ডাটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় ইত্যাদি। তারপর শেষে এই সলিউশনকে কাজে লাগাতে কোডিং করতে হয়।

যত বেশি প্রোগ্রামিং ভাষা জানা থাকবে তত ভালো প্রোগ্রামার:

প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে ভাষা আসলে খুউব বড়ো ফ্যাক্টর নয়। প্রোগ্রামারদের মূল লক্ষ্য থাকে প্রোগ্রামিং'-এ দক্ষতা বাড়ানো। একজন ভালো প্রোগ্রামার সাধারণত একটি বা দুইটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করে থাকেন বা সেগুলোতে দক্ষ হন। তবে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কারণে তাঁদেরকে নতুন কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয়। তবে ভাষা শেখার দক্ষতা ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়। যেমন: একটি ভাষা শেখার পর দ্বিতীয় ভাষা শেখা যতটুকু সহজ হবে, তার চেয়ে তৃতীয় ভাষা শেখা আরও সহজ হবে। আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করে উত্তরগুলো পরে আসতে পারে

একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষতা অর্জন করলেই যথেষ্ট:

এ কী! একটু আগে বললেন ভাষা বড়ো ফ্যাক্টর না, আবার এখন উলটো কথা! আসলে, উলটো কথা নয়। খুব বড়ো ফ্যাক্টর না বলতে বুঝিয়েছি যে খুব হাইপ-এর কিছু নয়। তবে নির্দিষ্ট অনেক প্রজেক্টের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভাষা নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে অন্য ভাষা না জানা থাকলে প্রোগ্রামিংয়ের দুনিয়ায় পিছিয়ে পড়বেন। আর তাছাড়াও নতুন নতুন ভাষা শেখা খুব কঠিন কিছু না; বেসিক জিনিস সব ভাষাতে একই। একাধিক ভাষা শিখলে নিজের হাতে অপশনও বেশি থাকে। তাই ভাষার জগতে নিজেকে আপডেটেড রাখা উচিত।

প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য গণিতবিদ
হওয়া লাগে:

অবশ্যই প্রোগ্রামিং এর বেশ বড়ো একটা অংশ ক্যালকুলেশন, প্রবলেম সলভিং ইত্যাদি। গণিতে ভালো হলে তা অবশ্যই আপনাকে প্রোগ্রামিং জার্নিতে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ে ভালো করতে হলে গণিতে অনেক বেশি ভালো হওয়া লাগবে এমন কিছু নয়। মানে হলে ভালো, না হলে সমস্যা নেই। কিন্তু হবেই হবে, এমন কোনো পূর্বশর্ত নেই।

প্রোগ্রামার মানেই সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা:

হ্যাঁ, প্রোগ্রামারদের একটা অংশ আছেন এরকম। তবে অনেকেই আছেন যাঁরা এই স্টেরিওটাইপের বাইরে। যাঁরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করেন বা অন্যান্য কোনো শখের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হতে পারেন। আর যাঁরা ওরকম সারা দিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকেন, তাঁরাও আসলে প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি প্যাশন থেকেই ওরকম করেন।

প্রোগ্রামিং শিখলে হ্যাকিং পারা যায়:

হ্যাকিং করতে প্রোগ্রামিংয়ের দরকার হতে পারে। কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ের সাথে বান্ডিল প্যাক হিসেবে হ্যাকিং আসে না! কারণ হ্যাকিংয়ের (সেটা এথিক্যাল হোক বা নন-এথিক্যাল) কাজ হলো কোনো সিস্টেমের ফাঁক খুঁজে বের করে সেটা ব্যবহার করে, অনুমতি ছাড়াই সিস্টেমে প্রবেশ করা। প্রবেশ করে কী করবে তা হ্যাকারের ওপর নির্ভর করে। আবার এখন হ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলোতে প্রোগ্রামিং এর দরকার হতো তা করার জন্য এখন রেডিমেড সফটওয়্যার আছে। সুতরাং, প্রোগ্রামিং শিখে গেলেই যে আপনি হ্যাকিং পারবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা আপাতত দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রোগ্রামিং পারলেই গেইম তৈরি করা যাবে:

এই টাইটেল দেখে অনেকেই চমকে উঠতে পারেন যে সারাজীবন শুনে এলাম প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমেই গেইমের ফাংশন-টাংশন সব তৈরি করা হয়, এখন আপনি এসব বলছেন! আসলে ভুল কিছু শোনেননি। তবে গেইম তৈরি, গেইম ডেভেলপমেন্ট,

গেইম ডিজাইনিং ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে গেম ডেভেলপমমেন্ট ওয়ার্ল্ডে। সেক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদিও প্রোগ্রামিং তবুও আরও অনেক ধরনের কাজ বা স্কিল প্রয়োজন এক্ষেত্রে যেমন: গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, গেইম এর কন্সেপচুয়ালাইজেশন, ফ্রেমওয়ার্ক, কোড লাইব্রেরি, গেইম ডেভেলপমেন্ট, গেইম ইঞ্জিন সম্পর্কে ধারণা, ইত্যাদি। যেগুলো মোটেই একদম ছোটোখাটো বা সহজ কিছু নয়। বরং গেমের স্টোরিবোর্ড, স্ট্র্যাটেজি, এবং ডিজাইনিং গেমের সবচেয়ে বড় অংশ।

মেগাপিক্সেল মিথ

নাঈম হোসাইন ফারুকী

১. মেগাপিক্সেল বাড়লেই ছবির কোয়ালিটি ভালো হয় না। বরং ছোটো সেন্সরে বেশি পিক্সেল ঢোকালে কোয়ালিটি খারাপ হতে পারে। প্রতি পিক্সেলের সাইজ ছোটো হয়ে গেলে নয়েজ বাড়ে, অনেক প্রসেসিং করা লাগে।

২. একই ছবিতে নানান রং মেগাপিক্সেলের জন্য হয় না, কালার ডেপথের জন্য হয়।

৩. একই আলো অন্ধকারের পার্থক্য, আলোতেও ডিটেইল অন্ধকারেও ডিটেইল ফুটে ওঠা, এগুলো মেগাপিক্সেলের জন্য হয় না, ডাইনামিক রেঞ্জের জন্য হয়।

৪. রাতে ভালো ছবি ওঠে মেগাপিক্সেলের জন্য না, লো লাইট নয়েজ সেন্সিটিভিটির জন্য। বেশি মেগাপিক্সেল উলটা ক্ষতি করে এক্ষেত্রে।

৫. সেন্সরের রেজুলেশন যতই হোক, লেন্সের রেজুলেশন সেটাকে লিমিট করে দেয়। সেটা বেশি না হলে সেন্সরের রেজুলেশন কাজের না।

নিউটনের মাথায় আপেল

আবু রায়হান

মিথ:

"নিউটনের মাথায় আপেল পড়েছিল, তা নিয়ে ভেবে তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন।"
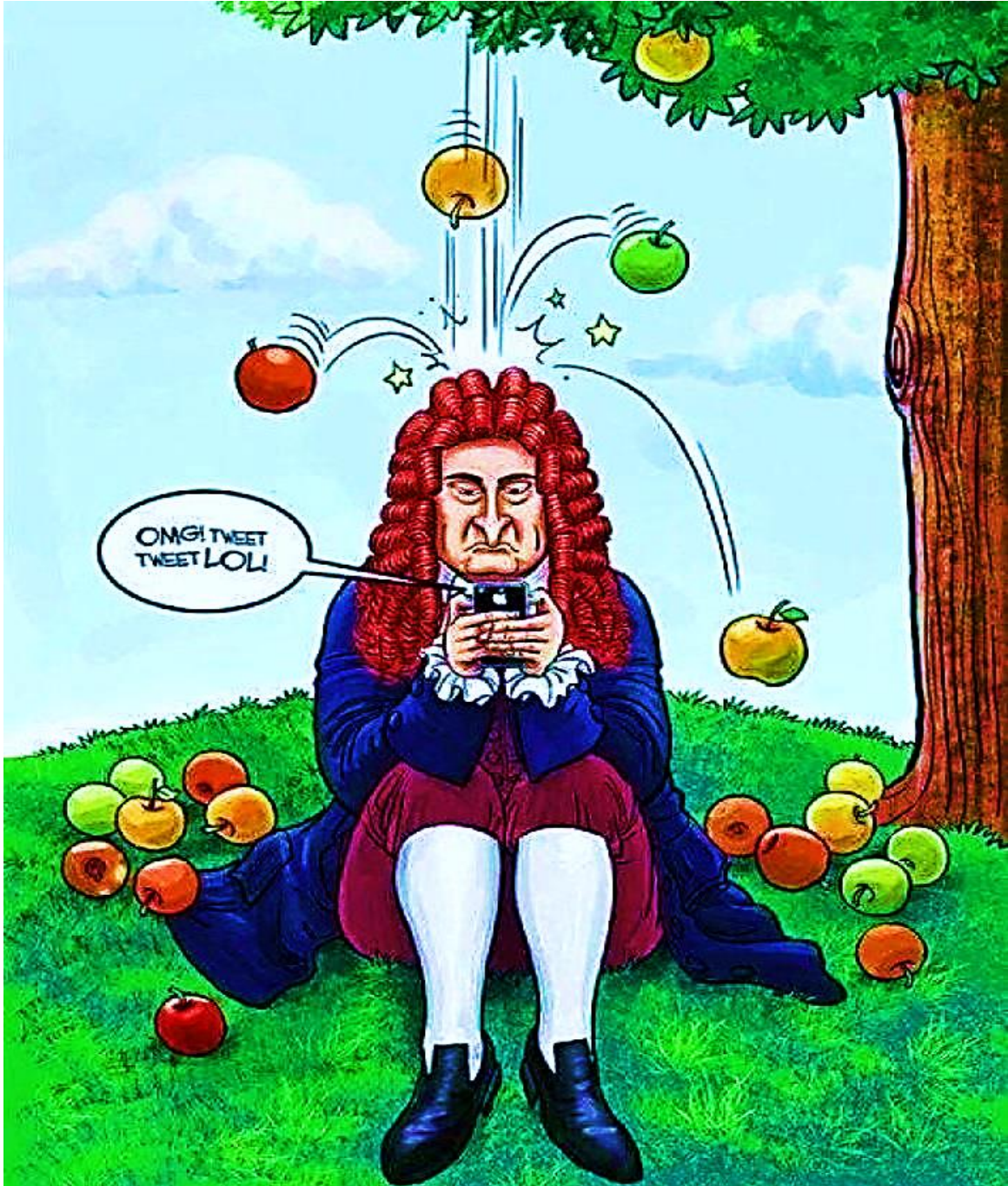
প্রকৃত সত্য:
নিউটনের আপেলের গল্পটি বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পগুলোর একটি। তবে এটি যেভাবে ছড়ানো হয়েছে আসলে তা তেমন নয়। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির পুরোনো আর্কাইভ ঘেঁটে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে আপেল বিষয়ক একটি ঘটনার উল্লেখ ঠিকই আছে।

রয়্যাল সোসাইটি ২০১০ সালে এই পাণ্ডুলিপিটি সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে এবং তারপরই প্রকৃত গল্পটি সবাই জানতে পারে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে গল্পটি অনেকাংশেই সত্যি, তবে নিউটনের মাথায় আপেলটি পড়েছে এমন সম্ভবত নয়; যদিও গল্পটি এভাবেই ছড়িয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপি, নিউটনের জীবনী নিয়ে লিখেছিলেন তাঁরই একজন বন্ধু, উইলিয়াম স্টাকেলি, পেশায় যিনি ছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। মৃত্যুর এক বছর আগে, নিউটন সেই আপেলের গল্প করেছিলেন উইলিয়াম স্টাকেলির কাছে। ১৭৫২ সালে প্রকাশিত 'Memories of Sir Isaac Newton's Life' নামে নিউটনের জীবনী বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন সেই কথা। সে অনুযায়ী, "ডিনারের পর আবহাওয়া গরম হয়ে পড়লে আমরা বাগানে গেলাম এবং আপেল গাছের ছায়ায় বসে thea (পানীয়) পান করলাম।"

তিনি তখন আমাকে বললেন, "ঠিক এরকম একটা অবস্থায় অনেক বছর আগে তিনি গাছ থেকে একটা আপেল পড়তে দেখেছিলেন। তখনই তার মাথায় এসেছিল ধারণাটি।"

"কেন আপেলটা লম্বভাবে মাটিতে পড়ল? ওপরে গেল না কেন? অথবা ডানে-বায়ে? কারণ, নিশ্চয়ই পৃথিবী তাকে টানছে। তাহলে পদার্থের নিশ্চয়ই আকর্ষণ ক্ষমতা আছে...আর এটা নিশ্চয়ই ভরের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং, আপেল যেমন পৃথিবীকে টানছে, তেমনই পৃথিবীও আপেলকে টানছে।"-১৫ এপ্রিল, ১৭২৬ সাল।

একই ধরনের বাক্যের সমাবেশে ভলতেয়ার তার 'এসে অন এপিক পোয়েট্রি' (১৭২৭) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "আইজ্যাক নিউটন যখন তাঁর বাগানে হাঁটছিলেন, তখন গাছ থেকে একটি আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখে প্রথম মহাকর্ষ পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বোধোদয় হয়।"

এই বর্ণনাগুলো সম্ভবত কিছুটা অতিরঞ্জিত। কারণ নিউটনের নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি উল্সথর্প ম্যানরে তাঁর নিজের বাসার জানালার কাছে বসে ছিলেন। এমন সময় জানালা দিয়ে গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন।

নিউটনের ভাইয়ের মেয়ের স্বামী এবং রয়্যাল মিন্টে তাঁর সহকারী, জন কন্ডুইট, নিউটনের জীবনী লিখতে গিয়ে এই ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নিউটন কেমব্রিজ ছেড়ে লিঙ্কনশায়ারে তাঁর মায়ের কাছে চলে আসেন। সেখানকার বাগানে বসে একদিন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় তার মাথায় আসে অভিকর্ষ শক্তি (যা একটি আপেলকে গাছ থেকে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আসে) পৃথিবী থেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে

না। সাধারণত যেমনটা চিন্তা করা হয়, এই শক্তি নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তার প্রভাব বজায় রাখে। নিজের মনে তিনি বলে যেতে থাকেন,

এই বলটি কেনই-বা চাঁদ পর্যন্ত প্রসারিত হবে না। আর সেক্ষেত্রে এটি চাঁদের গতিকে প্রভাবিত করে এবং সম্ভবত তাকে কক্ষপথে স্থান করে দেয়। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি হিসাব করতে বসে যান যে এই ধারণার ফলাফল কী হতে পারে।”

আসলে নিউটনের মাথায় কোনো আপেল পড়েনি। তবে হ্যাঁ, তিনি আপেল পড়া লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ভলতেয়ার প্রথম লেখেন, নিউটন আপেলের পতন দেখে অভিকর্ষ তত্ত্ব বুঝতে পারেন। কিন্তু আসলে একটা মাত্র ঘটনা তাঁকে এ তত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করেনি। বরং এ ঘটনা হয়তো তাঁকে তাঁর তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে নিয়েছিল। এটা ছিল একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। নিউটন কিন্তু প্রায়ই এ আপেলের ঘটনার উদাহরণ দিতেন, কারণ এটা দিয়ে সহজে বোঝানো যেত তাঁর তত্ত্ব। উনি এত জটিল ক্যালকুলেশনে না গিয়ে সরল উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে আপেল ঠিকই পড়েছিল, কিন্তু নিউটন আপেল মাটিতে পতনের আরও আগে থেকেই মহাকর্ষ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন। আপেলের মাটিতে পতন তাঁর চিন্তাটাকে এগিয়ে নিতে প্রভাবিত করতে পারে এই-ই যা।
কিন্তু তাঁর মাথায় আপেল পড়েছে এটা তাঁর কোনো নোটপত্র, ডায়েরি ঘেঁটেও কেউ পায়নি।

তিনি দীর্ঘদিন থেকে মহাকর্ষ নিয়ে ভেবেছেন। ভেবেছেন যে কেন কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচের দিকেই নামে, ওপরের দিকে উঠে যায় না। কোনো বস্তুকে শূন্যে ছেড়ে দিলে সেটা যে মাটিতে এসে পড়ে, সেটা প্রত্যেক মানুষই পর্যবেক্ষণ করে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ দেখে আসছে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচে পড়ে যায়। নিউটনের মাথায় যদি আপেল পড়েও থাকে তাহলেও সেটা নিশ্চয়ই তাঁর জন্য নতুন ঘটনা ছিল না। এর আগেও তিনি বিভিন্ন বস্তুকে নিচে পড়তে দেখেছেন। নিউটন নিশ্চয়ই এতটা নির্বোধ ছিলেন না যে একদিন হঠাৎ একটি আপেল পড়াতেই তাঁর মনে হলো যে আপেল নিচে নামল কেন? আপেল ওপরে উঠে গেল না কেন? প্রকৃত যে ঘটনাটি ঘটেছিল বলে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, তা হচ্ছে, তিনি কোনো এক আলোচনায় মহাকর্ষ সূত্রটি বোঝাচ্ছিলেন। সেই আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আপেল গাছ থেকে আপেল পড়ার উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন এভাবে “আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম কেন আপেল গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে।”

তো নিউটনের মাথায় আপেল পড়েছে যারা বলেন, তাদের মাথায় আপেল গাছ গজাবে ভবিষ্যতে; সেটা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

আরও একটা কথা, একটা বড়োসড়ো লম্বা আপেল গাছের ওপর থেকে কারো মাথায় পড়লে তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার কথা। আঘাত গুরুতরও হতে পারে। ওই অবস্থায় কারো বিজ্ঞানের সূত্র মাথায় আসে কীভাবে?

(এই গাছের একটি বংশধর কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের প্রধান ফটকের পাশে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। নিউটন ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নকালে যে কক্ষে থাকতেন, তার ঠিক নিচেই গাছটি অবস্থিত।)

স্পেইসের বড়ো হওয়া

নাঈম হোসেন ফারুকী

কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আগানো যাক...

স্পেইস কি আলোর চেয়ে বেশি বেগে বড়ো হচ্ছে?
বড়ো হয়ে কোথায় যাচ্ছে? এর বাইরে কী আছে?

এডিটর'স নোট: এখানে স্পেইসের বড়ো হওয়ার গল্প সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আসলে মুল ব্যাপার আরো বেশি জটিল।

১.
আমরা সবাই গ্রাফ পেপার দেখেছি। ধরুন, একটা 2D গ্রাফ পেপারে এক মি.মি. পরপর একটা করে ডট আছে। একসময় ওই গ্রাফ পেপার ছোটো ছিল, এখন বড়ো হচ্ছে। এমনভাবে বড়ো হচ্ছে যে পরপর যেকোনো দুইটা বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। আগে ছিল ১ মি.মি. এবং পরে হলো ২ মি.মি.।
স্পেইস ঠিক সেরকম একটা গ্রাফ পেপার। সেটা 2D বা 3D নয়, সময়সহ সেটা হচ্ছে 4D। স্পেইস নামের এই গ্রাফ পেপারটা বিগ ব্যাং এর সময় অকল্পনীয় ক্ষুদ্র ছিল। পরে কিছুক্ষণ সেটা খুব দ্রুত বড়ো হয়, সেই সময়টাকে বলে ইনফ্লেশান। এখনও বড়ো হচ্ছে, তবে ইনফ্লেশানের মতো অত দ্রুত নয়।

সব জায়গা কিন্তু সমানভাবে বড়ো হচ্ছে না। ভর স্পেইস-টাইমকে ছোটো করার চেষ্টা করে। আর স্পেইস-টাইমের ডার্ক এনার্জি একে টেনে বড়ো করার চেষ্টা করে। তাহলে সৌরজগতের ভেতর ভরের ঘনত্বের জন্য স্পেইস বড়ো হতে পারবে না। এমনকি একই গ্যালাক্সি, একই গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভেতরও
স্পেইস বড়ো হতে পারবে না। কিন্তু দুই গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের মাঝে যে বিশাল শূন্যতা, সেখানে ডার্ক এনার্জি স্পেইসকে টেনে বড়ো করতে পারবে। আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি একেকটা ক্লাস্টার হচ্ছে আমাদের সেই গ্রাফ পেপারের ডট। এরা একে অপরের থেকে দূরে সরছে। একটা গ্রাফ পেপারের কোনো সত্যিকারের কেন্দ্র নেই। আমি যে-কোনো বিন্দুকে মূলবিন্দু ধরে গ্রাফ আঁকতে পারি। স্পেইসও তেমন। সেটার যে-কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র ধরা যায়। এই গ্রাফ পেপারের সমদূরত্বে যে-কোনো দুই বিন্দুর ভেতর দূরত্ব মোটামুটি সমহারে বাড়ছে।

২.
এবার ধরি, X -অক্ষ বরাবর অনেকগুলো বিন্দু ১, ২, ৩, ৪, ৫...। আগে ১ আর ২ এর মধ্যে দূরত্ব ছিল ১ মি.মি., ১ আর ৩ এর মধ্যে দূরত্ব ছিল ২ মি.মি., এরকম।
১ সেকেন্ড পরের কথা। ১ আর ২ এর দূরত্ব হলো ২ মি.মি., ২ আর ৩ এর দূরত্ব হলো ২ মি.মি.। তার মানে ১ আর ৩ এর দূরত্ব হলো ৪ মি.মি.।

২ সেকেন্ড পর ১ আর ২ এর দূরত্ব হবে ৩ মি.মি., ১ আর ৩ এর দূরত্ব হবে ৬ মি.মি.।

তার মানে, যদিও পাশাপাশি দুই বিন্দুর দূরত্ব খুব বেশি হারে বাড়ছে না, কিন্তু যত দূরের বিন্দু তাদের ভেতর দূরত্ব বৃদ্ধির হার তত বেশি হবে। তাই যদি হয়, একসময় না একসময় আমি এমন একটা বিন্দু পাব যেটা আমার সাপেক্ষে স্পেইসের প্রসারণের জন্য আলোর বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

এখান থেকেই আসে, স্পেইস আলোর চেয়ে বেশি বেগে বড়ো হচ্ছে। সেটা শুধুমাত্র ইনফ্লেশানের সময় না, এখনও হচ্ছে। সেটা রিলেটিভিটির ভায়োলেশন না। রিলেটিভিটি অনুযায়ী স্পেইস-টাইমের ভেতর দিয়ে কেউ আলোর বেশি বেগে যেতে পারে না, তবে স্পেইস-টাইম নিজে যে-কোনো বেগে বড়ো হতে পারে।

৩.

বিগ ব্যাং সব জায়গায় হয়েছিল। এই জায়গাটাতেও হয়েছিল। গ্রাফ পেপার আগে ছোটো ছিল, এখন বড়ো হয়েছে। যে-কোনো দিকে আমরা যত দূরে তাকাই, তত অতীত দেখি। তাকাতে তাকাতে এক সময় আমাদের বিগ ব্যাং দেখার কথা। সেটা আসলে দেখি না। বিগ ব্যাং এর পরপর অস্বচ্ছ প্লাজমা পদার্থ দিয়ে ইউনিভার্স ভর্তি ছিল, তার ওপাশে দেখা যায় না। বিগ ব্যাংয়ের কয়েক লাখ বছর পর থেকে এই পর্দা হালকা হয়ে যায়, ফোটন আসতে পারে। আমরা যেদিকেই তাকাই, সেই ফোটন দেখি। একে বলা হয় বিগ ব্যাংয়ের পরোক্ষ প্রমাণ। এর নাম Cosmic Microwave Background Radiation। এই জিনিস আবিষ্কারের জন্য আর্নো পেঞ্জিয়াস নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

যেহেতু যত দূরে তাকাই তত অতীত দেখি, তার মানে হচ্ছে দেখার একটা সীমা আছে। বিগ ব্যাং মোটামুটি ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে হয়েছিল, আর আমরা শেষ যে অস্বচ্ছ প্লাজমা পর্দা দেখি সেটাও মোটামুটি এই সময় আগের। কিন্তু একে আমরা ১৩.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে দেখি না। কারণ স্পেইস বড়ো হচ্ছে। এই জায়গার বর্তমান অবস্থান আসলে ৪৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, ১৩.৮ নয়। এই যে ৪৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষের গোলকটা, এর নাম হচ্ছে অবজার্ভেবল ইউনিভার্স। এটা সম্ভবত মোট ইউনিভার্সের অতি ক্ষুদ্র অংশ।

মোট ইউনিভার্স অসীম কি না আমরা জানি না। মঞ্চে নৃত্যরত নর্তকীর মাথার ওপর পড়ে সার্চ লাইটের উজ্জ্বল আলো। চারপাশে তার ঘন কালো অন্ধকার। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বও সেরকম। সেটাও মোট মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশ।

এই দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অতি দূরের কোনো একটা জায়গা আমাদের থেকে আলোর বেশি বেগে দূরে সরছে। সেই জায়গা থেকে কোনো তথ্য আমরা পাব না। এই জায়গার নাম হচ্ছে হাবল স্ফিয়ার। এর ব্যাসার্ধ ১৪.৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। এই দূরত্বের কোনো জিনিস আমরা এখন দেখতে পারি, কারণ এক সময় সেখান থেকে আসা আলো আমাদের চোখে পৌঁছাতে পেরেছে। এখন যে আলো বের হচ্ছে সেটা আর আসবে না।

মহাবিশ্ব যে হারে বড়ো হচ্ছে, সেটা চলতে থাকলে একসময় অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে আলো আমাদের চোখে আসবে না। অন্য কোনো গ্যালাক্সির অস্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে যাবে। তখন যদি রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো আজব বিজ্ঞানী দাবি করেন–এই মিল্কিওয়ে

ছাড়াও আরও অনেক গ্যালাক্সি আছে, আমরা হয়তো তাকে পাগল বলব। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এটা কি সম্ভব? গত তেরোশ আশি কোটি বছরে আমাদের কাছ থেকে কোনো কিছু চিরতরে দূরে সরে গেছে? হয়তো দূরের কোনো মাল্টিভার্স, অদ্ভুত কোনো স্ট্রাকচার? আমরা জানি না। আমরা শুধু রাতের নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে পারি, কী আছে দিগন্তের ওপাশে!

রেফারেন্স : A Universe From Nothing By Lauren M Krauss
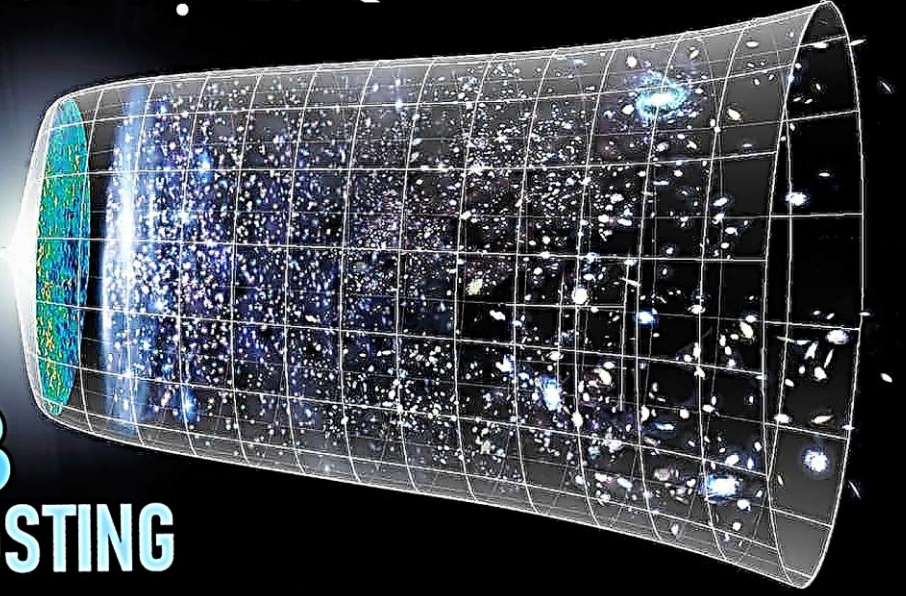
বিবর্তন গুজবের পোস্টমর্টেম অভিযান

তাহসিন আহমেদ অমি

বিবর্তন

আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ বিবর্তনের নামই শোনেনি। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক খালি একটা লাইনই জানে, "বান্দর মানুষ হওয়ার তত্ত্ব!", বাকি অর্ধেকের বাকি অর্ধেক আরেকটু বেশি জানে, "মিসিং লিঙ্ক কই? প্রমাণ কই? জাস্ট এ থিয়োরি, ফ্যাক্ট না। বান্দরের বাচ্চা মানুষ হয়? এখনও বান্দর আছে ক্যান্নে? সব বান্দর মানুষ না কেন? এখন বিবর্তন হয় না ক্যান? ডারউইন পাগল, মিথ্যা তত্ত্ব। ব্লা ব্লা। আর আসলেই বিবর্তন তত্ত্ব জানে, এমন মানুষের সংখ্যা এতই কম যে, শূন্য ধরতে দোষ নেই। বিবর্তন তত্ত্বের মতো প্রতিষ্ঠিত সুন্দর একটা তত্ত্ব নিয়ে এত গুজব, এত মিথ সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে আছে যে, তাদেরকে আসল বিবর্তন বোঝানো শুধু কোনো মহামানবের পক্ষেই সম্ভব।
কিন্তু আর না, অনেক হয়ে গেছে। আজকে সময় এসে গেছে একেকটা গুজব ধরে ধরে তার পোস্টমর্টেম করার। শুরু করা যাক!

Just a Theory! Not a fact!

সবচেয়ে কমন একটা বাক্যবাণ, যা বিবর্তনের বিরুদ্ধে ছুড়ে মারা হয়। কিন্তু তারা জানে না যে বিজ্ঞানে থিয়োরির স্থানটা ঠিক কোথায়। আর, তাদের ভাষাগত দুর্বলতাও আছে। আমরা দৈনন্দিন কথা-বার্তায় তত্ত্ব বা থিয়োরি শব্দটাকে যেভাবে ব্যবহার করি, বিজ্ঞান ঠিক সেভাবে করে না। বিজ্ঞানে থিয়োরির দাম আছে। আর ফ্যাক্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের জিনিস। এদের উত্তরে আমি একটা কথাই বলি,

৫০০ জনের বেশি পিএইচডি ধারী ব্যক্তি একটা লিস্টে সই করেছেন যেখানে বলা আছে তারা মিউটেশন এবং নেচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনে তারা সমর্থন করেন না। তো? বিজ্ঞান বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু না। পুরোটাই প্রমাণের উপর। গণতন্ত্র বলে কিছু নেই এখানে। মজার বিষয় হলো ঐ লিস্টের সিংহভাগ লোক বিবর্তন রিলেটেড ফিল্ডে কোনোদিন কাজ করেন নি, অনেকটা পরের ধনে পোদ্দারির মতো। তবু এই লিস্টের কাউন্টার হিসেবে আয়োজন হয় প্রজেক্ট স্টিভ-এর। এটা নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন এখানে।

https://www.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/3054395601310755

"রিলেটিভিটিও থিয়োরি। ১০ তলা থেকে লাফ দেন, প্রমাণ পেয়ে যাবেন।"

থিয়োরি জিনিসটা বুঝতে হলে আমাদের মোট চারটা বিষয় বুঝতে হবে।

আমি দেখলাম যে, গাছ থেকে নারকেল মাটিতে পড়ল। এইটা হলো ফ্যাক্ট। একটা সাধারণ স্টেইটমেন্ট, যার সত্যতা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। এটা কোনো প্রক্রিয়া বা প্রসেস না। যেহেতু এভোল্যুশন একটা প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, তাই এটা ফ্যাক্ট হতে পারে না। কিন্তু, "এভোল্যুশন হয়" এইটা ফ্যাক্ট।

আমার মাথায় এই নারকেল নিচের দিকে পড়ার কতগুলো ব্যাখ্যা এলো, মাটি নারকেলকে টানে? কেউ নারকেল ছুড়ে মারে? অলৌকিকভাবে হয়? এমনি এমনি পড়ে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হাইপোথিসিস, একটা ফ্যাক্ট এর সম্ভাব্য সব ব্যাখ্যা। এদেরকে প্রমাণ করা যায়নি এখনো।

নিউটন এলেন। তিনি বললেন,"এদের মাঝে একটা টান, একটা বল কাজ করে—নাম মহাকর্ষ। পৃথিবী আর নারকেল একজন আরেকজনের কাছে যেতে চায়, পৃথিবীর ভর বেশি বলে অত যেতে পারে না, নারকেলকেই ছুটে আসতে হয়। এই যে আমার সূত্র, $F=Gm_1m_2/d^2$ দিয়ে নারকেল পড়ার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা যায়।" এটা হলো ল' (Law)। এটা একটা পর্যবেক্ষণকৃত ফ্যাক্টকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু মহাকর্ষ আসলে কী, কেন, কীভাবে—তার উত্তর দেয় না। আবার বুধগ্রহের গতিপথ ব্যাখ্যাতেও নিউটনের ল' সক্ষম না।

এবার সবাইকে সরিয়ে সামনে আসবেন আইনস্টাইন। তিনি এসে ফিজিক্সের জগৎ কাঁপিয়ে দেবেন। তাঁর রিলেটিভিটি দিয়ে মহাকর্ষের চৌদ্দপুরুষের বিশ্লেষণ করে ফেলবেন। তাঁর রিলেটিভিটির সূত্র থেকে বের হবে নিউটনের ল'। এরপর বারবার পরীক্ষা হবে, রিলেটিভিটি প্রত্যেকবার সঠিক প্রমাণিত হবে। আর এইটাই 'থিয়োরি', 'থিয়োরি' অভ রিলেটিভিটি। আরেকবার বলেন–'থি-য়ো-রি', যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। এ জিনিস বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না, তবে পরিবর্ধন করা যায়। রিলেটিভিটি এখনো কোয়ান্টাম জগতে অচল। তাতে কী? একদিন সচল হবে, তখন রিলেটিভিটি আরো শক্তিশালী হবে, বাতিল না। ল' বাতিল করা যায়।

তাহলে বুঝলেন? থিয়োরির মর্যাদা পেতে হলে তাকে বারবার পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, একটা ঘটনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। আর বিবর্তন তা করেছে। তাই, এইটা থিয়োরি, বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে দামি জিনিস। আর ফ্যাক্ট হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মানুষ বানরের বংশধর, বানরের বাচ্চা মানুষ হয়?

সবচেয়ে হাস্যকর একটা গুজব। তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণ মানুষ বিবর্তন বলতে বানর থেকে মানুষ হওয়াকেই বোঝে। কিন্তু বিবর্তন আসলে মোটেও এমন না।

এই বানর থেকে মানুষ হওয়ার গুজব ছড়ায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত একটা বই, 'Early Man' থেকে। এর লেখক ফ্রান্সিস ক্লার্ক হওয়েল চেয়েছিলেন বিবর্তনকে একটু সহজে আর ভিন্নভাবে তুলে ধরতে। তাই, সেখানে একটা ছবি লাগিয়ে দিলেন, রুডলফ জ্যালিঙ্গারের আঁকানো। সেই পরিচিত ছবিটা- একটা বানর বসে আছে, ধাপে ধাপে সে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর মানুষের মতো 'বিবর্তিত' হচ্ছে। সবশেষে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ছবিটার নাম

ছিল- 'Road to Homo sapiens', নামটাও সেরকমই কনফিউজিং। আর ছবিতে ওই ধাপ ছিল ১৫টা।
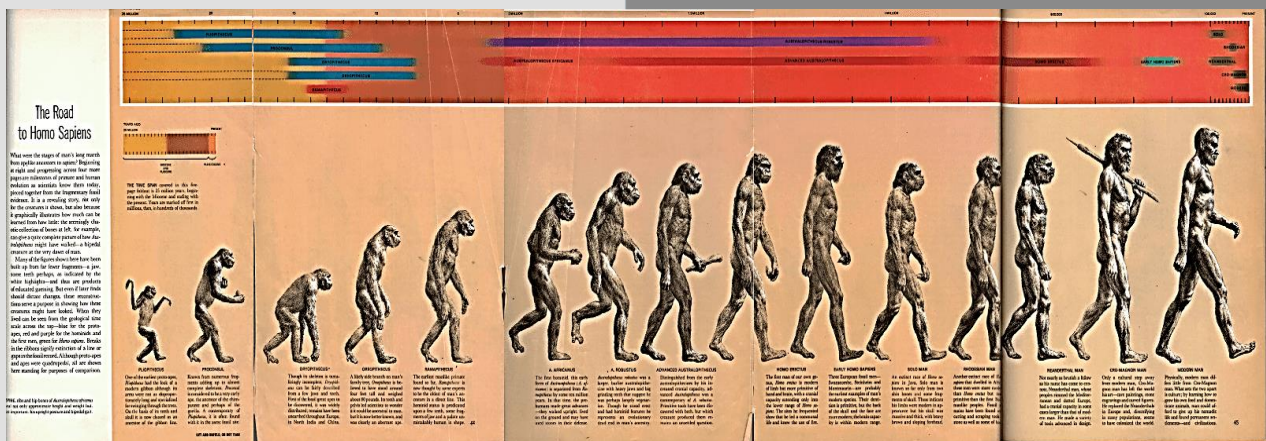
হওয়েল বোঝাতে চেয়েছেন যে, যুগে যুগে হোমিনিডদের বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, কীভাবে একেকটা বৈশিষ্ট্য একেক সময়ে একেক প্রজাতিকে বেশি কাজে দিয়েছে। আর হওয়েল এটাও টের পেয়েছিলেন যে, এই ছবি দেখে মানুষ সহজেই ভুল বুঝবে। তাই ছবির নিচে একটা সতর্কবার্তা পর্যন্ত ছিল যে, এটা বিবর্তনের গতিপথ না, হঠাৎ এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি হয়নি। কিন্তু, বইটা সেইরকম পপুলারিটি পায়, প্রচুর বিক্রি হয়। ফলে, মানুষের মুখে-মুখে, কানে-কানে ছড়িয়ে যায় গুজব, "বানর থেকে ধাপে ধাপে মানুষ হয়েছে।"
তারপর ছবিটা 'March of Progress' নামে পরিচিত হলো, আর প্রজাতির ধাপ নেওয়া হলো ১৫টার বদলে ৬টা। রটে গেল গুজব।

বিবর্তনের বেসিক নিয়ে জানতে পড়ুন ব্যাঙাচির তৃতীয় সংখ্যা।

ডাউনলোড লিংক
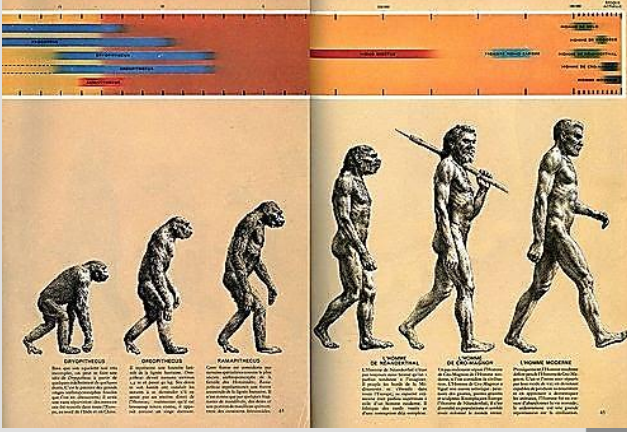
ছবিটায় আসলে কী আছে?

১৫টা ধাপযুক্ত ছবির একেবারে বামে আছে Pliopithecus, যারা ২২-১২ মিলিয়ন বছর আগে ছিল, তারা হলো গিবনদের অ্যান্সেস্টর। এরপর Proconsul, এরা ২১-৯ মিলিয়ন বছর আগে পর্যন্ত ছিল—এরা প্রাইমেট হলেও এপ (Ape) কি না, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ আছে। এরপর Dryopithecus, ১৫-৮ মিলিয়ন বছর আগে ছিল। এরা আধুনিক এপদের সম্ভাব্য অ্যান্সেস্টর। এরপর আছে Oreooithecus, ১৫-৮ মিলিয়ন বছর। Ramapithecus, ১৩-৮ মিলিয়ন বছর পুরোনো এপ, এরা বর্তমান ওরাংওটাংদের সম্ভাব্য অ্যান্সেস্টর। এবার আছে Australopithecus, ২-৩ মিলিয়ন বছর বয়স, এরা হলো প্রথম সুনিশ্চিত হোমিনিড। এরপর Paranthropus, ১.৮-০.৮ মিলিয়ন বছর পুরোনো। Advanced Australopithecus, ১.৮-০.৭ মিলিয়ন বছরের পুরোনো। Homo erectus, ৭-৪ লক্ষ বছর আগে ছিল, এরা 'Homo' গণ/genus এর প্রথম সদস্য হিসেবে বিবেচিত ছিল। তবে এখন আমরা জানি, সম্ভাব্য প্রথম সদস্য হলো Homo habilis। তারপর আছে Early Homo sapiens, ৩-২ লক্ষ বছর আগে ছিল, তারা প্রথম দিকের হোমো স্যাপিয়েন্স। এরপর আছে Homo erectus এর একটা sub-species, এরা ১ লক্ষ-৫০ হাজার বছর আগে ছিল। এরপর, Homo rhodesiensis অথবা Homo heidelbergensis, বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত না যে ওইটা কী। এরা প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে ছিল। এবার আছে Homo neanderthalensis, ১ লক্ষ- ৪০ হাজার বছর আগ পর্যন্ত এরা ছিল। এরপর আছে Cro-Magnon, ৪০-৫ হাজার বছর আগে ইউরোপে বসবাসকারী প্রথম হোমো স্যাপিয়েন্সরা। আর সবশেষে আছে Modern Man, টিকে যাওয়া হোমো স্যাপিয়েন্সরা, যারা ৪০ হাজার বছর আগে থেকে এখন পর্যন্ত আছে। এই হলো ওই ছবিটার বিস্তারিত বিবরণ।

এইভাবে উপস্থাপন করলে যে কেউ মনে করবে যে আমরা অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে ইরেক্টাস, ইরেক্টাস থেকে নিয়ান্ডারথাল, আর তা থেকে মানুষ হয়েছি। কিন্তু আসলে এমন না। আজ থেকে প্রায় ১৪ মিলিয়ন বছর আগের হোমিনিড অ্যান্সেস্টর থেকে আমরা, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও এই জাতীয় প্রাণীরা বিবর্তিত হয়েছি। বর্তমানে যারা আছে, তারা আমাদের চাচাতো ভাই, আদি পিতা না।

হোমিনিড অ্যান্সেস্টরকে ভাবুন একটা গাছের মূল। সেটা থেকে কাণ্ড, কাণ্ড থেকে প্রথমে কয়েকটা প্রধান শাখা বের হবে, সেই প্রধান শাখা থেকে আবার প্রশাখা বের হবে। আচ্ছা, প্রশাখা বের হলে কি আর শাখা থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তারপর প্রশাখা থেকে আরো ডালপালা বের হবে, কিছু শাখা একদম ওপর পর্যন্ত বড়ো হবে না, কিছু ডালপালা ভেঙে যাবে। আর এভাবেই হোমিনিডদের বিবর্তন হয়েছে।
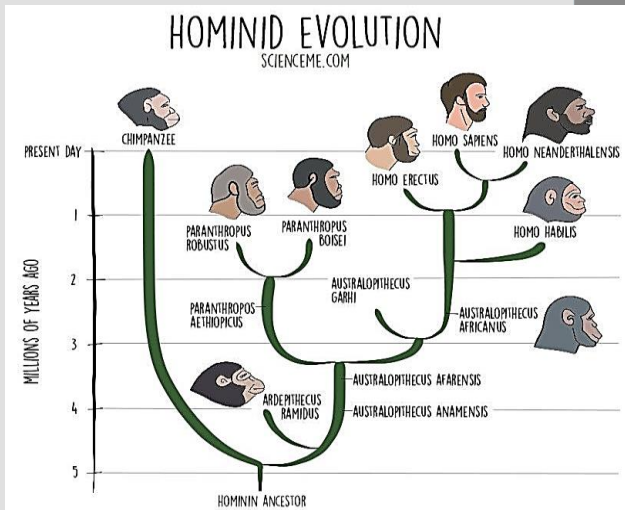
হোমো স্যাপিয়েন্স হলো সবচেয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়া একটা ডাল, আমাদের থেকে ৪০ হাজার বছর নিচে আছে আরেকটা ডালের আগা, নিয়ান্ডারথাল। তারা আর আমরা ৪০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত একসাথে ছিলাম। কিন্তু তাদের ডালটা আর বড়ো হয়নি। স্যাপিয়েন্সদের আর নিয়ান্ডারথালদের ডাল গিয়ে জোড়া লাগে ৪ লক্ষ বছর নিচে। এখানে আছে আরেকটা প্রশাখা, যা থেকে আমাদের দুইজনের ডালের উৎপত্তি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই প্রশাখা হলো Heidelbergensis-দের। এদের প্রশাখা ধরে আরও ৪ লক্ষ বছর নিচে গেলে দেখতে পাব এখানে আরেকটা জোড়া আছে। Heidelbergensis-দের প্রশাখার উৎপত্তি Ergaster (মতান্তরে Antecessor) নামক ডাল থেকে। এরা আবার এককালে সহাবস্থান করেছিল। এই ইরেক্টাস ডাল আবার নিচে জোড়া লেগেছে Homo habilis ডালের সাথে। এই হ্যাবিলিস ডাল আবার ওপরে-নিচে বিস্তৃত, নিচে গেলে দেখা যাবে এর উৎপত্তি হয়েছে অস্ট্রেলোপিথেকাস শাখা থেকে। এভাবে আমরা নিচে যেতে যেতে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর গেলে পৌঁছে যাব হোমিনিড অ্যান্সেস্টরের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখব- আছে আরো কতগুলো প্রধান শাখা, যেগুলো ধরে ওপরে উঠতে থাকলে একেবারে ওপরে পাব শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর ইত্যাদি।
তাহলে বুঝতে পারলেন? বিবর্তন সরলরৈখিক না, গাছের মতো বিস্তৃত। মানুষ হলো সেই গাছের একটা ডালের আগা, আর বানর হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা ডালের আগা। এই ডালগুলো ধরে নিচে যেতে থাকলে ৬০ লক্ষ বছর নিচে এরা জোড়া লাগবে। সেখানেই আমাদের কমন অ্যান্সেস্টর। তাই, বানররা আমাদের চাচাতো ভাই, বানর থেকে মানুষ আসার প্রশ্নই ওঠে না। আপনার চাচাতো ভাই কি আপনার দাদার বাবা হতে পারে?
(উল্লেখ্য যে, কোন প্রজাতি থেকে কোন প্রজাতির উৎপত্তি আর তাদের সময়কাল কত, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতবিরোধ আছে। আমি রিসেন্ট গবেষণাগুলো থেকে লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, এতে প্রসেসের ওপর প্রভাব পড়বে না, নিশ্চিন্ত থাকেন, প্রক্রিয়াটা একই।)

ছবিতে যথাক্রমে অস্ট্রেলোপিথেকাস, হ্যাবিলিস, আর্গেস্টার, হেইডেলবার্জেনসিস, ইরেক্টাস, স্যাপিয়েন্স।

আয়নায় নিজেকে দেখেন

বিবর্তন তো উন্নতি ঘটায়, তাহলে সব বানর মানুষ হয়নি বা হচ্ছে না কেন? এখনো বানর আছে কীভাবে?

2 নং পয়েন্টটা পড়ে বুঝতেই পারছেন যে, বানর থেকে মানুষ আসেনি, বানররাও ৬০ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ফল, আমরাও ৬০ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনেরই ফল। বানররাও একটা ডালের আগা, আমরাও। তাই সব বানর মানুষ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এখন, প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে করা যেতে পারে। মানুষ তো অন্যসব প্রাণীর থেকে বেশি বুদ্ধিমান, আমাদের জীবনযাপনও বাকিদের চেয়ে উন্নত। তাহলে সব প্রাণীর বিবর্তন কেন আমাদের মতো হয়নি? মানে তারা কেন পিছিয়ে রইল আমাদের চেয়ে? বিবর্তন যদি উন্নতিই ঘটায়, তাহলে আমরাই তো সবচেয়ে উন্নত, বাকিরা কেন উন্নত হলো না?
এই প্রশ্নের মূলে আছে দুইটা ভুল ধারণা।

প্রথমত, বিবর্তন কখনোই ভালো-খারাপের জন্য হয় না। তাহলে কীভাবে হয়?
ধরি, সবুজ একটা মাঠে ১০টা কচ্ছপ আছে। ৫টা পুরুষ, ৫টা স্ত্রী। এদের সবার রং খয়েরি ধরনের। ১টা পুরুষ আর ১টা স্ত্রী মিলে ২টা সন্তানের জন্ম দেবে। মানে, পরবর্তী প্রজন্মে আসবে আরও ১০টা কচ্ছপ। এবার র‍্যান্ডম মিউটেশনের ফলে ১টা কচ্ছপের রং সবুজাভ হয়ে গেল। ফলে? ওপর থেকে শিকারী যখন তাকাবে, সবুজাভ কচ্ছপটাকে সবুজ মাঠে দেখতে পাবে না। সে দেখবে খয়েরি কচ্ছপগুলোকে, আর তাদের অনেককে খেয়ে ফেলবে। ফলে, সবুজাভ কচ্ছপটা টিকে গেল। সেও প্রজনন করবে, তার সন্তানে সেই সবুজাভ রঙের মিউটেশন পাস হয়ে যাবে, ফলে সেই সন্তানও শিকারীর হাত থেকে বেঁচে যাবে। আর খয়েরি কচ্ছপদের সহজে দেখা যাবে বলে তারা শিকার হতে থাকবে, এভাবে সবুজাভ কচ্ছপরা টিকে যাবে। এটা ন্যাচারাল সিলেকশন। কিন্তু, দেখা গেল যে, কয়েকদিন পরেই খরার কারণে মাঠের রং আর সবুজ রইল না। ফলে? বেচারা কচ্ছপ!

ন্যাচারাল সিলেকশনের ফলে একদল জীব তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে আপাতত পরিস্থিতিতে অন্যদের থেকে তুলনামূলক বেশি সুবিধা পায়, ফলে তারা টিকে যায়। কিন্তু সেই 'তুলনামূলক' সুবিধা যে আসলেই পরম উন্নয়ন হবে, সেইটাই যে চরম সুবিধা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আবার বিবর্তন মানেই ন্যাচারাল সিলেকশন না।
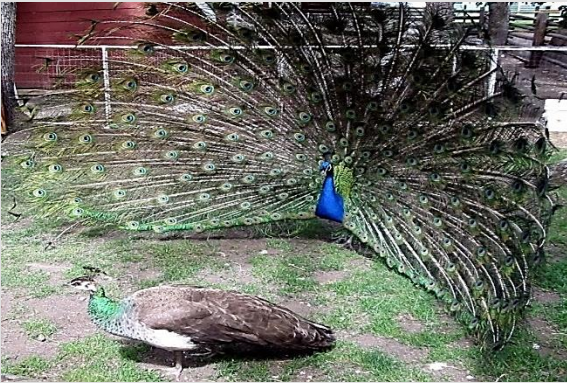
সেক্সুয়াল সিলেকশনের মাধ্যমে নারীরা পুরুষদের মাঝে এমন সব বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে দিতে পারে, যেগুলো পুরুষের জন্য অনুকূল না, প্রতিকূল। যেমন-যেসব ময়ূরের পেখম বড়ো, রঙিন, তাদের সাথেই ময়ূরীরা প্রজনন করে, ফলে বংশধররাও বড়ো, রঙিন পেখমযুক্ত হয়। কিন্তু, এমন পেখম শিকারীদের চোখে পড়ে বেশি, ময়ূরকে দৌঁড়াতে বাধা দেয়। এখানে কিন্তু বিবর্তনের ফলে খুব ভালো কিছু হয়নি।

আবার, জেনেটিক ড্রিফট নামের একটা জিনিস আছে। আমরা মনে করি যে–বিবর্তন মিউটেশন দিয়ে শুরু, সিলেকশন দিয়ে শেষ। কিন্তু, বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে যে ব্যক্তি ভালো জ্ঞান রাখেন তিনি জানেন যে, ন্যাচারাল সিলেকশন আসলে কিছুই না। বিবর্তনকে সচল রাখতে জেনেটিক ড্রিফটের ভূমিকা আরো বেশি। কীভাবে হয় জেনেটিক ড্রিফট?

ওইযে ৯০টা কচ্ছপ ছিল না? ভালোই জীবনযাপন করছিল। হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড ঝড় হলো। ঝড়ে গাছপালা ভেঙে পড়ল। ৪টা কচ্ছপ মারা গেল।
১ মিনিট নীরবতা পালন করি।

শেষ।

দেখা গেল যে, যেই চারটা কচ্ছপ মারা গেল, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল বেশি। এমন হতেই পারে! অসম্ভব কিছু না। আর বাকিদের, মানে যারা বেঁচে গেছে, তাদের এই ক্ষমতা কম। এখানেও কিন্তু বিবর্তনই হচ্ছে, কিন্তু ভালো ট্রেইট বা ভালো বৈশিষ্ট্যটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এভাবে জেনেটিক ড্রিফট হয়। র‍্যান্ডমলি একটা পপুলেশনের ট্রেইটে বিপুল পরিবর্তন চলে আসে। যেহেতু এটা র‍্যান্ডম, সবসময় ভালো জিনিসটা টিকে যায় না, মাঝেমাঝে খারাপটাও টিকে যায়। তাই, সমষ্টিগতভাবে, বিবর্তন কোনো প্রোগ্রেসিভ প্রসেস না।

দ্বিতীয়ত, মানুষ পরম উন্নত কোনো জীব না।
বানররা তাদের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। জঙ্গলে থাকতে গেলে যেসব গুণ দরকার, যেসব দক্ষতা দরকার, বিবর্তনের মাধ্যমে বানরদের মধ্যে সেসব দক্ষতা ভরে ভরে আছে। তাই, তাদের বসবাসের পরিবেশের সাপেক্ষে, বানররাই সবচেয়ে উন্নত। মানুষ ভুল করে এটা ভাবে, “আমরাই সবদিক থেকে সবচেয়ে উন্নত জীব।”
আসলে, না। সমুদ্রের ২০০ ফুট নিচে গিয়ে মানুষ বাঁচবে? জঙ্গলের গাছের ওপর থাকতে গেলে বাঁচবে? না। কেন? কারণ আমাদের বিবর্তন হয়েছে স্থলে, মাটির ওপরে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন আমাদের মধ্যে হয়েছে। অন্যদিকে বানররা জঙ্গলে গাছের ওপর ঝুলতে ঝুলতে বিবর্তিত হয়েছে, মাটিতে থাকা আর গাছে থাকা এক না। তাই বানর আর মানুষের বিবর্তন একইভাবে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যেমন- মানুষ আর বানরের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হলো দুই পায়ে হাঁটা। মানুষ মাটিতে থাকে, ডালে ঝুলতে হয় না, তাই আমাদের দুই পায়ে হাঁটার বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে, বানর গাছে থাকে, ডালের ওপর হাঁটা যায় না, তাই তাদের পায়ে হাঁটার দরকার নেই, তারা হাত-পা দিয়ে ঝুলে ঝুলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়।
এখন, আমি যখন এইটা লিখছি, অ্যামাজন জঙ্গলে কোনো বানরও হয়তো প্রশ্ন করছে,
“বানররাইতো বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত, উন্নত। তাহলে মানুষরা কেন বানরের মতো বিবর্তিত হয়নি? ধুর মিয়া, বিবর্তনবাদ ভুল।”

আর সবশেষে প্রশ্নটা, এখনো বানর আছে কীভাবে?

এই প্রশ্নটা আসলে অন্য কিছু বোঝায়। এর মূল বক্তব্য হলো, “এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি হলে সেই প্রথম প্রজাতিটা টিকে আছে কীভাবে? সেটার সব জীবরা বিবর্তিত হয়নি কেন?”
আপনি অনেক গরিব, গ্রামে থাকেন, ক্ষেতে কাজ করেন। আপনার দুইজন ছেলে, দুইজনই জন্মের পর থেকে ক্ষেতে কাজ করা শিখছে। কিন্তু একজনের মধ্যে সৃজনশীলতা, শিক্ষানবিশি বেশি। সে বন্ধুদের বই ধার নিয়ে পড়ালেখা করে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে শহরে গিয়ে নিজে বিজনেস শুরু করল। তার জীবনটাই আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু আরেকজন সেই ক্ষেতেই কাজ করতে থাকল।
বুঝলেন? একটা প্রজাতিতে একটা জীব থাকে না, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ থাকে। তাই, তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ বিবর্তিত হবে, আর বাকিরা একই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

তাহলে, আমরা বুঝতে পারলাম যে বানররাও মানুষের মতো করে কেন বিবর্তিত হয়নি। কারণ, তাদের দরকার নেই আমাদের মতো করে বিবর্তিত হওয়ার, কোনো প্রয়োজনই নেই। বানররা বনে সুন্দর, মানুষরা মাটির ওপরে।

প্রমাণ নাই, মিসিং লিঙ্ক নাই!

ভাই, থামেন। আপনি জানেন না বলে আর দেখেন নাই বলে কি কোনো প্রমাণই নাই? যতবারই একটা ফসিল আবিষ্কার হয়, সেটা একদম তেমনই হয় যেমন বিবর্তন তত্ত্ব চায়। বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে ডারউইন অ..নে..ক আগেই Transitional Fossil নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। আর পরবর্তীতে আমরা তা ঠিকই খুঁজে পেয়েছি, হুবহু তেমনই পেয়েছি যেমনটা ডারউইন বলেছিলেন।
Transitional Fossil হলো এমন একটা প্রাণীর ফসিল, যে নিজের আদি পিতার সাথে, আর নিজের বংশধরের সাথে সাধারণ গুণাবলি বা কমন ট্রেইট শেয়ার করে। একটা ট্র্যাঞ্জিশনাল ফসিলে আমরা এর অ্যান্সেস্ট্রাল গ্রুপের বৈশিষ্ট্য আর এর থেকে ডিসেন্ডেন্ট গ্রুপের বৈশিষ্ট্য–উভয় খুঁজে পাব। আর এমন ফসিল আছে, অহরহ আছে, প্রত্যেক প্রজাতির জন্য আছে।
আর এই Transitional Fossil এর বিকৃত রূপই হলো Missing Link.

2 নং পয়েন্টে ওই ছবিটার কথা বলেছিলাম না? ওইখান থেকেই এই মিসিং লিঙ্কের উৎপত্তি। পরপর ৬টা ধাপ দেখে মানুষ কিছুটা এমন ভাবছে যে বানরের বাচ্চা হাবিলিস, হাবিলিসের বাচ্চা ইরেক্টাস, ইরেক্টাসের বাচ্চা অস্ট্রেলোপিথেকাস, ওর বাচ্চা হেইডেলবার্জেনসিস, ওর বাচ্চা নিয়ান্ডারথাল, ওর বাচ্চা আমরা স্যাপিয়েন্স। এই হলো বিবর্তন তত্ত্ব, এই কি সম্ভব, এদের মাঝখানের জীবগুলো কই?”

তারা আসলে ওই মার্চ অফ প্রোগ্রেস থেকে প্রশ্ন করে, “বানর আর মানুষের মাঝখানের প্রাণীগুলো কই?” তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, আবারও বলি, 'তর্কের খাতিরে মাত্র', যে, বানর থেকেই মানুষ আসছে। তাহলে ওই যে ৬টা বা ৯৫টা ধাপ, ওর শুরুতে আছে বানরের মতো প্রাণী, আর শেষে আছে মানুষ। মাঝখানের ৯৩টা বা ৪টা ধাপই

তো বানর আর মানুষের মধ্যের তথাকথিত 'মিসিং লিঙ্ক', তাদের সংজ্ঞানুসারেই। এই প্রত্যেকটার ফসিল আমরা পেয়েছি, আর প্রতিদিন পেয়েই চলেছি। তাহলে তাদের প্রশ্নের ভিত্তি রইল কই?

আসলে এখানে ঘটে কী? নিচের রঙিন ছবিটা দেখেন।
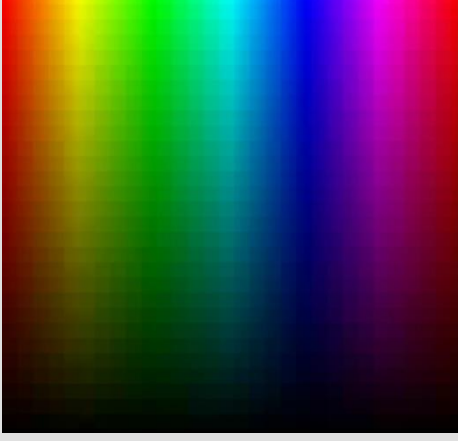
ধরেন, একেবারে নিচে আছে হোমিনিড অ্যান্সেস্টর, কালো। ধীরে ধীরে ওপরে রঙিন হচ্ছে। ডান থেকে শুরু করে বামে যথাক্রমে মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং ইত্যাদি সব ধরে নেন। আর আমরা শুধু তাদের বিবর্তনকেই কল্পনা করছি যারা এখনও টিকে আছে, যেসব হোমিনিডরা বিলুপ্ত, তাদেরকে ধরছি না, বোঝার সুবিধার্থে। মানে এবার ডাল ধরে সোজা এগিয়ে যাব, কোনটা থেকে কোন শাখা-প্রশাখা বের হলো, সেটা দেখব না।

তো, এইবার বলেন। কালো থেকে শুরু করে ওপরে রঙিন পর্যন্ত, ঠিক কোন বিন্দুতে একটা নির্দিষ্ট রঙের শুরু। কেউ বলতে পারেন? না, পারবেন না। কারণ, এটা একটা গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। কেউ কোনোদিনও বলতে পারবে না যে ঠিক এই জায়গায় বেগুনি রঙের শুরু, কালো রঙের শেষ বা ঠিক এই বিন্দুতে লাল রঙের শুরু।

একইভাবে প্রত্যেক প্রাণীর বিবর্তন হয় অত্যন্ত গ্র্যাজুয়ালি, অনেক ধীরে ধীরে। আপনি আপনার বাবা-মা থেকে কতটুকু আলাদা? বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কতটুকু? অনেএএক কম। আপনার দাদা? অনেএএএক কম। দাদার দাদা? অনেএএক কম। তারও দাদা? অনেএক কম, তারও দাদা? অনেক কম। এভাবে, যত পিছনে যেতে থাকবেন, বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য তত বেশি বাড়বে। ২ মিলিয়ন বছর আগে গেলে, মানে প্রায় ২০ হাজার প্রজন্মের বেশি, সেই ভদ্রলোককে দেখে আপনি বলবেন 'বান্দর', জি হ্যাঁ, উনিও আপনার দাদাই, তবে অন্য প্রজাতির।

বিজ্ঞানে থিওরীর উপরে কিছু নাই। কথায় কথায় যারা "ফ্যাক্ট" শব্দটা ব্যবহার করেন তারা কয়েকটি স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট খুঁজে বের করেন তো বাপ্পু! এছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল প্রমাণইত হয়েছে এমন খুঁজে পেলে আমাদের জানাবেন কিন্তু।
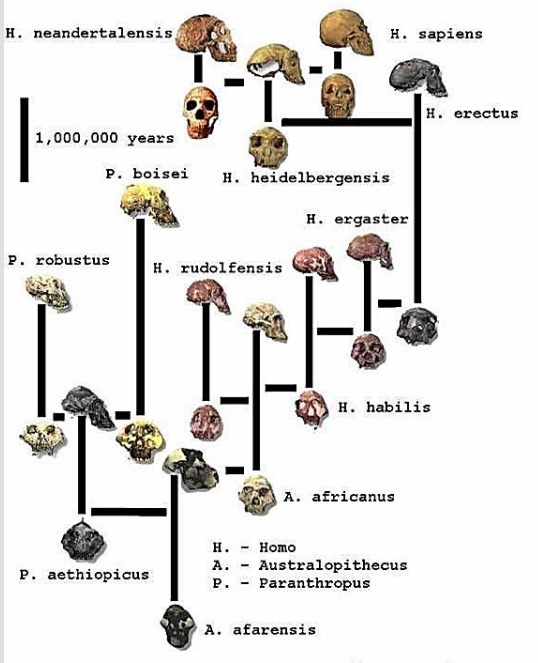
ঠিক কোথায় একটা প্রজাতির শুরু, আর ঠিক কোথায় শেষ তা বিজ্ঞানীরাও বলতে পারেন না যে, "অমুক জীবের ৩০ হাজার প্রজন্ম পর নতুন প্রজাতি বিবর্তিত হয়", এভাবে বলা অসম্ভব। কারণ ৩০ হাজার ১ নাম্বার জীব হলো ৩০ হাজারতম জীবেরই সন্তান, পিতা-মাতা আর সন্তানের মধ্যে পার্থক্য তো থাকেই না বলা চলে, তাহলে তারা আলাদা প্রজাতি হবে কীভাবে? কিন্তু অতি সামান্য, নগণ্য পার্থক্য যুক্ত হতে হতে একসময় বিশাল পার্থক্য তৈরি করে। তখন আমরা বুঝি যে, নতুন প্রজাতি এসেছে।

যখন আমরা একটা ফসিল খুঁজে পাই, বৈশিষ্ট্য মিলাতে চেষ্টা করি। আগের থেকে আবিষ্কৃত কোনো প্রজাতির সাথে জিন হুবহু মিলে গেলে ভালো, না মিললে নতুন প্রজাতি। তবে, এই নতুন প্রজাতির মধ্যে সবসময় জিনের মিক্সচার থাকে, দুইটা আলাদা প্রজাতির জিনের মিক্সচার, এর আদি পিতার, আর এর থেকে উৎপত্তি পাওয়া প্রজাতির। সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি। তারপর ম্যাপিং করতে পারি যে, ঠিক কত বছর আগে কোথায় এটা ছিল। এই নতুন প্রজাতির জীবটাই তার আদি পিতা আর বংশধরদের মাঝের মিসিং লিঙ্ক, সঠিক ভাষায়, 'Transitional Fossil', বিবর্তনের প্রমাণ।

এখন, মিসিং লিঙ্কওয়ালারা কী বোঝাতে চায় আমি জানি না। তারা কী চায় যে, ৬০ লক্ষ বছরে যত জীব ছিল তাদের প্রত্যেকের মা-বাবা আর সন্তানের ফসিল পরপর সাজিয়ে রাখা হবে? এ নিতান্তই পাগলের প্রলাপ। কোনোদিনও সম্ভব না।

আবার, ওই রঙিন ছবিটা দেখেন, একে আপনি যত জুম করবেন, করতেই থাকবেন, সবশেষে গিয়ে দেখবেন যে এত জুম করে ফেলছেন যে রঙের পার্থক্য বোঝা যায় না। এটাই পিতা-মাতা আর সন্তানের স্তর, মানে মাত্র কয়েক প্রজন্মের স্তর মাত্র। আবার, যত জুম আউট করবেন, প্রজন্মের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, এবার বুঝবেন যে রঙে পার্থক্য আছে, কিন্তু ঠিক কোন বিন্দুতে এই পার্থক্যের শুরু-শেষ, তা জানা যাবে না, অসম্ভব।

মিসিং লিঙ্কের ধারণাটাও এজন্যই ভুয়া। বিবর্তন লাফিয়ে লাফিয়ে হয় না, এটা প্রবাহমান নদীর মতো। কোনো প্রজাতির প্রথম জীব-শেষ জীব নির্ণয় করা অসম্ভব। এখনো যারা মিসিং লিঙ্ক নিয়ে লাফায়, তাদেরকে 'মিসিং ব্রেইন' ট্যাগ দেওয়ার তীব্র দাবি জানাচ্ছি।

এখন বিবর্তন হয় না

আগের পয়েন্টগুলো যদি ভালোভাবে বুঝে থাকেন, তাহলে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝেছেন যে, বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া। ৬০ লক্ষ বছর ধরে হোমিনিড অ্যান্সেস্টর থেকে মানুষ আসছে, প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর ধরে বিবর্তন হয়ে সকল জীবের কমন অ্যান্সেস্টর থেকে ৮.৭ মিলিয়ন প্রজাতির প্রাণী টিকে আছে।

আর আপনি মিয়া ৬০ বছর বাঁচবেন না কি সন্দেহ, আপনি চান এক প্রজাতি থেকে পুরো আরেক প্রজাতির বিবর্তন দেখতে? বামন হইয়া চাঁদ ধরবেন?

আগের পয়েন্টের জুম ইন-আউটটুকু আরেকবার পড়েন।

আরও কয়েকটা উদাহরণ দিই। আপনি কখনো ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাকে নড়তে দেখেন? না। কিন্তু কতক্ষণ পর তাকালে বুঝতে পারেন যে কাঁটাটা নড়েছে। বিবর্তনও সেইম জিনিস। কয়েক প্রজন্ম খুব কম সময়, কয়েক হাজার প্রজন্ম কমপক্ষে পার হলে পার্থক্য দৃশ্যমান হওয়া শুরু হয়।

আবার, আপনার বাবা কি কখনো রাতের বেলা জোয়ান অবস্থায় ঘুমাতে গিয়ে সকালে উঠে বুড়ো হয়ে গেছে? না। খুব ধীরে ধীরে আমাদের বয়স বাড়ে, একদিন-একরাত খুব কম সময় এটা বোঝার জন্য। ১০-২০ বছর পর আপনি বুঝতে পারেন, "নাহ্, বুড়া হইয়া যাইতাছি।" বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।
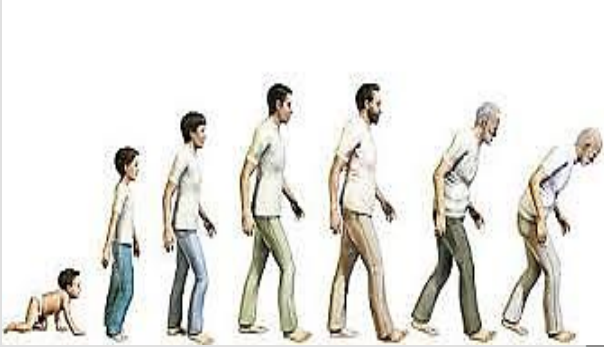
বিবর্তন সর্বদাই ঘটছে, কিন্তু এর প্রভাব বোঝা যায় মিলিয়ন বছরের লেভেলে, আপনি ১০০ বছর বাঁচলেও বিবর্তনের প্রভাব দেখতে পারবেন না। আমরা, মানুষরা এখনো বিবর্তিত হচ্ছি, ২-৩ মিলিয়ন বছর পরে বোঝা যাবে যে, মানুষদের থেকে আসলেই সম্পূর্ণ আলাদা কোনো প্রজাতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ২-৩ মিলিয়ন বছরের মাঝখানে যত মানুষ জন্মাবে, কেউই বুঝতে পারবে না যে, তারা বিবর্তিত হচ্ছে। একদিন হয়তো কেউ মাটি খুঁড়বে, মাটি খুঁড়ে দেখবে অদ্ভুত দেখতে এক প্রাণীর ফসিল, জিন নিয়ে পরীক্ষা করবে, তারপর বুঝতে পারবে যে এটা তাদেরই আদি পিতা, হোমো স্যাপিয়েন্স। হাহ্! ইমোশনাল লাগছে।
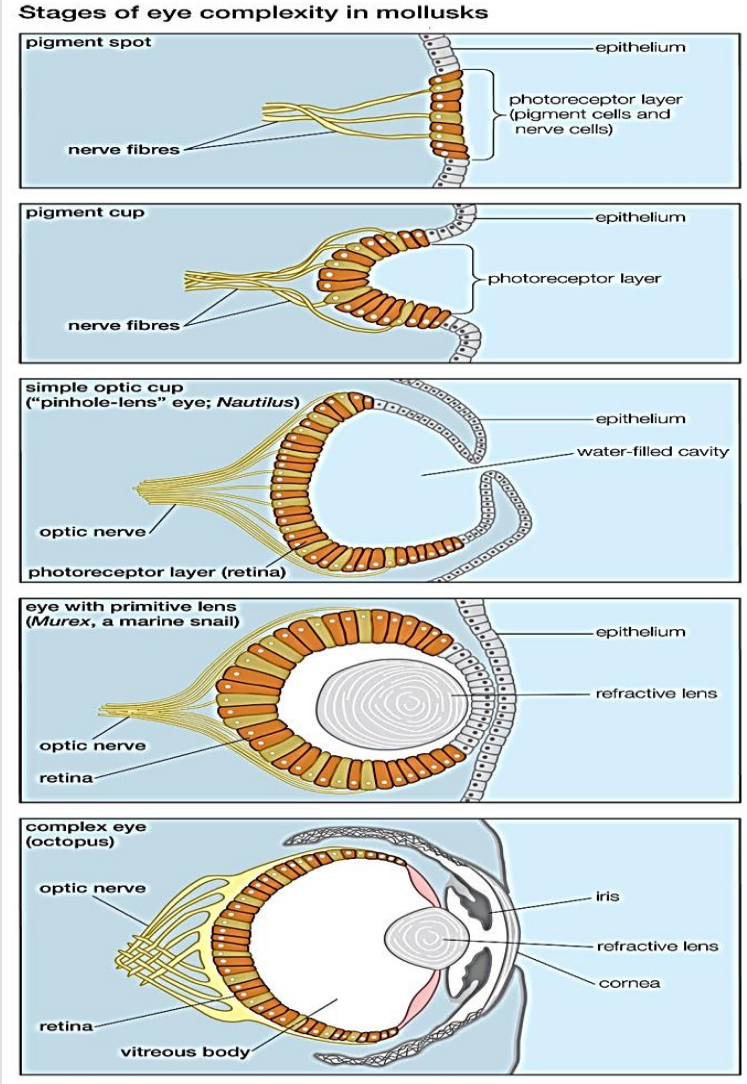
প্রাণীদের চোখের বিবর্তন হইছে, তাহলে এটা যখন অর্ধেকপথে ছিল, কাজ করেছে কীভাবে?

আপনারা বিবর্তনকে কী মনে করেন জানি না! এটা কি তাসের ঘর বানানোর মতো যে অর্ধেক থাকলে হবে না, একেবারে ওপরে উঠতেই হবে?

একটা বিল্ডিং কীভাবে বানায়? আগে মাটির নিচে কাজ করে, তারপর পিলার বানায়। পিলারের ওপর সামিয়ানা টাঙায়েও থাকা যায়। এরপর ওয়াল বানায়, শুধু ওয়াল থাকলেও তার মধ্যে কোনোভাবে থাকা যায়। এরপর ছাদ দেয়, এবার ভালোভাবেই থাকা যায়। তারপর প্লাস্টার করে, রং করে। দরকার কী? এইসব না করলেও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা হতোই। এরপর আবার দরজা-জানালা দেয়, ভিতরে লাইট-ফ্যান আসবাবপত্র আনে, তারপর তাকে আমরা একটা সুন্দর বাড়ি বলি।

কিন্তু যার থাকার জন্য ঘরই নাই, তাকে শুধু ৪টা ওয়াল করে দিলেও তার মধ্যে দিব্যি আরামে থাকবে।
বিভিন্ন জটিল অঙ্গের বিবর্তনও এভাবেই হয়। অর্ধেক চোখ অন্তত চোখ না থাকা থেকে ভালো- এভাবে চিন্তা করেন, সবার আগে চোখই ছিল না।

দীর্ঘদিনের মিউটেশনের মাধ্যমে কোনো জীব একটা আলোকসংবেদী কোষ পেয়ে গেল। সে এবার শিকারীর আলো-ছায়া দেখতে পারল। ফলে? তার প্রজাতির অন্যান্যদের তুলনায়, তার শিকার হওয়ার আশঙ্কা কমে গেল। ফলে সে টিকে গেল, এই ট্রেইটটা পাস করল।
এবার, সেই আলোকসংবেদী কোষের চারপাশে দীর্ঘদিনের মিউটেশনের ফলে একটা কাপ (cup) এর মতো তৈরি হলো। ফলে? ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে আলো আসলে সে বুঝতে পারত। তার প্রজাতির অন্যরা শুধু আলো-ছায়া বুঝলেও সে আলোর দিক বুঝতে পারল। ফলে শিকারী আসার দিক বুঝতে পেরে বেঁচে গেল। বাকিরা মারা গেল। এই ট্রেইটটাও টিকে গেল।

ধীরে ধীরে কাপটা গোল বৃত্তের মতো হতে লাগল। শুধু বৃত্তের মতো কেন হবে? একেক জনের একেক রকম কাপ ছিল, তবে যারটা বৃত্তের মতো, সে আরো ভালোভাবে দিক বুঝতে পারল। ফলে সে টিকে গেল।
এবার, বৃত্তের মতো হতে হতে অনেকের সেই আলোকসংবেদী কোষের ওপর কাপটা বন্ধ হয়ে গেল, ফুটো রইল না। ফলে আলোই প্রবেশ করল না, শিকারী থেকে বাঁচতে পারল না, মারা গেল।
টিকলো কে? যার কাপের সামনে ছোটো একটা ফুটো আছে। সে সূক্ষ্মভাবে আলোর দিক বুঝতে পারল।
এবার, মিউটেশন হতে হতে সে ফুটোর ওপর জেলি জাতীয় পদার্থ ডেভেলপ করল, তা লেন্সের মতো কাজ করে। ফলে, আগে শুধু আলো-ছায়া আর তার দিক দেখলেও, এখন সে অনেকটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পারে। ফলে, কোন শিকারী, কোন দিক দিয়ে, কীভাবে আসছে, সব বুঝতে পারল। ফলে সে টিকে গেল। এভাবে বিবর্তন চলতে থাকল, আরো জটিল থেকে জটিল চোখ বিবর্তিত হলো।
এই ছিল বাচ্চাদের জন্য চোখের বিবর্তনের কাহিনি।

মনে রাখতে হবে, এখানে প্রত্যেকটা ধাপই বিশাল সময়, বহু প্রজন্ম আর বহু মিউটেশনের ফল। ৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে প্রথম চোখের মতো অঙ্গযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব হয়। চিন্তা করেন, ৫৫০ মিলিয়ন বছরে একটা আলোকসংবেদী কোষ থেকে ঈগলের চোখের মতো জটিল কিছুর আবির্ভাব বিবর্তনের জন্য কিছুই না। একজন বিজ্ঞানী তো গবেষণা করে এ-ও বলছেন যে, মাত্র একটা আলোকসংবেদী কোষ থেকে যদি শুরু করি, আর যদি প্রতি প্রজন্মে মাত্র ০.০০৫% উন্নতি ঘটাই, তাহলে জটিল চোখ পেতে মাত্র ৩৬৪০০০ বছর লাগবে। ভাবুন, আমাদের কাছে আছে ৫৫০ মিলিয়ন বছর! কত কিছু হওয়া সম্ভব!

সুতরাং, ১% উন্নত চোখ অন্তত চোখ না থাকা থেকে ভালো। অন্যদের যখন কিছুই ছিল না, একটা জীব তখন একটা আলোকসংবেদী কোষ পেয়েছিল মাত্র, অত বেশি কিছু না হলেও 'অন্যদের তুলনায়' এটা অনেক কিছু। আর আগেই বলেছি, বিবর্তন সাময়িক পরিস্থিতে টিকিয়ে দেয়ার কাজটাই করে। তাই, অর্ধেক উন্নত চোখও কাজ করে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কানা মামার চেয়ে এক চোখওয়ালা মামা ভালো।

বিবর্তন মানেই ডারউইন আর ন্যাচারাল সিলেকশন

থামেন ভাই, থামেন। বিজ্ঞানীরা পাগল না যে, ডারউইন নামের এক লোক একটা বই লিখে তত্ত্ব দিয়ে দেবে আর আমরা মাথা পেতে নিয়ে নেব। ১৯ শতকের মাঝামাঝি দিকে ডারউইন আর ওয়ালেস স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তন তত্ত্ব দেন। তাঁদেরও আগে, অনেক আগে আল জাহিয নামের আরবীয় বিজ্ঞানী তার কিতাব-আল-হায়াওয়ানে ন্যাচারাল সিলেকশন নিয়ে সামান্য ধারণা দেন। (ছবি : কিতাব আল হায়াওয়ান ও আল জাহিয)
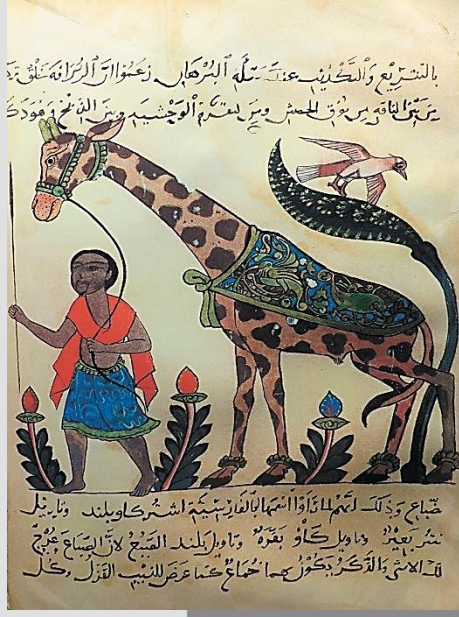
তারও আগে গ্রিক, রোমান আর চাইনিজরা এভোল্যুশন নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রিক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্ডার, এম্পিডক্লিস, অ্যারিস্টটল, জিনোর কাজ উল্লেখযোগ্য। চাইনিজ চিন্তাবিদ ঝুয়াং ঝৌ, রোমান সাম্রাজ্যের লুক্রেটিয়াসও এই নিয়ে লিখেছেন। চতুর্থ শতকে বিশপ অগাস্টিন অফ হিপ্পো জেনেসিসের কাহিনিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে অনেকটা এভোল্যুশনময় করে তোলেন। এই গেল প্রাচীন যুগ।

মধ্যযুগে আরব অঞ্চলের আল জাহিয, ইবনে খালদুন চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও বিবর্তন নিয়ে প্রশংসাযোগ্য কাজ করেন।

১৭ শতকের প্রথমার্ধে রেঁনেসাসের সময়, রেনে দেকার্তে, বেনয়েট দে মাইলেট, পিয়েরে লুইস মপের্তুইস, শেষার্ধে জন রে-এর কাজে এভোল্যুশনের ছাপ দেখা যায়।

১৮ শতকে ফ্রেঞ্চ দার্শনিক জর্জেস লুইস লেক্লের্ক, ডে বাফন, ডেনিস ডিডেরট ও স্কটল্যান্ডের জেমস বার্নেট, লর্ড মনবড্ডো এভোল্যুশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন। এমনকি ডারউইনের দাদা, ইরাসমাস ডারউইন, সকল প্রাণীর মাঝে সম্পর্ক ও কমন অ্যান্সেস্টরের ধারণা দেন।

১৯ শতকে জর্জ কাভিয়ার, জেমস হাটন, উইলিয়াম স্মিথ, আলেক্সান্ডার ব্রংনিয়ার্ট, জন ফিলিপস, এডাম সেজউইক, উইলিয়াম বাকল্যান্ড, চার্লস ল্যায়ল, জন ব্যাপ্টিস্ট ল্যামার্ক, রবার্ট অ্যাডমন্ড গ্র্যান্ড, সেইন্ট হিলায়রে, রবার্ট চ্যাম্বার, উইলিয়াম পেলি, লুইস অ্যাগাসিয, রিচার্ড ওয়েন, লরেন এইসেলেয়, অগাস্টিন দে ক্যান্ডোলে, উইলিয়াম হারবার্ট, থমসা রবার্ট ম্যালথাস। এরপর ডারউইন ও ওয়েলস।

ব্যাঙাচির তৃতীয় সংখ্যা পড়া শেষ? কেমন লাগলো?

বিবর্তন নিয়ে আরও জানতে চান? সহজ সাবলীল ভাষায় লেখা এই সিরিজটি আপনার জন্য।

https://www.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/33670660933770

এত নাম পড়েন নাই জানি। শুধু এইটুকু বোঝালাম যে, বিবর্তন মানেই ডারউইন না। এরপর ২০ আর ২১ শতকে
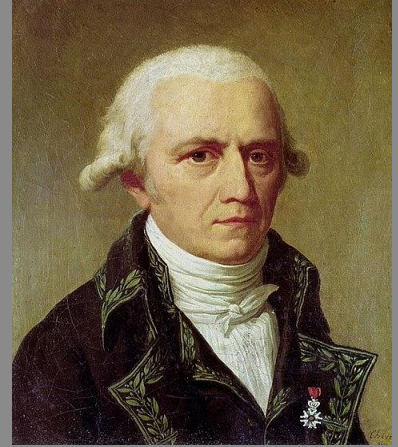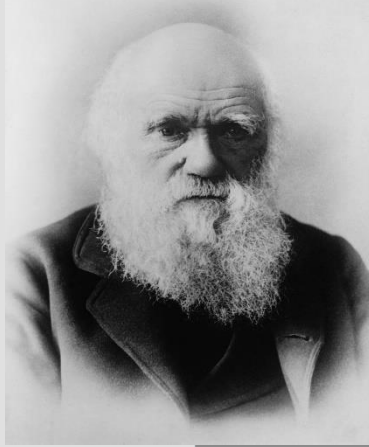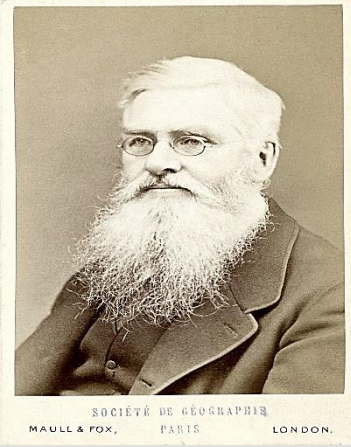
যত লোক এই নিয়ে গবেষণা করেছেন আর কতবার যে বিবর্তন তত্ত্ব সংশোধিত হয়েছে, তা বলা শুরু করলে আর শেষ হবে না। যাদের নাম না নিলেই নয়— গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল, হার্ডি-ওয়েইনবার্গ, মর্গান, হওয়েল আরও অনেকে।

উপরের ছবিতে ল্যামার্ক, ডারউইন আর ওয়ালেস।
তাই, বিবর্তন শুধু ডারউইনের কাজ না। তিনি এটাকে শুধুই স্পটলাইটে আনেন। আর ন্যাচারাল সিলেকশনই যে বিবর্তনের একমাত্র মেকানিজম না, তা উপরে পয়েন্টেই বলেছি।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র সত্য হলে বিবর্তন মিথ্যা

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বলে, "কোনো আবদ্ধ সিস্টেমের মোট এন্ট্রপি সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাবে।"
এনট্রপি মানে বিশৃঙ্খলা। এই সূত্র কাজে লাগিয়ে বলা হয় যে, বিবর্তন হলে তো বিভিন্ন প্রজাতির উন্নয়ন হয়, তাদের মধ্যে অর্ডার বা শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই সূত্র সত্য হলে বিবর্তন মিথ্যা।
জীবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এন্ট্রপি কাজে লাগানো নিতান্তই মূর্খতা। তাছাড়া তাদের যুক্তির আগা-মাথা নেই। বিবর্তনের ফলে প্রজাতির ভিন্নতা সৃষ্টি হয়, এতে তো বিশৃঙ্খলা আর জটিলতা বাড়ার কথা, কমলো কীভাবে?
আরেকটা কথা, সূত্রে বলা আছে, 'আবদ্ধ সিস্টেম' যেমন মহাবিশ্ব—এখানে বাইরে থেকে শক্তি ভেতরে ঢোকেও না, ভেতর থেকে শক্তি বাইরে বেরও হয় না। ফলে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি বাড়বেই। বিগ ব্যাং এর সময় সবকিছু একসাথে ছিল, এরপর জায়গায় জায়গায় গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, ভর-শক্তি অসমভাবে ছড়িয়েছে।
কিন্তু পৃথিবী কি আবদ্ধ সিস্টেম? সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা বিপুল পরিমাণ শক্তি পাই। তাই, সেই সূত্র এখানে কাজে লাগবে না।
আর তাই, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে বিবর্তনকে মিথ্যা বলা একদম মূর্খতা, বোকামি।

বিবর্তন নিয়ে যেকোনো সংশয় দূর করতে বা জানতে নির্দ্বিধায় আমাদের গ্রুপে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

টাইম ট্রাভেল

হাম্মাদ চৌধুরী

১.

কানে হেডফোন গুঁজে মনের আনন্দে গান শুনছি। এমন সময় এলো রাকিবের কল। "দোস্ত, নতুন একটা জিনিস বানাইছি। জলদি আয়।।", ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো রাকিবের। আমি আলসেমি করে একটা হাই তুললাম। যদিও এটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা কথা, তবে আমার জন্য এটা যেন একটা নিত্যদিনের ঘটনা।

ও আচ্ছা, রাকিবের সম্পর্কে তো কিছু বলাই হয়নি! রাকিব হলো আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মহাকাবিল সায়েন্টিস্ট। সে যখন স্কুলে নতুন এসেছিল, তখন আমরা সবাই তাকে হাবা টাইপের ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, সে কত্ত বড়ো ভয়ংকর একজন সায়েন্টিস্ট।
একবার সে তার এক্সপেরিমেন্টের জন্য তার আগের স্কুলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্কুলটাকেই বিদায় করে দিয়েছিল, যদিও কথাটা শুধু আমি আর রাকিবই জানি। সে শুধু একটা বিষয় ভালো পারে এবং তা হলো বিজ্ঞান। যেখানে আমাদের মতো আজাইরা ছেলেরা ফেইসবুকে স্ক্রল করে টাইমকে বাতাসে উড়িয়ে দেয়, ঠিক তখন তাকে পাওয়া যায় বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো ওয়েবসাইটে। আইনস্টাইন কিংবা নিউটন আমাদের কাছে সাধারণ দুইজন বিজ্ঞানী, কিন্তু তার কাছে এঁরা হলেন তার মহাগুরু। তার মতে, মাঝে মাঝে নাকি তার স্বপ্নে আইনস্টাইন এসে তার সাথে আড্ডা দিয়ে চলে যান। মাঝে মাঝে নাকি নিউটনও আসেন। এই পর্যন্ত তার আবিষ্কারের তালিকায় রয়েছে অনেক কিছু। টেলিপোর্টেশন মেশিন থেকে শুরু করে অদৃশ্য হওয়ার তরিকাও তার জানা আছে।
একবার সে তার পার্সোনাল এরোপ্লেন সঠিকভাবে কাজ করছে কি না সেটা যাচাই করার জন্য আমাকে নিয়ে তার পার্সোনাল এরোপ্লেনে করে স্কুল থেকে বাসা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু এই রাকিব গাধার প্লেনটা আম গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। ঠিক যা হওয়ার তাই হলো।

মোটামুটি এক ধরনের আবিষ্কারের নেশা আছে তার। তবে তার মা মনে করেন, এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সময় দেওয়ার কারণেই নাকি বর্তমানে তার পড়ালেখার এই অবনতি। তাই বেচারার সকল গবেষণা করতে হয় তার মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে, স্কুলের কমন রুমে। কমন রুমটা স্কুলের পেছনের জঙ্গলে। তাই সেখানে কেউ না যাওয়ায় সেটাকে সে বানিয়ে ফেলেছে তার "পার্সোনাল ল্যাবরেটরি"। আর হ্যাঁ, তার একটা অবদভ্যাসও আছে। সে যেগুলো তৈরি করে, সেগুলো যদি সফল হয়, তবে সে সেটা শুধু ফ্রেন্ডদের দেখিয়ে আবার ভেঙে ফেলে। তার মতে,"যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তো আবার বানানো যাবে। শুধু শুধু জমিয়ে রেখে লাভ কী?"
সব বিজ্ঞানীই যে একপ্রকার পাগল হয় সেটা আমি তাকে দেখেই নিশ্চিত হয়েছিলাম।
২.
রাকিবের পার্সোনাল ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে গেছি। সে আমার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "দোস্ত, একটা টাইম মেশিন বানাইছি।।"
আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তো কী হইছে? আবারও তো ভেঙে ফেলবি।"।
সে আমার কথার উত্তর না দিয়েই তার টাইম মেশিনটার দিকে এগুতে লাগল। আমিও তার পিছু

নিলাম। মেশিনটা খুব বেশি বড়োও নয়, আবার খুব বেশি ছোটোও নয়। মানে, মাঝারি সাইজের আরকি।
এবার সে তার দ্বিতীয় কথাটা উচ্চারণ করল। বলল, "আয়, ভেতরে ঢুক।"।

তার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ঢুপ করে উঠল। আবার কী না কী নতুন গোলমাল বাঁধিয়ে ফেলে। আমি খানিকটা তোতলিয়ে বললাম, "আ-আ-আমি?" সে পাল্টা উত্তর দিলো, "না, তুই না, হাম্মাদ (আমার নাম)।।" এবার আমি ভয়ে ভয়ে টাইম মেশিনটার দিকে পা বাড়ালাম। দেখলাম টাইম মেশিনটার ভেতরে দুইটা সিট। সিট দুইটার সামনে নানান ধরনের ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র। আমি ভদ্র ছেলের মতো একটা সিটে বসে পড়লাম। আমার পাশের সিটে রাকিব গম্ভীরভাবে বসে পড়ল। এবার সে কতগুলো বোতাম টেপার সাথে সাথেই টাইম মেশিনটা ঝাঁকুনি দিতে শুরু করল। ভয়ে এবার আমার শরীরসুদ্ধ ঠান্ডা হয়ে এলো। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আ-আ-আমি বেরিয়ে যাব।"।

রাকিব চিৎকার দিয়ে বলল, "আরেকবার বের হওয়ার কথা বললে লাত্থি মেরে বের করে দেবো।"। এবার আমার ভয়ে কান্না চলে আসতে চাইল। কিছুক্ষণ পর রাকিব শান্তভাবে বলল, "হুঁ, এবার বের হ।"।

৩.
টাইম মেশিনটাকে জায়গামতো রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাকিব বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, "ওয়েলকাম টু ২০৫৪।"।
আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর এগুতেই লোকদের মধ্যে বলাবলি করতে শুনতে পেলাম, "বাংলাদেশের কোনো এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী নাকি আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে আসবেন।"।
এটা শুনে আমাদের বিজ্ঞান পাগলা ঠিক করল, সে ওই অনুষ্ঠানে যাবে, কেননা সে না কি ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে আলোচনা করা হবে সেটা জানতে প্রচুর আগ্রহী। মানুষদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, অনুষ্ঠানটা হবে আমাদের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্যারেড ময়দানে। সময় যতই হোক না কেন, চির পরিচিত এই শহরে তো আর হারানোর কোনো ভয় নেই। তাই খুব সহজে আমরা প্যারেড ময়দানে পৌঁছে গেলাম। কিছুটা দেরিই হয়ে গেল। পৌঁছানোর পর দেখলাম বসার জায়গা নেই। তাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। মাইকের আওয়াজ শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মাইকে শুনতে পেলাম, "আমি বিজ্ঞানীকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, "আমি রাকিব। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন। আসলে এই দিনটির জন্য আমি আমার গত ৩৪ বছর ধরে অপেক্ষা করছি। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে আমি ছোটোবেলায় একবার আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আমার নিজের বানানো টাইম মেশিনে করে ২০২০ সাল থেকে ২০৫৪ সালে ঠিক এই জায়গাতেই এসেছিলাম। আমি নিশ্চিত আমার ছোটবেলার আমি আপনাদের মাঝে এখানে কোথাও আছে।"।

আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না কী হচ্ছে। আমি রাকিবের দিকে তাকাতেই দেখলাম তার চোখ ছল ছল করছে। পুরো বক্তব্য না শুনেই রাকিব টাইম মেশিনটার দিকে এগুতে লাগল। আমিও তার পিছু পিছু যেতে থাকলাম। সে আমাকে কোনো কিছু না বলেই টাইম মেশিনে বসে গেল। আমি তার পাশে গিয়ে বসে বললাম, "কী! হলো? বক্তব্য শুনবি না?"
সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "অজানা অজানাই থাক, ভবিষ্যতে জেনেই যাব।"।
নিজের অজান্তেই আমার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল।

লিওনিডস উল্কাবৃষ্টি

হৃদয় হক

লিওনিডস ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উল্কাবৃষ্টি। হবেই না বা কেন? এই যে আমরা 'উল্কাবৃষ্টি' টার্মটা ব্যবহার করছি, তার জন্মই এ উল্কাবৃষ্টির কল্যাণে। সত্যি বলতে, এই উল্কাবৃষ্টির হাত ধরেই জ্যোতির্বিদ্যার যে শাখা উল্কা নিয়ে কাজ করে, সেই 'মিটিয়র অ্যাস্ট্রোনমি'-এর জন্ম।

সময়টা ১৮৩৩ সালের ১২ই নভেম্বর। কয়েকজন জ্যোতির্বিদ রাত ১১টার আকাশে অস্বাভাবিক মাত্রার উল্কাপাত লক্ষ করেন। কিন্তু রাত ১২টার পর তথা ১৩ই নভেম্বর ভোর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। সমগ্র আকাশ ভরে ওঠে উল্কায়। কবি জীবনানন্দের ভাষায় যদি বলি, "কাল এমন চমৎকার রাত ছিল। সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল। আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না।"

সেদিন রাতে এত উজ্জ্বল এবং এত সংখ্যক উল্কাপাত হয়েছিল যে অধিকাংশ মানুষজন ভেবে বসেন, "বোধহয় কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।" অনেকেই উল্কাপিণ্ডের আঘাতে প্রাণনাশের শঙ্কা করেন। তবে আজ পর্যন্ত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে কোনো মানুষ মারা যায়নি।

সেই উল্কাবৃষ্টির, না উল্কাবৃষ্টি নয়, উল্কাঝড়ের রাতে অনেকেই যেমন প্রাণনাশের আশঙ্কায়

ভোগেন, তেমনি অনেকেই উপভোগ করেন এই মনোরম দৃশ্য। প্রায় সকলেরই ঘুম ভেঙে যায় প্রতিবেশীদের উত্তেজনায়। আর যাঁদের ঘুম প্রতিবেশীদের জন্য ভাঙেনি, তারা জেগে উঠেছিল—উল্কার, না অগ্নিগোলকের চোখ ধাঁধানো, ঘুমভাঙানো আলোয়।

১৮৩৩ সালের এ উল্কাবৃষ্টির আগে, উল্কার আসল গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করে নানান হাইপোথিসিস আসতে থাকে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় মার্কিন জ্যোতির্বিদ 'Denison Olmsted' এর ব্যাখ্যাটি। ফলশ্রুতিতে, অনেকেই জ্যোতির্বিদ ওল্মস্টেডকে মিটিয়র অ্যাস্ট্রোনমির জনক বলে ধরে নেন।

ওল্মস্টেড খেয়াল করেন যে লিওনিড উল্কাবৃষ্টি সারা রাত হলেও উল্কাঝড়টি অত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অর্থাৎ, যখন উল্কাবৃষ্টি হচ্ছিল তখন হুট করেই উল্কাপাতের পরিমাণ অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তিনি এটাও খেয়াল করেন যে উল্কাগুলো আকাশের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যাকে আজ আমরা বলি রেডিয়ান্ট বিন্দু।

তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে, এই উল্কাঝড় যে ইউরোপ মহাদেশ থেকে দেখা যায়নি—এটিও তিনি লক্ষ করেন। তাছাড়া তিনি আরও ঘাটাঘাটি করে দেখান যে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১৮৩২ সালের ১৩ই নভেম্বর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ১৭৯৯ সালে এমন অস্বাভাবিক মাত্রায় উল্কাপাত হয়েছিল।

তিনি ধারণা দিয়েছিলেন, কোনো প্রকার মহাজাগতিক মেঘপুঞ্জের মতো পদার্থের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর তার কক্ষপথে চলার সময় উল্কাপাত হয়। তবে ঠিক কোন ধরনের পদার্থ তার সঠিক ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

তাছাড়া প্রধান ভূমিকা পালন করলেও সমগ্র কাজটুকু তিনি একা একা করেননি। এসব কাজে তিনি যে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, সেই কলেজের ছাত্র 'এ. সি. টুইনিং' সহযোগিতা করেছিলেন। টুইনিং পরবর্তীতে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের খাতায় নাম লেখান আর ওল্মস্টেড মূলত গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন।

সত্যি বলতে, এই ঘটনার আরও ৩৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৯৯ সালেও 'মিটিয়র অ্যাস্ট্রোনমির' জন্ম হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। তবে হয়নি। হয়তো সেসময় কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না, থাকলেও হয়তো এসবে আগ্রহ ছিল না। তবে ১৭৯৯ সালের নভেম্বরের ১১-১২ তারিখেও যে এই উল্কাঝড় হয়েছিল, তখনকার নানান পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে এর হদিস মেলে।

এই উল্কাবৃষ্টির ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যিনি করেন, তিনি হলেন নিউটন। না, আমি জগদ্বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার আইজ্যাক নিউটনের কথা বলছি না। আমি বলছি উল্কা নিয়ে গবেষণায় বিখ্যাত মার্কিন গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হুবার্ট অ্যানসন সংক্ষেপে এইচ. এ. নিউটনের কথা।

তিনি বিগত দুহাজার বছর আগের উল্কাবৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি দেখান যে এই উল্কাবৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন হদিস পাওয়া যায় ৫৮৫ সালে। এছাড়াও তিনি এই উল্কাবৃষ্টি কর্তৃক ৫৮৫, ৯০২, ১৫৮২ এবং ১৬৯৮ সালে উল্কাঝড় শনাক্ত করেন এবং ১৮৬৪ সালে তিনি আরও দেখান যে—৯৩১, ৯৩৪, ১০০২, ১২০২, ১৩৬৬ এবং ১৬০২

সালেও লিওনিড উল্কাবৃষ্টির হদিস মেলে। এ গবেষণা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে এই উল্কাবৃষ্টির দ্বারা উল্কাঝড় ৩৩.২৫ বছর পরপর দেখা যায় এবং তবে নিউটন কর্তৃক শনাক্তকৃত ৫৮৫ সালের উল্কাবৃষ্টি বাদে লিওনিড উল্কাবৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন হদিস মেলে ৮৫৫ সালে। ইবনে আল-জাওজি নামক বাগদাদের একজন ইসলামি স্কলার তার গ্রন্থ 'Al-Muntazam fi al-ta'rikh'-এ উল্লেখ করলেও দুঃখজনকভাবে তিনি তারিখ কিংবা মাস উল্লেখ করেননি। তবে, বিজ্ঞানীরা গবেষণার

যাহোক, নিউটনের অনুমান ঠিক ছিল। ১৮৬৬ সালেও পৃথিবীবাসী লিওনিডস এর সুন্দর উল্কাঝড় পুরস্কার পেয়েছিল।

এত গবেষণার পরেও উল্কাবৃষ্টির উৎস ছিল আমাদের নিকট অজানা। হবেই না বা কেন? 'মিটিয়র অ্যাস্ট্রোনমির' জন্মই তো সবেমাত্র হলো।

এই রহস্যের উদঘাটন হতে শুরু করে ১৮৫৬ সালের ১৯ই ডিসেম্বর। উক্ত সময়ে জার্মান জ্যোতির্বিদ E.W.L. Tempel সপ্তর্ষি তারামণ্ডলের নিকটে নতুন একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এই ধূমকেতুর কথা আবার ৬ই জানুয়ারি ফরাসি জ্যোতির্বিদ Horace Parnell Tuttle বলেন। ফলে এই ধূমকেতুটির নাম দেওয়া হয় '55/P Tempel-Tuttle'।

পরবর্তীতে এই ধূমকেতু নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এই ধূমকেতুর বার্ষিক গতি ৩৩ বছর এবং এর সাথে লিওনিড উল্কাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে। মনে আছে, নিউটন এবং ওল্মস্টেড এর কথা? নিউটন, যিনি দেখিয়েছেন, এই উল্কাবৃষ্টির উল্কাঝড় ৩৩.২৫ বছর পরপর দেখা যায় এবং ওল্মস্টেড, যিনি বলেছিলেন পৃথিবী

অনুমান করেন, ১৮৬৬ সালের ১৩-১৪ নভেম্বর পরবর্তী উল্কাঝড় হবে।

ভিত্তিতে অনুমান করেন যে তিনি লিওনিড উল্কাবৃষ্টির কথাই বলছেন।

৫৮৫ এবং ৮৫৫ সালের পক্ষে বেশ জোড়ালো প্রমাণ না থাকায় বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এই উল্কাবৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন হদিস হিসেবে ৯০২ সালকে ধরে নেন।

কোনো প্রকার মহাজাগতিক মেঘের মতো পদার্থের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় উল্কাবৃষ্টি হয়।

ব্যস, আমাদের উল্কাবৃষ্টি রহস্যের উদঘাটন হয়ে গেল!

ধূমকেতুর চলার পথে তার শরীর থেকে নানান পদার্থ বা উপাদান ক্ষয়ে পড়ে। এসব উপাদান ধূমকেতুটির কক্ষপথ ও তার আশেপাশেই থাকে। পৃথিবী যখন এই কক্ষপথের মধ্য দিয়ে যায় তখন আমরা দেখি উল্কাবৃষ্টি। '55/P Tempel-Tuttle' ধূমকেতুর কক্ষপথের মধ্য দিয়ে পৃথিবী গেলে আমরা দেখি লিওনিড উল্কাবৃষ্টি।

এখন যখন কোনো ধূমকেতু সবেমাত্র সূর্যকে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ বার্ষিক গতি সম্পূর্ণ করে, তখন সূর্যের নিকটে আসার ফলে সূর্যের প্রকট তাপে ধূমকেতুর শরীর থেকে প্রচুর উপাদান ক্ষয়ে পড়ে। ফলে তার কক্ষপথেও এসব ক্ষয়ে পড়া উপাদানের পরিমাণ থাকে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি। আর, সেই বছর যখন পৃথিবী ওই ধূমকেতুর কক্ষপথের মধ্য দিয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ বল দ্বারা অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি উপাদান থাকায় সেই বার অনেক বেশি

উপাদানকে আকৃষ্ট করে টেনে নেয় তার বুকে। ফলে উল্কাপাতের মাত্রাও থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সেটি তখন আর উল্কাবৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন একে বলা হয় উল্কাঝড়। ঠিক তেমনই, ৩৩ বছরের '55/P Tempel-Tuttle' ধূমকেতুর বার্ষিক গতি সম্পূর্ণ হলে আমরা পাই লিওনিড উল্কাঝড়।

এই ৩৩ বছরের হিসেবে ধরেই জ্যোতির্বিদরা ১৮৬৬ সালের উল্কাঝড়ের পর ১৮৯৯ সালে পরবর্তী উল্কাঝড়ের আশা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হায়! যেখানে ১৮৩৩ সালের Z.H.R. ছিল ৫০,০০০-২,০০,০০০; ১৮৬৬ সালের Z.H.R. ছিল ৬,০০০-৫,০০০; সেখানে ১৮৯৯ সালের Z.H.R. ছিল মাত্র ৪০ এর মতো! জ্যোতির্বিদরা প্রচুর নিরাশ হন। দুঃখপ্রকাশ করে মার্কিন উল্কা সংঘটনের প্রতিষ্ঠাতা C. P. Olivier বলেন, "The worst blow ever suffered by astronomy in the eyes of the public."

এরও ৩৩ বছর পর, ১৯৩২ সালেও উল্কাবৃষ্টির দেখা মিললেও উল্কাঝড়ের দেখা মেলেনি। ১৯৩২ সালের Z.H.R. ছিল মাত্র ২৪০ এর মতো। কিন্তু এর ৩৪ বছর পর, ১৯৬৬ সালে ১৫০,০০০ Z.H.R. এর সহিত গর্জন করে ফিরে আসে লিওনিড উল্কাঝড়। স্বাভাবিকভাবেই জ্যোতির্বিদরা কোমড় বেঁধে ১৮৯৯ ও ১৯৩২ সালে উল্কাঝড় না হওয়ার এবং উল্কাঝড় বাদে নানান সময়ে এই উল্কাবৃষ্টির Z.H.R. ওঠানামা করার পেছনের রহস্য উদঘাটনে নেমে পড়েন।

১৯৯৯ সালে জ্যোতির্বিদ Robert H. McNaught এবং David Asher তাদের গবেষণাপত্রে দেখান যে এই ঘটনার জন্য দায়ী পৃথিবীর বড়ো ভাই বৃহস্পতি। কথাসাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়ার ভাষায়, "বৃহস্পতি বড়ো ভাইয়ের মতো শাসক ও স্নেহপ্রবণ। কী আর করার? শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে! বোধ করি, পৃথিবীকে স্নেহ করে নানান মহাজাগতিক বস্তুর আঘাত থেকে রক্ষা করে বিধায় শাসন করার অধিকার বৃহস্পতির আছে।"

তাঁরা দেখান, ধূমকেতুটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আসার সময় কিংবা প্রদক্ষিণ করে যাওয়ার সময় বৃহস্পতি গ্রহের শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে ধূমকেতুটির কক্ষপথে হালকা পাতলা পরিবর্তন ঘটে। তাঁরা আরও দেখান, ১৯৯৯ সালে যে উল্কাঝড় হবে তার Z.H.R. হবে ৬,০০০ এর মতো। উনাদের গবেষণা সঠিক ছিল বটে, তবে এতো কমসংখ্যক Z.H.R. — কে বুড়োআঙুল দেখিয়ে তা হয়েছিল ৩০০০ এরও অধিক। এর পরের কয়েক বছরও এই উল্কাবৃষ্টির ভালোই জৌলুশ ছিল। কিন্তু ২০০৯ সালের পর তা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। মাঝে বেশ উত্থান-পতন পাড়ি দেয় এই উল্কাবৃষ্টি। লিওনিড উল্কাবৃষ্টির ইতিহাস যেমন মনোরম, ঠিক তেমনি হৃদয়বিদারক। ধারণা করা হয়, পরবর্তী উল্কাঝড়টি ২০৩৫ সালে হবে।

বর্তমানে লিওনিড উল্কাবৃষ্টির সময়সীমা ৬ই নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর। আর সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে ১৭ই নভেম্বরের দিবাগত রাতে অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বরের ভোরবেলা পর্যন্ত। তখন Z.H.R. থাকে ১৫-২০। এদের উল্কাগুলো উজ্জ্বল হয় এবং বেশ দ্রুত ছুটে চলে।

বোধকরি, বর্তমানে এদের এত কম Z.H.R. থাকা যেন ঝড়ের আগে শান্ত অবস্থা।

সিংহ রাশির ইতিকথা

লিওনিড উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট সিংহ রাশিতে অবস্থিত। পুরাণে এই সিংহ, মহাবীর হারকিউলিসের সাথে জড়িত। গ্রিক পুরাণে হারকিউলিসের উপাখ্যান বিশাল। হারকিউলিসের পুরাণের সাথে অনেক মণ্ডল জড়িত। কালপুরুষ মণ্ডলের মতো হারকিউলিস মণ্ডলে মানুষের চেহারা কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না আমি দেখেছি। তবে মণ্ডলটির তারাগুলো কালপুরুষের মতো অতটা উজ্জ্বল নয় বিধায় প্রথম দেখাতে বুঝতে কিছুটা কষ্ট হতে পারে।

তবে বলছিলাম সিংহের কথা। হারকিউলিস ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। দেবরাজ জিউসের ছেলে বলে কথা! জিউসের অন্য এক স্ত্রীর নাম ছিল হেরা। হেরা দেবী হারকিউলিসের সুখ সইতে না পেরে তাঁর ক্ষতির পরিকল্পনা করেন। ফলে মায়াজালে হারকিউলিসকে কিছু সময়ের জন্য পাগল করে দেন। এমতাবস্থায় হারকিউলিস নিজের স্ত্রী সন্তানকে হত্যা করেন।

পরে জ্ঞান ফিরলে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১২টি কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়। এই ১২টি কাজই হারকিউলিসের বারো শ্রম, ইংরেজিতে 'Twelve Labors of Hercules' নামে বিখ্যাত। এই ১২টি শ্রমের প্রথম শ্রমটি ছিল নিমিয়ার জঙ্গলের সিংহকে ঘিরে।

এই সিংহটি ছিল চাঁদের দেবী সেলেনের বংশধর। সেলেনে সিংহটিকে দেখে এতটাই ভয় পান যে সিংহটিকে নিমিয়ার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন। হারকিউলিসের ১ম শ্রমটি ছিল এই সিংহকে হত্যা করা। সিংহটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তার গায়ে কোনো অস্ত্রই কাজ করত না।

হারকিউলিস তাঁর তির-ধনুক, তরবারি এবং গদা দিয়ে সিংহটিকে হত্যা করতে বেরোন। সিংহের আস্তানায় যান। বিশাল সিংহটি যখন তার সামনে হাজির হয়, সিংহের গায়ে লেগে থাকে শেষ শিকারকৃত প্রাণীর রক্ত।
হারকিউলিস প্রথমে সিংহের হৃৎপিণ্ডে লক্ষ্য করে তির ছুড়ে মারেন। কিন্তু তা সিংহের অভেদ্য চামড়ায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

তিরে কাজ না হলে তরবারি হাতে ছুটে যান হারকিউলিস। সিংহটিও আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। হারকিউলিসের তরবারিটি আঘাত করতে গিয়ে বেঁকে যায়। তবে সিংহ হালকা করে ভারসাম্য হারায় কিন্তু জলদি তা ফিরে পায়।
এতেও কাজ না হওয়ায় হারকিউলিস তার গদা দিয়ে সিংহের মাথা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। সিংহটি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। তবে কোনো অস্ত্র কাজ না করায়, সিংহটি ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই খালি হাতে সিংহের গলা টিপে হত্যা করেন মহাবীর হারকিউলিস।
পুরাণের অন্য সংস্করণে আছে, হারকিউলিস সেখানে গিয়ে রাত নামার অপেক্ষা করেন এবং সুযোগমতো সিংহটিকে গলা টিপে হত্যা করেন।

নিমিয়ারের এই সিংহই আকাশে সিংহ রাশি হয়ে হারকিউলিসের বীরত্ব প্রচার করছে।

আকাশ পটে সিংহ রাশি

রাত প্রায় ১২:৩০ এর দিকে এ মণ্ডলকে উঠতে দেখা যায়। তখনও এটি দিগন্তের বেশ নিকটে থাকে। ফলে দৃশ্যমান হয় না। দিগন্তের নিকটে হওয়ায় তখনো উল্কাপাত খুবই কম দেখা যাবে। তবে রাত ২টার আশেপাশে লিওনিড উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য বের হওয়া উত্তম।

লিওনিড উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য সবার প্রথমে আমাদের মঘা (Regulus) তারকাকে খুঁজে বের করতে হবে। এটি রাতের আকাশে ২৬তম উজ্জ্বল তারা। এর আপাত প্রভা ১.৩৫। ফলে খালি চোখে একে সহজেই দেখা যায়।

রাত ২টার আশেপাশে মঘা তারাকে পূর্ব দিগন্ত থেকে বেশ খানিকটা ওপরে দেখা যায়। পূর্ব দিকে সরাসরি মুখ করে তাকালে দিগন্তের ওপরে একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাবে। সেই তারাটি তার আশেপাশের তারাগুলো থেকে বেশি উজ্জ্বল। ফলে চিনতে অসুবিধে হবে না। এটিই সিংহ রাশির প্রধান তারা, আমাদের মঘা তারা। রাত ৫টার পরে একে দেখাবে মাথার ওপরে, সুবিন্দুর নিকটে।
এই মঘা তারা থেকে হালকা বামে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল তারাটির নাম সিংহককুদ (Algeiba)। এখানে যে সিংহটি কল্পনা করা হয় তার গলায় ককুদের ওপরে এই তারা অবস্থিত বলে তারাটির নাম সিংহককুদ। এটির আপাত প্রভা ২.২০।
এই তারাটির একটু ওপরেই আমাদের রেডিয়ান্ট বিন্দু অবস্থিত।

উক্ত সময়ের তারাচিত্র

লাশ ভাসার মিথ খণ্ডন

মারুফ হাসান
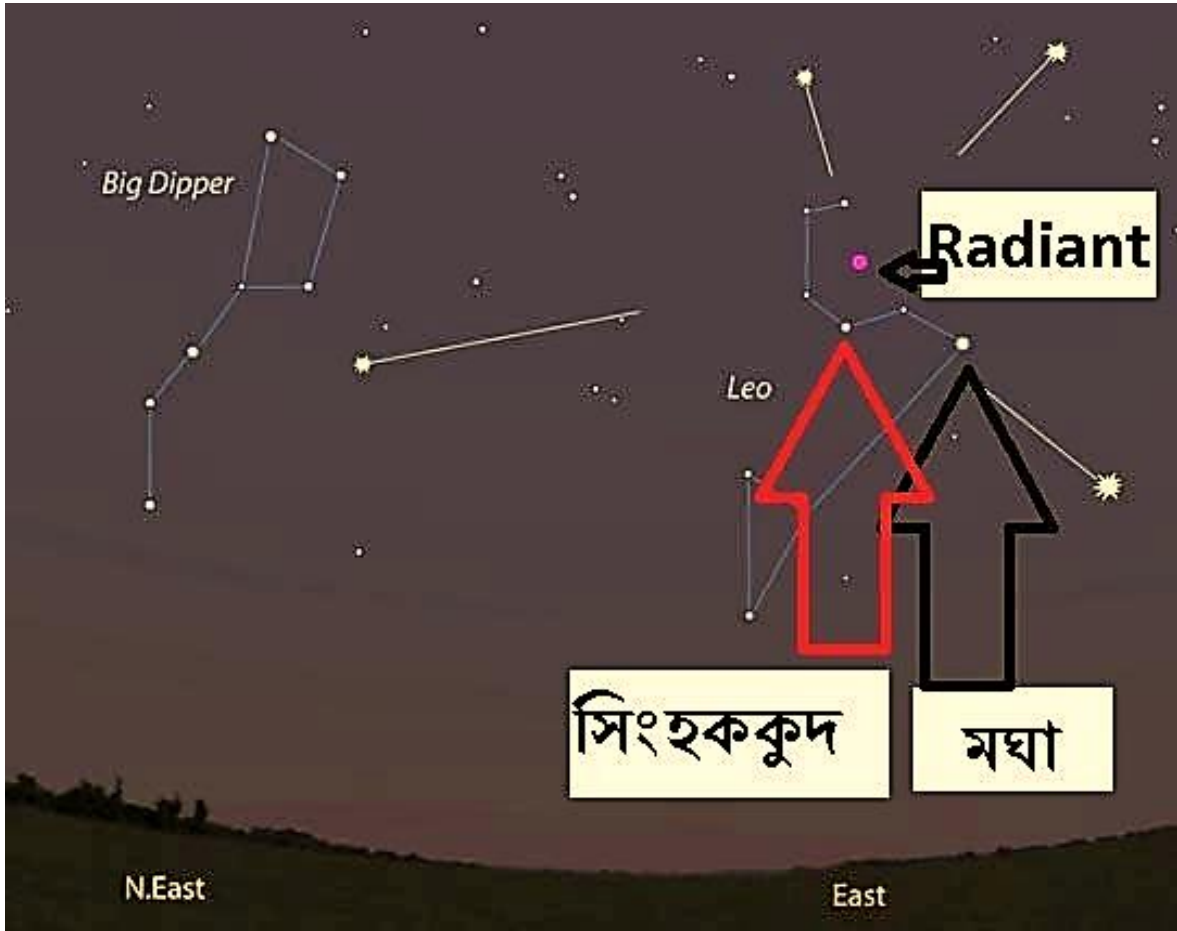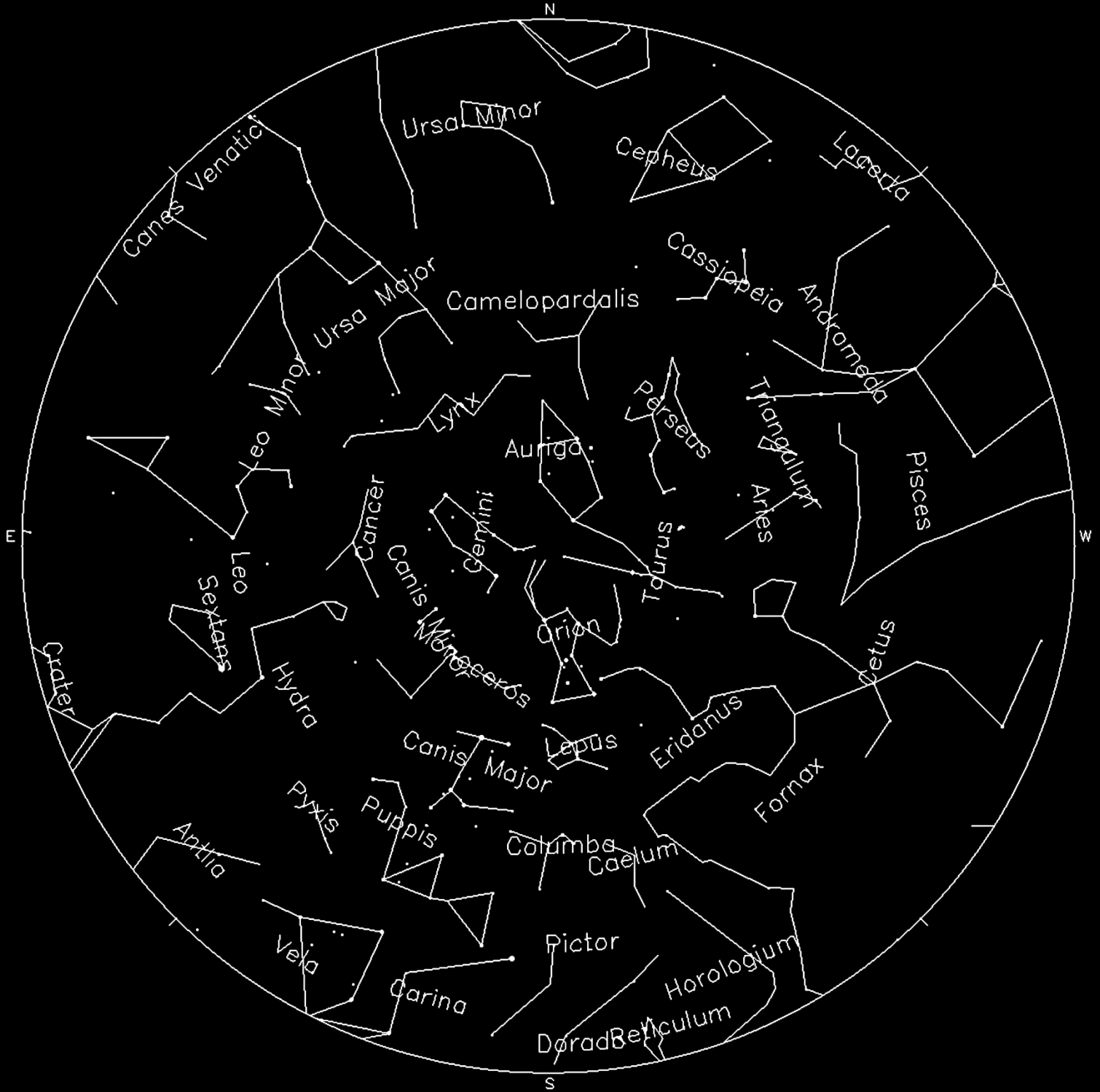
দিনটা জুলাই ২৬, ২০২০। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে নানাবাড়ি বেড়াতে আসা একটি ছেলেটি পানিতে ডুবে মারা যায়। ছেলেটি সাঁতার জানত না। দীর্ঘ ১৯ ঘণ্টা পর ২৭ তারিখ সকালে ভেসে ওঠে। লাশ ভেসে ওঠার কিছুক্ষণ আগে এক কবিরাজ মন্ত্র-তন্ত্র পড়েছেন। ফলে এলাকায় গুজব ছড়িয়েছে যে, "এই কবিরাজ সাহেবের কেরামতিতে লাশ উদ্ধার হয়েছে"। এছাড়া দেও-দানবের কাহিনি তো আছেই। যাহোক, আমরা জানার চেষ্টা করি কেন লাশ ডুবে যায় এবং ভেসে ওঠে। তাহলেই বোঝা যাবে কবিরাজ সাহেবের কেরামতি কতটুকু যুক্তিসই।

কোনো বস্তুর নিমজ্জন ও ভাসা প্লবতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর ওপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ লম্বভাবে যে ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে, তা-ই প্লবতা। প্লবতা থেকে আমরা জানি যে, কোনো বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন যদি বস্তুর ওজনের থেকে বেশি বা সমান হয় তাহলে বস্তুটি ভাসবে। আবার পানির ঘনত্ব যদি বস্তুটির ঘনত্ব থেকে বেশি হয় তাহলেও বস্তুটি ভাসবে।
এবার আসা যাক লাশের দিকে, প্লবতার কারণে মানুষ ভেসে থাকে। যখন মারা যায় তখন ফুসফুসে অনবরত পানি ঢুকতে থাকে। ফলে লাশের ওজন অপসারিত পানির ওজন থেকে বেড়ে যায়। এর ফলে লাশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। পানির নিচে তলিয়ে যাবার পর দেহের অভ্যন্তরে বাস করা ব্যাকটেরিয়াগুলো দেহের নরম টিস্যুগুলোকে পচাতে থাকে। এই ক্রিয়ায় নানা রকম গ্যাস উৎপন্ন হয়, যেমন : হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। এই গ্যাসগুলো উৎপন্ন হওয়ার ফলে লাশের ওজন কমতে থাকে। একসময় যখন লাশের ওজন এবং বস্তু দ্বারা অপসারিত ওজন সমান হয় তখন আবার ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠার সময় কয়েক ঘণ্টা থেকে সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় লাশ ভেসে ওঠে না। এক্ষেত্রেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী হতে পারে।

কবিরাজের ভেলকি স্রেফ কাকতালীয় ঘটনা–এর বেশি কিছুই নয়। একটা প্রবাদ আছে, সেটা সম্ভবত এক্ষেত্রে সঠিক, "ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।"

শেষে বলি, জীবনের থেকে কোনো কিছুই বড়ো নয়, তাই বেঁচে থাকার জন্য হলেও সাঁতার শেখা প্রয়োজন। আমাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত। এরকম অকালমৃত্যু যেন আর দেখতে না হয় সেটাই প্রত্যাশা করি।

বিষে বিষে বিষক্ষয়?

আবু রায়হান

১.

কাউকে একবার সাপে কামড়ালে গ্রামের মুরুব্বিরা ২য় বার আবার কামড় খাওয়াকে খুব ভালো মনে করেন। এতে নাকি বিষ নেমে যায় অথবা ধ্বংস হয়ে যায়। "বিষে বিষে বিষক্ষয়" প্রবাদটার উৎপত্তি হয়তো এখান থেকেই।

অনেকেই এসব মুরুব্বিদের সাপোর্ট দিয়ে কথা বলেন। তাদের যুক্তি: অ্যান্টিভেনম বা সাপের বিষের প্রতিষেধক তো সাপের বিষ দিয়েই তৈরি করে।

ওয়েট! সাপের বিষ থেকে তৈরি করে, তাই বলে কি সাপের বিষ অ্যান্টিভেনম? সাপের বিষ এবং অ্যান্টিভেনমের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

যারা ২য় বার সাপের কামড়কে অ্যান্টিভেনমের সাথে তুলনা করেন, তাদের জন্যে বলছি। সংক্ষেপে অ্যান্টিভেনম উৎপাদন প্রক্রিয়াটা আগে বুঝে তারপর মন্তব্য করবেন।

২.

প্রথম ধাপ: সাপের বিষ সংগ্রহ

যে সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম তৈরি করতে হবে, প্রথমে সেই সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়।
প্রত্যেক সাপের বিষ আলাদা ধরনের, তাই এক সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম অন্য সাপের বিষ ধ্বংস করতে পারে না। একটি পাত্রের মুখ কাগজ বা প্লাস্টিক দিয়ে আটকে সেখানে সাপের দাঁত ঢুকিয়ে দিলে ফোঁটায় ফোঁটায় সাপের বিষ ঝরে পড়ে। একই সাপ হতে এভাবে সপ্তাহে একবার পূর্ণ পরিমাণে বিষ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ধাপ ভেনম ফ্রিজিং

মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমিয়ে ফেললে বিষ থেকে জলীয় অংশ আলাদা হয়ে সাপের বিষ গুড়ো পাউডারে রূপান্তরিত হয়।

তৃতীয় ধাপ: ঘোড়ার শরীরে অ্যান্টিভেনম উৎপাদন

প্রথমে মূলনীতিগুলো জেনে নিই। সকল প্রাণীরই বাইরে থেকে আসা উটকো সমস্যাগুলো থেকে মুক্তির নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের শরীরে বাইরে থেকে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করলে শরীর নিজে থেকেই তার অ্যান্টিবডি তৈরি করে নেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সাপের বিষ শরীরে প্রবেশ করলে তার প্রতিবিষ তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের তেমন নেই।

পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক প্রাণী নিজের শরীরে সাপের বিষ প্রতিরোধের ক্ষমতা তৈরি করতে পারে। যেমন : গাধা, ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, বেজি, মুরগি, উট, ঘোড়া, হাঙর ইত্যাদি।
বেশি রক্ত এবং অনেকদিন বাঁচে আর বারবার ব্যবহার করা যায় বলে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে অ্যান্টিভেনম উৎপাদনের জন্য ঘোড়ার ব্যবহার সর্বাধিক। তবে হাঙরেরটা সবচেয়ে কার্যকরী কিন্তু হাঙর সহজলভ্য নয়।

সাধারণত বিষাক্ত সাপের কামড়ে ঘোড়া মরে না; তবে অতিরিক্ত বিষাক্ত হলে এবং বিষের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ঘোড়ার বেঁচে থাকা কামড়ের জায়গা, ঘোড়ার শারীরিক পরিস্থিতি, কামড় পরবর্তী ঘোড়াকে প্রদত্ত চিকিৎসার ওপর নির্ভর করবে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুবিশেষজ্ঞদের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে মারাত্মক বিষাক্ত Rattle snake কামড়িয়েছে এমন ৫৮টি ঘোড়ার মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল মাত্র ৯%।

যাহোক, পূর্বে সংগ্রহ করা সাপের বিষ ইনজেকশনের মাধ্যমে ঘোড়ার ধমনিতে প্রবেশ করানো হয়। এতে ঘোড়া মরে না; বরং তার শরীরে অ্যান্টিভেনম উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। প্রায় ৩ দিন ঘোড়াটি অসুস্থ থাকে; আমাদের যেমন জ্বর হয়, অনেকটা তেমন। ৩-৪ দিন পর ঘোড়াটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। তার শরীরের সমস্ত বিষ নষ্ট হয়ে যায় ততদিনে। তখন এই ঘোড়াকে একই জাতীয় অন্য কোনো সাপ কামড়ালে তার শরীরে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।

চতুর্থ ধাপ: ঘোড়ার রক্ত থেকে অ্যান্টিভেনম আলাদাকরণ

ঘোড়ার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে তার লাল অংশ আলাদা করা হয়। সাদা অংশ অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স থেকে অ্যান্টিভেনম আলাদা করা হয়। ঘোড়া বেশ স্বাস্থ্যবান এবং অনেক রক্ত থাকে বলে বেশ ভালো পরিমাণে রক্ত নিলেও (গড়ে প্রতি ঘোড়া থেকে প্রায় ৬ লিটার রক্ত নেওয়া হয়) ঘোড়ার তেমন ক্ষতি হয় না। তারপর এই অ্যান্টিভেনমের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে শিশিতে ভরে বাজারে সরবরাহ করা হয়।

চিকেন পক্সের অ্যান্টিবডি এবং সাপের বিষের অ্যান্টিভেনমের মূলনীতি প্রায় একই। চিকেন পক্সের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আমাদের শরীর আর সাপের বিষের ক্ষেত্রে সেটি তৈরি হয় ঘোড়ার শরীরে। এই অ্যান্টিভেনম সাপে কাটা রোগীর শরীরে ইনজেক্ট করলে অ্যান্টিভেনম শরীরে থাকা ভেনমকে অকার্যকর করে রোগীর জীবন বাঁচায়। বছরে হাজার হাজার মানুষের জীবন এই অ্যান্টিভেনমের কারণে বেঁচে যায়।

উঁহু, তাই বলে এখন ঘোড়াকে কোনো সুপারহিরো ভাববেন না, ঘোড়াকে নিয়ে যা-ই শোনা যায় প্রায় পুরোটাই অতিরঞ্জিত। বিস্তারিত এখানে.....

সাবলিমিনাল স্যান্ডউইচ

মনিফ শাহ চৌধুরী

১.

মুভি থিয়েটারের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মি. কমন। এখন ইন্টারভ্যাল চলছে, সেই ফাঁকে কিছু স্ন্যাকস জাতীয় খাবার কিনে নেওয়া যায়। কাচের দরজা খুলে এসি-সংলগ্ন ক্যাফেতে প্রবেশ করতেই কানে ভেসে এলো আরবি গান। গানের কথা, সুর কিছু মাথায় না ঢুকলেও মেন্যু-কার্ডের দিকে বেশ ভালোই মনোযোগ দিচ্ছিলেন মি. কমন।অতঃপর পাক্কা দুই মিনিট ভেবে-চিন্তে একটা অ্যারাবিয়ান সাব-স্যান্ডউইচ ও কোক পার্সেল নিয়ে ফিরে গেলেন।

ইন্টারভ্যালের পর সিনেমার আসল টুইস্ট শুরু হয়েছে। সিনেমাটা মূলত এক ব্যাবসায়ীর উঠে আসার গল্প যার পথচলা অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। মূল চরিত্র একটা প্রেস কনফারেন্সে বসে আছেন, হাতে একগাদা স্ট্যাটিস্টিক্যাল তথ্য-উপাত্ত এবং পাশে একটা ছোট্ট চারকোনা বাক্স রাখা। তিনি বলছেন, “এই বাক্স দিয়ে কোনো মুভি বা টিভি সিরিজ চলাকালীন খুবই দ্রুত কিছু ইমেইজ স্ক্রিনে দেখানো যাবে দর্শকদের, যা তাঁরা সচেতনভাবে বুঝতে বা দেখতে পারবেন না, তবে তাঁদের মস্তিষ্ক এটা ঠিকই ধরতে পারবে।” একেকটা ছবি বা টেক্সট, যেমন, “অ্যারাবিয়ান স্যান্ডউইচ খাও”, প্রতি দশ সেকেন্ড পরপর মাত্র দশ মিলিসেকেন্ডের জন্য স্ক্রিনে মূল সিনেমার সাথে দেখানো হলে মানুষ সেটা কিনতেই বেশি আগ্রহী হবে। অথবা একই কথা খুবই কম ফ্রিকোয়েন্সিতে চালানো হলেও তা মানুষ সচেতনভাবে শুনতে না পেলেও তাদের অবচেতন মন ঠিকই শুনে প্রভাবিত হবে। সিনেমার মূল চরিত্র এও বললেন যে তিনি এটা ইতোমধ্যে পরীক্ষাও করেছেন এবং এর কারণেই অ্যারাবিয়ান স্যান্ডউইচের বিক্রি গত এক সপ্তাহে বিপুল পরিমাণ বেড়েছে। তিনি তাঁর] দুই হাতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা ধরে নাচাতে লাগলেন।

এরপর আমাদের গল্পের মি. কমন যদি সিনেমা দেখায় নিবদ্ধ থাকতেন, তিনি পলিটিক্যাল বিজনেস থ্রিলে প্লট কীভাবে এগিয়ে যায় , তা উপভোগ করতে পারতেন। তবে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন এবং হাতে ধরে রাখা আধ-কামড় দেওয়া স্যান্ডউইচের দিকে অবিমিশ্র চাহনিতে চেয়ে নিজের জীবনে নেওয়া তাবৎ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে লাগলেন।

২.

আমাদের এই আর্টিকেলের বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। মূলত, প্যারাসাইকোলজির একটা শাখা হিসেবে সাবলিমিনাল মেসেজ ও এর ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক হাইপ রয়েছে। সাবলিমিনাল মেসেজের বিভিন্ন দাবি

আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক, সে বিষয়ে আলোচনা করাই এই আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্য।

শুরুতেই আমার মনে হয় দু টো শব্দের পার্থক্য নিয়ে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত । একটি শব্দ হলো Subliminal আরেকটি Supraliminal।

Subliminal উদ্দীপনা হলো এমন কিছু যার ব্যাপারে আমাদের মস্তিষ্ক পুরোই অজ্ঞ থাকবে। যেমন : ওপরে বর্ণিত সিনেমার মূল চরিত্র বলেছিলেন। এমন শব্দ ব্যবহার করা যা মানুষের Audible range (20Hz-20kHz) এর বাইরে, অথবা এমন ছবি যা এতটাই কম সময় ধরে দেখানো হবে যা আমাদের মস্তিষ্কের শনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু এইসব উদ্দীপনা বা stimuli আমাদের মস্তিষ্ক কোনোভাবেই শনাক্ত করতে পারবে না তাই এগুলোকে সাবলিমিনাল মেসেজ বলা হয়।

Supraliminal উদ্দীপনা হলো এমন কিছু যার ব্যাপারে আপনার মস্তিষ্ক সজ্ঞান তবে হয়তো সেটাতে তেমন সচেতন গুরুত্ব দিচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে ওপরের ক্যাফেতে চলে যেতে পারেন। সেখানে আমরা দেখি ক্যাফেতে অ্যারাবিয়ান গান বাজছিল এবং মি. কমন সেটা তেমন পাত্তা না দিয়েও ঠিকই অ্যারাবিয়ান স্যান্ডউইচ কিনে বের হয়ে এলেন।
এটা ছিল সাবকনশাস ইনফ্লুয়েন্সের উৎকৃষ্ট নমুনা এবং এটা যথেষ্ট কার্যকরী।

প্রমাণ হিসেবে আমরা নর্থ হারগিভস এবং ম্যাকেন্ড্রিকের করা গবেষণায় চোখ [বোলাতে] পারি। একটা মদের দোকানে টানা দুই সপ্তাহ এই পরীক্ষাটা করা হয়। দোকানে দুই ধরনের মদ ছিল, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ। দেখা গেল, যেদিন জার্মান গান বাজানো হয় , দোকানে সেদিন জার্মান মদের বিক্রি বেড়ে যায়। এর বিপরীতে যেদিন ফ্রেঞ্চ গান বাজানো হয় , সেদিন ফ্রেঞ্চ মদের বিক্রি বেশি হয়।
সাবকনশাস ইনফ্লুয়েন্স মার্কেটিং এ বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করে আসা হচ্ছে এবং ব্যাপারটা প্রমাণিত।
একই কথা কি আমরা সাবলিমিনাল মেসেজের ক্ষেত্রে বলতে পারি?
চেষ্টা করা যাক।

৩.
আমাদের মি. কমন হতবিহ্বল পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। মনে রাখা ভালো , তিনি সাবলিমিনাল আর সাবকনশাস ইনফ্লুয়েন্সের পার্থক্য জানেন না। এর ফলে তিনি দুটো ব্যাপার এক করে এই চিন্তায় পড়ে গেছেন যে সাবলিমিনাল মেসেজ দিয়ে পৃথিবীর সবাইকে নির্দিষ্ট পণ্য কেনার ব্যাপারে প্রভাবিত করা যাবে এবং একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্য যে-কোনো বিষয়, যেমন : কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ভোট, কোনো নির্দিষ্ট ক্রিকেট দলের সাপোর্ট ইত্যাদি নানান বিষয়ও প্রভাবিত করা যাবে ; জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৪' বইটার মতো পৃথিবীর সবাইকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবিত করা যাবে। কারো সিদ্ধান্তই আর সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত থাকবে না।

বাসায় এসে আর সব কমন মানুষের মতো আমাদের মি. কমনও ব্রাউজার নিয়ে বসলেন। গুগলের বুকে ইতিউতি ঘোরাঘুরি করে তিনি সাবলিমিনাল মেসেজ মার্কেটিং এর একেবারে গোড়া খুঁজে পেলেন।

৪.
সাল ১৯৫৭, নিউ ইয়র্ক। জেমস ভিকারি তাঁর সামনে বসে থাকা রিপোর্টারদের অবাক করে দিয়েছেন একটা আপত্তিকর দাবি করে । তিনি বলছেন, "টিভি দেখার সময় আর বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন সহ্য করতে হবে না। তার বদলে তাঁর] ডিভাইস ব্যবহার করে স্ক্রিনে খুবই দ্রুত কিছু ছবি দেখানো যেতে পারে যা সাবলিমিনাল বিজ্ঞাপন প্রচার করবে দর্শকদের কাছে"
তিনি আরও বলেন, "সম্প্রতি একটা সিনেমা হলে 'ইট পপকর্ন , ড্রিংক কোক' স্লোগান বারবার সাবলিমিনাল ফ্ল্যাশ মেসেজ দেওয়ার ফলে পপকর্নের বিক্রি ১৮.১% এবং কোকাকোলার বিক্রি ৫৭.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।"

জনগণ সেটা ভালোভাবে নিলো না। আন্দোলন চলল, যার ফলে এমন সাবলিমিনাল মেসেজ দেওয়াকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হলো।

জেমস ভিকারি কি ঠিক ছিলেন? অনেক বছর পর ১৯৬২ সালে ভিকারি স্বীকার করেন পুরো বিষয়টা ভুয়া ছিল এবং সে সময় তাঁর যন্ত্র এত দ্রুত এবং স্বল্প সময়ের জন্য কোনো ইমেইজ স্ক্রিনে প্রদর্শন করতেও অক্ষম ছিল। অনেকে মনে করেন ভিকারি তার সেই যন্ত্র সিনেমা হল মালিকদের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই এমন গল্প ফাঁদেন।

তবে সেই যে শুরু, এরপর থেকে মানুষের মনে ভয় ঢুকে যায় যে হয়তো এমনটা আসলেই সম্ভব এবং এরপর থেকে আজও মানুষ যে - কোনো কিছুতে সাবলিমিনাল জিনিস খুঁজতে ব্যস্ত থাকে। সেটা ডিজনির সিনেমা হোক কিংবা মাইলি সাইরাসের গান। তাদের কল্পনাই মূলত এসব মেসেজ 'আবিষ্কার' - এর পেছনে শক্তি জোগায় । মানুষ তাদের ভয় থেকে এসব খুঁজতে এতটাই বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে যে সাবলিমিনাল শব্দের আসল অর্থই তারা ভুলে যায় যে এটা এমন কিছু যা আমাদের মস্তিষ্ক দ্বারা কোনোভাবেই শনাক্ত করা সম্ভব না।

৫.
সাবলিমিনাল মেসেজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. **Subvisual messages :** খুবই দ্রুত কিছু ছবি ফ্ল্যাশ করে দেখানো, হতে পারে কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য, যা মানুষ কখনোই দেখতে পারবে না।

২. **Subaudible messages :** এতই কম হার্জের সাউন্ড বা কথা যা অন্য কোনো বড়ো শব্দের আড়ালে বাজানো হয় , যা মানুষ কখনোই শুনতে পাবে না।

৩. **Back masking :** উলটো করে রেকর্ড করা কোনো অডিয়ো যেটা হয়তো কোনো গানের সাথে শোনানো যাবে, তবে স্রেফ শুনে এটার অর্থ বোঝা কখনোই সম্ভব না।
ইদানিং কিছু মানুষ সাবলিমিনাল মেসেজ ব্যবহার করে অসাধ্য সাধন করার চিন্তা করেন। উদাহরণ হিসেবে উচ্চতা বৃদ্ধি, ত্বক ফর্সা করা কিংবা আত্মোন্নয়ন উল্লেখ করা যায়।

শুরুতে উচ্চতা বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলা যাক। উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে গ্রোথ হরমোন নিঃসৃত হতে হয়। খুবই ছোটো করে বললে, এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করার জন্য সাবলিমিনাল বা বাইনরাল কোনো মিউজিকের প্রভাব একেবারেই প্রমাণিত নয়। একই ব্যাপার হচ্ছে শরীরের স্থুলতা কমানো/বাড়ানোর ক্ষেত্রেও। তবে

এই ক্ষেত্রে প্লাসিবো ইফেক্ট কাজ করে, সাবলিমিনালের এটার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই।

অনেকেই বলতে পারেন, আমি অমুককে দেখেছি সে সাবলিমিনাল নিয়ে লম্বা হয়েছে বা তমুক চিকন হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে এই অমুক তমুককে দেখেছি কথাটা আসা মানেই তো এটার পক্ষে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রমাণ আপনাদের হাতে নেই, তাই না? আমাদের Perceived data আমাদের Actual Data-এর প্রতি অন্ধ করে দেয়। অনেকটা ধূমপানের মতো । আমাদের Actual data যতই বলুক ধূমপান স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, নানাবিধ রোগ বাধায়, আমাদের অনেকেই তাও ধূমপান করে এই অজুহাতে, "কই, অমুক সারাজীবন ধূমপান করল, সে তো দিব্যি আছে।" এটা তার Perceived data.

তবে, এবার কথা বলব কিছু স্টাডির ব্যাপারে যেগুলোর ডেটা দেখলে আপনি লাফিয়ে উঠতে পারেন ইয়াহু বলে কিংবা বলে বসতে পারেন, " এইবার সাবলিমিনাল প্রমাণ হয়ে গেল!"

এ থেকে কী প্রমাণিত হলো ? প্রমাণিত হলো যে যদিও মনে হচ্ছিল মেসেজ দেখার কারণে লিপ্টন বেছে নিয়েছেন অনেকে, তবে কন্ট্রোল দর্শকেরা সেই ধারণা ভেঙে দিলো । তারা মেসেজ না দেখেও লিপ্টন বেছে নিয়েছেন। সাবলিমিনাল মেসেজ কোনো প্রভাবই ফেলেনি ।

Greenwald, Spangenberg Pratkanis & Eskanazi 1991 গবেষণায় দেখালেন যে সাবলিমিনাল আত্মোন্নয়নের ডেটা কোনো কাজে দেয় না। যদিও-বা কারো মাঝে উন্নতি দেখা দেয় সেটা ওই মেসেজের দৌলতে নয় , বরং প্লাসিবো ইফেক্টের কারণে।

৬.

আটানব্বই জন দর্শকের একটা টিভি প্রোগ্রামে Lipton লেখাটা সাবলিমিনাল ভাবে প্রদর্শন করা হলো । এরপর তাদের বলা হলো পানীয় হিসেবে কী খেতে চান তারা, লিপ্টন , চা না কি পানি?

মাত্র ৪৬% লিপ্টন বেছে নিলেন।
এদের থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হলো যাঁরা লিপ্টনই খাবেন অথবা লিপ্টন মুখেই নেবেন না এমন মানুষদের। বাকিদের মাঝে যে ডেটা পাওয়া গেল তাতে মাত্র ৫৩% লিপ্টন বেছে নিয়েছিলেন ।

কন্ট্রোল দর্শকও ছিল। তাদের কোনো সাবলিমিনাল মেসেজ দেখানো হয়নি। তাদের ৫৩% লিপ্টন বেছে নিলেন। তবে লিপ্টন-প্রীতি আছে এমন বা লিপ্টন খাবেনই না এমনদের বাদ দেওয়ার পর নতুন ডেটাতে দেখা গেল ৬৯% লিপ্টন বেছে নিয়েছেন।

এমন নানা গবেষণা হয়েছে সাবলিমিনাল মেসেজ নিয়ে। একটা কথা অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সাবলিমিনাল মেসেজ যেহেতু আমাদের মস্তিষ্ক শনাক্ত করতেই অক্ষম তাই তার প্রভাব থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৭.

আমাদের মি. কমন হৃষ্টচিত্তে বাড়ি থেকে বের হন। সারা রাত পড়াশোনা করে তিনি জেনে নিয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত শুধু তাঁরই । সাবলিমিনাল মেসেজ তাঁর ক্ষতিও করবে না , কাউকে সুপারপাওয়ারও দেবে না। বিজ্ঞানে ভুয়া প্রমাণিত বিষয়গুলোর মতো এটাও জায়গা করে নিচ্ছে ফাঁকা বুলিগুলোর ভেতর।

সঠিক তথ্য
পর্যাপ্ত যুক্তি
অBeeজ্ঞান
সমগ্র

মধু হই হই বিস খাওয়াইলা

নূর-এ নাঈম শান্ত

আজ প্রথমে দেখানোর চেষ্টা করব মধু সম্পর্কে ভুল ধারণাসমূহ। এরপর দেখাব, বিশুদ্ধ মধু খোঁজার পদ্ধতিগুলো কেন সঠিক নয়।

সব মৌমাছি মধু তৈরি করে

প্রথমত, পৃথিবীতে প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মৌমাছি বাস করে যা ৭টি গোত্রে বিভক্ত। এই ৭টি গোত্রের মাত্র একটি গোত্রের মৌমাছির মধু তৈরির ক্ষমতা আছে। কেবল 'Apidae' গোত্রের মৌমাছি নেক্টার থেকে মধু তৈরি করতে পারে।

যদি মধু গরম করে খাওয়া হয়, তাহলে সেটা বিষক্রিয়া হতে পারে

প্রথমত, বলতে চাই, এটা সঠিক আবার ভুল উভয়ই। আপনি যদি ক্রমাগত মধুকে তাপ দিতে থাকেন এবং ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে মধু রান্না করেন তাহলে মধুতে একটি নেতিবাচক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তাপ মধুর উপকারী গুণাবলি ধ্বংস করে এবং প্রক্রিয়াজাত মধু কিনে, যা ইতোমধ্যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে বাজারজাত করা হয়েছে। তাপ কেবলমাত্র মধুকে তার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য হারাতে সক্ষম করে এবং মধুতে থাকা সমস্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং পুষ্টিকে হ্রাস করতে পারে। কিন্তু পয়জন হবে না। তবে আপনি যদি চান অল্প তাপে একটু গরম করে নিতেই পারেন, সমস্যা হবে না। গরম দিলেই মধু শেষ–এমনটা ভাবার দরকার নাই। ফ্রিতে একটা পরামর্শ দিই, কিছু সময় রোদে রেখে দিতে পারেন।

মধু জীবনেও পচে না, কোনোভাবেই পচতে পারে না

হ্যাঁ, এটা সত্যি কিন্তু যত্ন না নিলে নয়। যত্ন নিতে গিয়ে যদি আবার ফ্রিজে রাখেন তাহলেও অবশ্য লাভ নেই। সাধারণত কাঁচা মধু পচে না কিন্তু একে ক্রমাগত তাপ দেবেন, বাতাসে রেখে দেবেন তাহলে হবে না। মধু হাইগ্রোস্কোপিক, যার অর্থ এটিতে প্রাকৃতিক অবস্থায় খুব কম জল থাকে, যদি না একে খালি ছেড়ে দেওয়া হয়। যদি মধুকে বাতাসে ছেড়ে দেন তবে মধু ধীরে ধীরে জলীয়বাষ্প শোষণ করে নেবে। মিষ্টি, চটচটে পদার্থটি অনাবৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হলে এটি আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে।

যদি স্ফটিক হয় তাহলে মধু নষ্ট হয়ে যাবে

যদিও এটি প্রথমে বেশ অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে মধুর জারের মধ্যে যে স্ফটিক দেখা যায় তার অর্থ এই নয় যে এটি নষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রতিক্রিয়াটি কেবল তখনই ঘটে যখন কাঁচা মধুতে তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্তরের গ্লুকোজ থাকে, যা ফ্রুক্টোজের চেয়ে চিনি স্ফটিকগুলো বেশি সহজতর হয়ে ওঠে।

কাঁচা মধু বিবেচনায় পরাগ এবং প্রোপোলিসের ক্ষুদ্র বিট রয়েছে (যা বেশিরভাগ কাঁচা মধুর পুষ্টিগুণের জন্য দায়ী)। গ্লুকোজ এই কণাগুলিতে ল্যাচ করতে পছন্দ করে, কাঁচা মধু প্রাকৃতিকভাবে আরও প্রসেসড, হাই-ফ্রুক্টোজ হানিগুলির চেয়ে দ্রুত স্ফটিকিত করে তোলে। আপনি যদি আপনার মধুটি স্ফটিকের পরে আবার প্রবাহিত করতে চান তবে স্ফটিকগুলি ভেঙে ফেলার জন্য আপনি এটিকে একটি চামচ দিয়ে নাড়াতে পারেন বা হালকা গরম পানিতে, স্নানের পাত্রে রেখে আপনার মধু হালকা গরম করতে পারেন।

5. "If the bee disappeared off the face of the earth, man would only have four years left to live." –আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের নামে চালানো এ উক্তিটা অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এমন উক্তির মধ্যে উপর্যুক্ত উক্তিটি অন্যতম। তবে, উদ্ধৃতি তদন্তকারী অনুসারে, আইনস্টাইন এটি কখনও বলেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর মৃত্যুর ৯০ বছর পরে ফরাসি একটি জার্নাল থেকে এটা প্রকাশ পেলেও মৌমাছির অনুপস্থিতিতে আইনস্টাইন কোনো ভাগ্য গণনা করেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই।

মৌমাছি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ বাহক তবে একমাত্রও নয়, আবার সকল ফসলের পরাগায়নে সাহায্য করে এমনও নয়। তবে বহু ফুল পরাগায়নের জন্য মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল, যা অন্য প্রাণী দিয়ে সম্ভব নয়। মৌমাছি এদিক থেকে অবশ্যই স্পেশাল। সেই উদ্ভিদগুলোর বিলুপ্ত হওয়ার চান্স আছে। 'এক ঢিলে অনেক পাখি' টাইপ কিছু একটা ঘটবে। নাটকীয়ভাবে মানুষের খাদ্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে তবে সম্ভবত দুর্ভিক্ষের দিকে নিয়ে যাবে না।

পৃথিবীতে এমন অনেক ফসল রয়েছে যার উৎপাদনের জন্য মৌমাছিদের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল ভুট্টা, গম, চাল, সয়াবিন–মানব ক্যালোরির সিংহভাগ এখনও এসব থেকেই আসে। বায়োমাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশ্বজুড়ে যে ৯২টি ফসল খাদ্য সরবরাহ করে তার প্রায় ৯০ শতাংশ বাতাসে পরাগায়িত হয়। মানে বেশিরভাগ উদ্ভিদে বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন হয়। যেমন : ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, বাজরা, ওট জাতীয় ঘাস, চাল, জর্বাংস, রাই এবং আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভাস বা ম্যানিওকস, কলা এবং নারকেল। ক্যালোরির আরও একটি বড়ো অংশ (এবং প্রোটিন ইত্যাদি) এমন উদ্ভিদ থেকে আসে যা স্ব-পরাগায়িত হয়, যেমন : সয়াবিন, লেটুস, মটরশুটি।

ব্লুবেরি এবং চেরির পরাগায়নের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মধুচক্রের ওপর নির্ভর করে। তবে ধারণা করা হয় টমেটো, ব্লুবেরি, ক্র্যানবেরি এবং বেশিরভাগ মটর পরিবারের সদস্যরা honey bees এর তুলনায় ভুট্টা বা ছুতের মৌমাছির দ্বারা আরও ভালো পরাগায়িত হয়। প্রজাপতি, মথ, হোভারফ্লাইস, পাখি, ফ্রুটব্যাটস এবং অস্ট্রেলিয়ান চিনির গ্লাইডারসহ অন্যান্য প্রাণী পরাগবাহক রয়েছে, তবে বেশিরভাগ ফুলের গাছগুলি মৌমাছিদের পছন্দ করে।

মৌমাছি বাহক হিসেবে কাজ করে এমন খাবারগুলি দুর্লভ এবং আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফসল শুধু শখের বশে উৎপন্ন হবে। মৌমাছি না থাকলে তাজা উৎপাদনের প্রাপ্যতা ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে এবং মানুষের পুষ্টি

সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আসবে।

বিশুদ্ধ মধু বেছে নেওয়ার জন্য অনেকেই ঘরোয়া পদ্ধতি খুঁজতে থাকেন এবং সেগুলো খুব সুন্দরভাবে কেউ কেউ উপস্থাপনও করেন, যার বেশিরভাগই তেমন কাজের হয় না। এই উপস্থাপনার কমন কয়েকটি পদ্ধতির ভুল খোঁজার আশায় এখানে লিখলাম। পদ্ধতিগুলো হলো:

১. বুড়ো আঙুলের পরীক্ষা ও ঘনত্ব:
সামান্য মধু নিন বুড়ো আঙুলে। দেখুন, এটি অন্যান্য তরলের মতো ছড়িয়ে পড়ে কি না। মধু খাঁটি না হলে তা অন্য তরলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসল মধু ঘন হয়ে আটকে থাকবে, সহজে ছড়াবে না। আবার একটু বেশি পরিমাণ মধু নিয়ে বুড়ো আঙুল উলটো করে ধরে রাখলে তা সহজে ফোঁটা আকারে পড়বে না।

এই বর্ণনায় মূল কথা কী বুঝলেন? মধু অনেক ঘন হয়ে থাকে যার কারণে মধু হাতে লেগে যায়। কিন্তু আসলে মোটেও সেরকম হয় না।

মধুর সান্দ্রতা নির্ভর করে মধুর আর্দ্রতার ওপরে। যে মধুতে পানি বেশি সেটা কম ঘন। যে মধুতে পানি কম সেটা অধিক ঘন। মরু এলাকার ফুলের মধু আর বাওড় এলাকার ফুলের মধুতে অনেক তফাত থাকে। সুন্দরবনের একদম খাঁটি মধু অনেক পাতলা হয়, আবার সরিষা ফুলের সাথে অনেক ভেজাল মেশানোর পরেও সেটাকে বেশ ঘন মনে হবে।
কিন্তু এতেই মধু ব্যাবসায়ীদের বিশাল ক্ষতি হয়। সত্যি কথা বলতে কী, খাঁটি মধু বানানোর চাপে অনেক ভালো মধু উৎপাদকরাও মধুকে প্রক্রিয়াজাত করতে বাধ্য হন। প্রক্রিয়াজাত মানে মৌমাছির তৈরি মধুকে উত্তপ্ত করে পানির পরিমাণ কমিয়ে ফেলা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ কাজটা করতে গিয়ে মধুর বেশ কিছু পুষ্টিমান হারিয়ে যেতে পারে।

২. পিঁপড়া পদ্ধতি:

এটা আরেকটা দারুণ পদ্ধতি। পিঁপড়া মিষ্টি জিনিস পছন্দ করলেও মধু পছন্দ করে না। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তবে আমরা সেদিকে যাব না। এক টুকরো কাগজে কিছু মধু লাগিয়ে যেখানে পিঁপড়া আছে সেখানে রেখে দিন। যদি পিঁপড়ারা এই কাগজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এটিকে ঘিরে ধরে, তাহলেই বুঝতে হবে এই মধু আসল মধু নয়। আর যদি পিঁপড়ারা পাত্তাই না দেয়, আপনি বুঝবেন যে এটা আসলেই আসল মধু। আসলেই কি পিঁপড়ারা মধু পছন্দ করে না?

এর উত্তর হলো, না, মধু এদের খুব বেশিই প্রিয়, কিন্তু এটাও ঠিক যে মধুতে পিঁপড়া কম আসে। পিঁপড়া আসলে ময়েশ্চার দ্বারা আকর্ষিত হয়। খাঁটি মধুতে ২০% এর কম ময়েশ্চার থাকায় পিঁপড়ারা এতে আকর্ষিত কম হয়। কিন্তু আপনি যদি খাঁটি মধু টেবিলের ওপর রেখে দেন তাহলে এটি বাতাস থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ময়েশ্চার পেয়ে যাবে। পিঁপড়াও হামলে পড়বে মধুর দিকে। কিন্তু এটা ঠিক যে ভেজাল মধুতে পিঁপড়া খাঁটিটার থেকে তাড়াতাড়ি আক্রমণ করবে। আরও দুটো মজার পদ্ধতি আছে।

৩. কাপড়ে দাগ পদ্ধতি:
এক টুকরো সাদা কাপড়ের ওপর সামান্য পরিমাণ মধু নিন এবং কিছুক্ষণ পর কাপড়টি ধৌত করুন। ধোয়ার পর কাপড়টিতে যদি কোনো দাগ থাকে,

তবে মধুতে ভেজাল আছে। আর যদি কোনো দাগ না থাকে, তবে মধু খাঁটি।

৪. পানির পরীক্ষা:
এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ মধু নিন। ভেজাল মধু শীঘ্রই পানির সঙ্গে মিশে যাবে। কিন্তু আসল মধু মিশে গেলেও এর কিছু অংশ ঘন হয়ে ভেসে বেড়াবে পানিতে অর্থাৎ ছোটো ছোটো দলা আকারে পানির মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বিশেষ করে সামান্য অংশ তলানিতে পড়ে থাকবে। কিন্তু বাজে মানের মধু একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে। তবে এই পদ্ধতিতে আসল মধুর সাথে কিছুটা ভেজাল মেশালে তা সহজে বোঝা যাবে না, সেটা তো ধরেই নেওয়া যায়।
যাহোক, শেষে সবচেয়ে মজার পদ্ধতি নিয়ে বলা যাক :

এই পদ্ধতির নামঃ আগুনের পরীক্ষা বা কাগজ জ্বালানো।

ভিন্ন পরীক্ষা কিন্তু কারণ একই। তাই একটার বর্ণনা দিলাম। এই পদ্ধতিটার বর্ণনা খুবই কৌতূহলী করে তোলে। এর বর্ণনা বেশিরভাগ জায়গায় এমন:

হয়তো এ পদ্ধতির কথা এর আগে শোনেননি। খাঁটি মধু কিন্তু দাহ্য পদার্থ। তবে মধুতে আগুন জ্বালানোর আগে সাবধান থাকবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করতে হবে। তবে পরীক্ষা অতি সাধারণ। ম্যাচের একটা কাঠি মধুতে চুবিয়ে নিন। এবার এই কাঠি জ্বালাতে ম্যাচবক্সে আঘাত করুন। জ্বলে উঠলে মধু নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর মধুতে ভেজাল থাকলে আগুন জ্বলবে না।

এখন মজার ব্যাখায় আসা যাক:
মধুতে সামান্য মোম মিশিয়ে দিলেই মধুটা সটান পানির তলায় চলে যাবে, জমে থাকবে। আগুন ধরিয়ে দিলে আগুন জ্বলবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই মোমটা যদি মধুতে না মিশিয়ে চিনির শিরাতে মিশিয়ে দেন, একই ফল পাবেন। চিনির শিরা ঘন করে বানিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে চিনির শিরা বেশি ঘন হলে সোজা তলে চলে যায়, দ্রবীভূত হয় না। ফলে চিনির শরবতেও আগুন জ্বলবে।
সকল মধুর রং এক নয় সবাই জানে। কিন্তু একই মধুর রংও কিন্তু ভিন্ন হতে পারে। এটা নির্ভর করে মধুতে মোমের পরিমাণের ওপর।
আরেকটা বিষয় আছে। মনে করেন, আপনার নিজের বাড়ির মধু। মৌচাক কেটে আনা হয়েছে আপনার সামনেই। এখন মধু সংগ্রহ করতে লোক আছে। সেই লোকগুলো আপনার কড়া নজরের মধ্যেও মধুর মধ্যে ভেজাল দিয়ে দিতে পারে, এটা তাদের বাঁ হাতের ব্যাপার। প্রশ্ন করতে পারেন, এতে তার লাভ কী? তার লাভ হলো টাকা।

মৃত্যুর পরও নখ আর চুল বাড়ে?

আসিফ আফতাব সোহাগ

প্রশ্ন করার মাধ্যমে এগোনো যান। মৃত্যুর পরও নাকি নখ আর চুল বাড়ে? আসলেই কি তাই?

উত্তর হচ্ছে, না। তাহলে এই গুজব এলো কোথা থেকে? এটা হয়তো যাচাই না করেই বিশ্বাস করে নেওয়া সেই লোকদের থেকে ছড়িয়েছে যারা কোনো মৃত ব্যক্তির নখ আর চুল এর আকার খেয়াল করে রেখেছিল এবং কয়েকদিন পরে মৃত ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে দেখে নখ আর চুল বড়ো দেখাচ্ছে।

মৃত্যুর পর নখ আর চুল কেন বড়ো হয় না, এটা জানতে হলে আগে জানতে হবে নখ আর চুল কী এবং জীবিত থাকা অবস্থায় কেন এগুলো বাড়ে। শুধু গুজবটা রটার কারণ জানতে চাইলে শেষ প্যারা দেখতে পারেন।

আঙুলের গোড়ায়, নখ যেখানে ত্বকের সাথে মিশে গেছে, এই অংশটুকুকে বলা হয় কিউটিকল। এর ভেতরের দিকে, আঙুলের আরও গভীরে থাকে নখের মূল; একে ম্যাট্রিক্স বলা হয়। এই ম্যাট্রিক্স থেকেই অনবরত নখের সৃষ্টি হতে থাকে। নখগুলো গোড়ার দিকে যেখানে গিয়ে ত্বকে মিশেছে, সেখানে সম্পূর্ণ সাদা অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি অংশ দেখা যায়। না দেখতে পেলেও সমস্যার কিছু নেই, সাধারণত দেখা যাওয়ার কথা নয়। বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে তাকালে হয়তো স্পষ্ট দেখা যেতে পারে। এই অংশটুকুকে বলা হয় লুনুলা, এটি ত্বকের নিচে ম্যাট্রিক্সের বাড়তি অংশ। অর্ধচন্দ্রাকৃতির হওয়ায় এর নাম হয়েছে লুনুলা। নখ এবং চুল মৃত কোষ দিয়ে তৈরি। কোনো ধরনের স্নায়ু সংযোগ থাকে না বলে নখ কিংবা চুল কাটলে আমরা ব্যথা পাই না। কিন্তু নখের ম্যাট্রিক্স অংশটুকু মৃত নয়, জীবিত কোষ দ্বারা তৈরি হয়েছে। ত্বকের নিচে এর সাথে রক্তবাহিকা এবং স্নায়ু সংযুক্ত থাকে। রক্তবাহিকার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পুষ্টি পেয়ে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ তৈরি করে এই ম্যাট্রিক্স, নতুন তৈরি হওয়া কোষগুলোকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়, যা কিউটিকল পার করে বাইরের দিকে উন্মুক্ত হয়। নখ হিসেবে আমরা যে অংশটুকুকে চিনি, সেই শক্ত আবরণটুকুকে বলা হয় 'নেইল প্লেট'। ম্যাট্রিক্স কোষ থেকে অনবরত কেরাটিন কোষ তৈরি হয়ে বাইরে এসে নেইল প্লেট তৈরি করে। এই কোষগুলো কেরাটিন জাতীয় প্রোটিন তৈরি করে বলেই এরা মারা যাওয়ার পর শক্ত হয়ে যায়। নখের ঠিক নিচে একস্তর জীবিত কোষের আবরণ থাকে। এই জীবিত কোষের আবরণ নেইল বেড নামে পরিচিত। এতে রক্তবাহিকা এবং স্নায়ু রয়েছে। এজন্যই নেইল বেড কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা ব্যথা পাই। নখ এবং চুল হিসেবে আমরা যেটুকু দেখছি, পুরোটাই মৃত কোষে তৈরি। কিন্তু আমরা নখ বা চুল কাটার সময় অগ্রভাগে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাটতে পারি, ভেতরের দিকে কাটতে গেলেই ব্যথা লাগবে। মৃত কোষে নির্মিত নখ প্লেটে ব্যথা হয় না, যদি নখ উপড়ে ফেলা হয় কিংবা কাটা হয়, নেইল বেডে থাকা স্নায়ুর জন্যই আমরা ব্যথা পেয়ে থাকি। নেইল বেড যদি অক্ষত থাকে, নেইল প্লেট ঠিকমতো পুনরায় তৈরি হয়ে যাবে। নখের বেড়ে ওঠা খুবই ধীরগতির। পায়ের নখগুলো হাত থেকে

আরও ধীর গতিতে বেড়ে উঠে। হাতের নখ প্রতি মাসে ৩ মিলিমিটারের মতো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ, ছয় মাসের ভেতর একটি আঙুলের সম্পূর্ণ নেইল প্লেটটি প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে নতুন নেইল প্লেট দ্বারা। কোনো দুর্ঘটনায় যদি নখের কোনো ক্ষতি হয়, চিন্তার কোনো কারণ নেই, নেইল বেড ঠিক থাকলে ৫-৬ মাসেই নতুন নখ তৈরি হয়ে যাবে। আর পায়ের নখগুলো প্রতিমাসে ১ মিলিমিটারের মতো বাড়ে, পুরো নেইল প্লেট প্রতিস্থাপিত হতে সময় প্রয়োজন প্রায় এক থেকে দেড় বছরের মতো।

চুলের বড়ো হওয়ার প্রক্রিয়াও প্রায় একই রকম। তাই আলাদা করে বাড়তি কিছু বলার দরকার নেই। চুলের প্রধান উপাদানও কেরাটিন। মাথার স্ক্যাল্পে প্রায় এক লক্ষের মতো ফলিকল আছে। ফলিকলের নিচে প্রতিটি গোড়া থেকে চুল বাড়তে শুরু করে। মূলটি প্রোটিনের কোষ দ্বারা গঠিত। মাথার ত্বকের রক্তনালিগুলি থেকে রক্ত শিকড়কে পুষ্টি যোগায়, যা আরও বেশি কোষ তৈরি করে এবং চুল বাড়ায়। একটি চুল বছরে প্রায় ছয় ইঞ্চির মতো বড়ো হয়। চুল স্ক্যাল্পের ভেতর ধাক্কা খেয়ে বড়ো হওয়ার সময় তেল গ্রন্থি চুলে তেল যোগ করে চুলকে চকচকে এবং নরম রাখে। এটি চুলকে চটচটেও করতে পারে। এজন্য আমাদের চুল ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে। শরীরের অন্যান্য অংশের চুলগুলোও প্রায় একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়। কিন্তু পুরো চক্রটি চলে ধীরগতিতে। তাই শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চুলগুলো মাথার চুলগুলোর মতো তাড়াতাড়ি বড়ো হয় না।

বারংবার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নখ এবং চুলের বেড়ে ওঠা খুবই প্রয়োজনীয়। নখ এবং চুলগুলো যদি দাঁতের মতো স্থায়ী হতো তাহলে হয়তো বা আমাদের কষ্ট করে নখ বা চুল কাটা লাগত না। আর নখ এবং চুল কাটা নিয়ে এত ভাবতেও হতো না। কোনো দুর্ঘটনায় নখ পড়ে গেলে বা অতিরিক্ত গরমের কারণে চুল কেটে ফেললে সেখানে পুনরায় গজানোর সুযোগ থাকে। দাঁতের মতো স্থায়ী কিছু হলে এই সুযোগ আর থাকত না। একবার নষ্ট হলে কিংবা উপড়ে গেলে বাকি জীবন নখ বা চুল ছাড়াই থাকতে হতো। মানব শরীরে নখ আর চুলের গুরুত্ব কম নয়।

বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া নখ এবং চুলের এই বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলতে থাকে সারাজীবন ধরে। হাতের নখ বা চুল বড়ো হতে হলে নতুন কোষ গঠন করাটা আবশ্যক। কিন্তু মৃত্যুর পর এই জটিল প্রক্রিয়াটা কোনোমতেই ঘটতে পারে না। কারণ কোষ বিভাজনের জন্য প্রয়োজন হয় গ্লুকোজ, যেটা তৈরি হয় অক্সিজেনের সাহায্যে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শরীরের আর কোনো অংশে অক্সিজেন পৌঁছায় না। ফলে কোষগুলোও হয়ে পড়ে নিস্তেজ। ব্রেইন সেলগুলোও কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। অন্যান্য অঙ্গও (যেমন : কিডনি, লিভার) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য জীবিত ব্যক্তির শরীরে স্থাপন না করলে ড্যামেজ হয়ে যায়। নখ আর চুল বড়ো হওয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিটির পর্যবেক্ষকদের নিকট তৈরি হয় একটা বিভ্রম। নখগুলো আর বৃদ্ধি না পেলেও এর চারপাশের চামড়াগুলো আর্দ্রতা হারানোর কারণে সংকুচিত হয়ে আসে। তখন মনে হয় যেন নখগুলোই আকারে বাড়ছে। চুলের ক্ষেত্রেও ঘটে কম-বেশি একই ঘটনা। মৃত্যুর পর যখন চিবুকের চামড়াগুলো সংকুচিত হয়ে আসে তখন মনে হয় যেন দাড়ি-গোঁফগুলো আকারে বাড়ছে। আর মাথার খুলির ওপরে থাকা চামড়া সংকোচনের কারণে মনে হয় চুল বড়ো হচ্ছে।

রেগুলেটর মিথ

সুব্রত দেবনাথ সদানন্দ

শীত শেষ। গরম পড়তে শুরু করেছে। আর গরমকালে বিদ্যুৎ চালিত ফ্যান/পাখা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র। আর এই যন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় রেগুলেটর দিয়ে। অর্থাৎ, ফ্যানের সাথে রেগুলেটরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেগুলেটর না থাকলে আপনার ফ্যানের জোর/গতি কম-বেশি করতে পারবেন না। আর আমাদের প্রায় সকলেরই একটা কৌতূহল আছে যে, রেগুলেটর দিয়ে ফ্যানের গতি কমানো হলে কি বিদ্যুৎ খরচ কম হবে? নাকি জোরে চালালে যে খরচ হয়, গতি কমালেও বিদ্যুৎ খরচ একই হয়? আজ আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই বিষয়টা নিয়ে। তাহলে চলুন, শুরু করি।

যদি কোথাও প্রশ্ন করা হয়, "ফ্যানের গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকে না কি বিদ্যুৎ খরচ কম হয়?" তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় দুই রকম। কেউ বলবে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকবে। আবার কেউ বলবে বিদ্যুৎ খরচ কমে যাবে। তারা দুজনেই মোটামুটি সঠিক উত্তর দিয়েছে। কী? কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন, তাইতো? আসলে বিদ্যুৎ খরচ কমবে কি কমবে না, সেটা নির্ভর করবে কী ধরনের রেগুলেটর ব্যবহার করছেন তার ওপর। রেগুলেটর সাধারণত দুই প্রকার।

(১) ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর।
(২) ইলেকট্রনিক রেগুলেটর।

আপনি যদি ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর ব্যবহার করেন, তাহলে গতি কমালে বা বাড়ালে বিদ্যুৎ খরচ একই থাকবে। আবার আপনি যদি ইলেকট্রনিক রেগুলেটর ব্যবহার করেন, তাহলে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে যাবে, গতি বাড়ালে বিদ্যুৎ বেশি খরচ হবে।
এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটর কীভাবে চিনবেন।

ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর :
যে সকল বড়ো বড়ো রেগুলেটর আগে ব্যবহৃত হতো, যেগুলো সুইচ বোর্ডের অর্ধেকের বেশি জায়গা দখল করে এবং খুব গরম হয়। যদি খুলে দেখতে পারেন তাহলে দেখবেন, একটি লোহার কোর এর গায়ে প্রচুর পরিমাণে তামার তার পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর:
এটা দেখতে অত্যন্ত ছোটো সাইজের হয়। প্রায় একটা সুইচ এর সমান। সুইচবোর্ডে একটা সুইচ এর সমান জায়গা দখল করে। খুব সামান্য গরম হয়। যদি খুলে দেখতে পারেন, তাহলে দেখবেন, এটা একটি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার, একটা বা কয়েকটা ফিক্সড রেজিস্টার, ট্রায়াক ও ক্যাপাসিটর দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা সার্কিট।
এবার আসি এদের কার্যপ্রণালিতে।

ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর:
ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর তৈরি করা হয় মূলত আয়রন কোরের গায়ে তামার তার পেঁচিয়ে। বিদ্যুৎ এই তারের ভেতর দিয়ে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে প্রবাহিত হওয়ার সময় কিছু বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে ফ্যান পূর্ণ শক্তি পায় না এবং ফ্যানের রোটেশন/গতি কমে যায়। এতে মূল বিদ্যুৎ খরচ একই থাকছে। অর্থাৎ, ফ্যানের গতি কমলেও বিদ্যুৎ খরচ কমছে না। কারণ, রেগুলেটর কিছু বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে অপচয় করে দিচ্ছে, ফলে ফ্যান কম বিদ্যুৎ পাচ্ছে এবং আস্তে ঘুরছে।

ইলেকট্রনিক রেগুলেটর :
ইলেকট্রনিক রেগুলেটর তৈরি হয় সাধারণত একটি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার, একটা বা কয়েকটা ফিক্সড রেজিস্টার, ট্রায়াক ও ক্যাপাসিটর দিয়ে। এখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে ট্রায়াক। ট্রায়াকের সাথে ফিক্সড রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ও একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার দিয়ে একটা থাইরিস্টর জাতীয় ইলেকট্রনিক সুইচিং ডিভাইস তৈরি করা হয়। এটা মূলত খুব দ্রুত সুইচিং অর্থাৎ, সংযোগ অন-অফ করার মাধ্যমে ফ্যানের গতি কমিয়ে দেয়। আপনার নির্ধারণ করা পরিমাণে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করে এবং রেগুলেটর নিজে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ অপচয় করে। তাতে করে ফ্যানের গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচও কমে যায়।

জেমস র‍্যান্ডি এবং তাঁর কাজ

জহিরুল ইসলাম

১.

২০ অক্টোবর রাতে মারা গেছেন জেমস র‍্যান্ডি। না, করোনাভাইরাসের কারণে নয়, স্বাভাবিক বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মারা গেলেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। একই সাথে, জেমস র‍্যান্ডি যাদের ধান্দাবাজি ফাঁস করে দিয়েছেন, তারা হয়তো এখন আনন্দে মিষ্টি বিলাচ্ছে।

কে এই James Randi?

জেমস র‍্যান্ডির আসল নাম Randall James Hamilton Zwinge. ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন স্টেইজ ম্যাজিশিয়ান হিসেবে। লেখাপড়া খুব বেশি করেননি। কলেজ থেকে ক্লাস পালিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন সার্কাস দলে এবং নাইট ক্লাবে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়িয়েছেন জীবনের প্রথম কয়েক বছর। স্টেইজে নিজেকে 'The Amazing Randy' বলে পরিচয় দিতেন।

তারপর তিনি একসময় দেখলেন, ম্যাজিককে 'অলৌকিক ক্ষমতা' দাবি করে অনেক মানুষ বিভিন্নভাবে আমজনতাকে প্রতারিত করছে। তিনি তখন এদের ভণ্ডামি দেখিয়ে দেওয়া শুরু করলেন।

আপনারা অনেকে হয়তো AXN চ্যানেলের 'Breaking the magician's code : Magic's Biggest Secret Finally Revealed' সিরিয়ালটা দেখেছেন। এই সিরিজে ভ্যাল ভ্যালেন্টিনো নামের একজন আমেরিকান ম্যাজিশিয়ান বিভিন্ন ম্যাজিক দেখান প্রথমে, তারপর সেই ম্যাজিক কীভাবে করলেন সেই ট্রিকটাও দেখিয়ে দেন।

কীভাবে আইফেল টাওয়ার গায়েব করা যায়, কীভাবে নায়িকার শরীর দুই ভাগ করে কেটে আবার জোড়া লাগানো যায়, কীভাবে পানির ওপর হাঁটা যায়, কীভাবে আকাশে ভেসে বেড়ানো যায়, কীভাবে টুপির মধ্যে থেকে খরগোশ বের করা যায় বা অদৃশ্য করা যায়—এইরকম কয়েকশ ম্যাজিকের ট্রিক দেখানো হয়েছে এই সিরিয়ালে।

'Magic Secrets Revealed' নামের ইউটিউব চ্যানেলে এরকম অনেক ভিডিয়ো দেখতে পাবেন।

নিজের নিরাপত্তার জন্য ভ্যাল ভ্যালেন্টিনো কোনো কথা বলেন না, একটা মুখোশ পরে শো করেন। (এ কারণে তাঁকে মাস্কড ম্যাজিশিয়ানও বলা হয়)

গুজব শুনেছিলাম, পেশাদার ম্যাজিশিয়ানদের সব ট্রিক ফাঁস করে দেওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা নাকি ভ্যাল ভ্যালেন্টিনোকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।

যাহোক, জেমস র‍্যান্ডির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জেমস র‍্যান্ডিও এইভাবে তাঁর শেখা বিভিন্ন জাদুর ট্রিক দিয়ে মানুষদের সাহায্য করা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকায় প্রচুর 'প্যারানরমাল রিসার্চার'-এর আবির্ভাব ঘটল। তারা বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্যারানরমাল ঘটনা দেখাতেন মানুষদের। এসব থেকে বাঁচার জন্য মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সাও নিতেন।

জেমস র‍্যান্ডি এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করলেন। নিজের সংগঠন, 'জেমস র‍্যান্ডি এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সংগঠনে যুক্ত হলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জ্যোতির্বিদ, মনোবিদসহ বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, সবই ভুয়া। সবই নরমাল ঘটনা, কোনো প্যারানরমাল কিছু নেই।

গুজব এবং ভুয়া প্যারানরমাল তথ্যের বিস্তার ঠেকাতে জেমস র‍্যান্ডি এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছিল। কেউ যদি কোনো প্যারানরমাল ঘটনা বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ক্ষমতা দেখাতে পারে, তাহলে তাকে ১ মিলিয়ন পাউন্ড (বাংলাদেশি ৮ কোটি টাকা) দেওয়া হবে। আর যদি এমন কোনো ঘটনা দেখাতে না পারে, তাহলে তার ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, কেউ-ই সে চ্যালেঞ্জ জিততে পারেনি। অনেকেই এসেছিল অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে, কিন্তু ধরা খেয়ে ফিরে গেছে সবাই।

২.
র‍্যান্ডির জীবনের কয়েকটা বিখ্যাত কাণ্ড-কীর্তির কথা শোনাই।

(i) ইউরি গেলার নামের এক লোক দাবি করলেন, তিনি 'সাইকিক পাওয়ার' এর অধিকারী। এই সাইকিক পাওয়ার বা মানসিক শক্তি দিয়ে তিনি চামচ বা স্টিলের রড বাঁকিয়ে ফেলতে পারেন।

জেমস র‍্যান্ডি ইউরি গেলারের ম্যাজিক ট্রিক ধরে ফেললেন খুব সহজে। তিনি দেখালেন, সাইকিক পাওয়ার বা টেলিকাইনেসিস নামে কিছু নাই। মনের শক্তি দিয়ে, হাতে টাচ না করে কোনো কাজ করা সম্ভব না। কাজ করতে হলে অবশ্যই বল প্রয়োগ করতে হবে।
ইউরি গেলারের ম্যাজিকে, চামচের বিশেষ অংশ নরম থাকত। ওই অংশে হাত দিয়ে অল্প চাপ দিলেই বেঁকে যেত সেটা।

জেমস র‍্যান্ডির কাছ থেকে ধরা খাওয়ার পর ইউরি গেলার আবার নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এলেন। কয়েক ঘণ্টা একটা স্টেজের ওপরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন চামচের দিকে। এক সময় দেখা গেল, চামচ বেঁকে গেছে।

জেমস র‍্যান্ডি এটারও রহস্য বের করে দিলেন। চামচটা দুইটা আলাদ ধাতু দিয়ে বানানো হতো (লোহা আর নিকেলের দুইটা পাত থাকত ভিতরে, ওপরে গ্যালভাইনাইজড করে সুন্দর ফিনিশিং দেওয়া হতো। বোঝার কোনো উপায় নেই যে ভিতরে আলাদা দুইটা পাত)।

এরপর উজ্জ্বল আলো ফেলা হতো চামচের ওপর। ফলে লোহা আর নিকেল, দুইটাই দৈর্ঘ্যে অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পেত। লোহা যতটুকু লম্বা হতো, নিকেল ততটুকু লম্বা হতো না। ফলে, অসম দৈর্ঘ্য প্রসারণের জন্য চামচটা এক সময় বাঁকা হয়ে যেত।

ফিজিক্সের এই ঘটনা দর্শকদের সামনে লুকিয়ে রেখে ইউরি গেলার বলতেন, আমি সাইকিক পাওয়ার দিয়ে চামচ বাঁকিয়ে ফেলছি। জেমস র‍্যান্ডি তার ধান্দাবাজি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। 'The Truth About Uri Geller' নামে একটা বইও লিখেছিলেন তখন তিনি।

(ii) হোমিওপ্যাথি যে ভুয়া, এর ওষুধের মধ্যে পানি আর চিনি ছাড়া আর কোনো কেমিক্যাল নাই, সেটা প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজের শরীরের ওপরেই পরীক্ষা করেছিলেন।

তিনি গেলেন একটা হোমিওপ্যাথির দোকানে। ৬ মাসের ঘুমের ওষুধ কিনলেন। তারপর সেই ৬ মাসের ওষুধ একসাথে খেয়ে ফেললেন।

এত ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরেও তার একটুও ঘুম এলো না। তিনি হেঁটে চলে বেড়ালেন ঠিকমতো।

পরবর্তীতে তিনি টেড টকেও দর্শকদের সামনে লাইভ হোমিওপ্যাথি খেয়ে দেখিয়েছেন, এর কোনো ইফেক্ট নাই।

(iii) পিটার পপফ (Peter popoff) নামের এক Faith healer ধান্দাবাজির ব্যাবসা করছিলেন আমেরিকায়। শত শত মানুষ তার সেশনে আসত অডিটোরিয়াম ভর্তি করে। পপফ দর্শক সারি থেকে একেকজনকে র‍্যান্ডমলি দাঁড় করান। তারপর তার নাম, বাপের নাম, বাসার ঠিকানা, বয়স, হবি, অসুখ-বিসুখ সহ ৬৪ গুষ্টির কথা বলে দিয়ে চমকে দেন তাকে। দাবি করেন, ঈশ্বর তাকে এইসব তথ্য জানিয়ে দিচ্ছেন কোনো এক অলৌকিক উপায়ে।

তারপর দর্শককে স্টেজে এনে বিশেষ পদ্ধতিতে (মন্ত্র পড়ে, হাত-পা নাড়ানাড়ি করে) ওই রোগীর দেহ থেকে শয়তান বের করে দেন। রোগী সর্বরোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জেমস র‍্যান্ডি দেখালেন, পপফের কানে খুব ছোটো একটা হেডফোন লাগানো থাকে। এই হেডফোন দিয়ে তার অ্যাসিস্ট্যান্টরা বলে দেয়, কোন লোকের নাম কী, কার বয়স কত, কার কী অসুখ। অডিটোরিয়ামে ঢোকার সময়েই সবাই যে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করে, সেখান থেকেই এই তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

(iv) ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স লিভারমোর ল্যাবরেটরি থেকে একবার র‍্যান্ডির কাছে ফোন আসে। তাঁরা এক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছেন যিনি তাঁর হাতের উলটো পিঠে রাখা ম্যাচের বাক্সকে 'মনের শক্তি' দিয়ে (তাঁর কথামত) দাঁড় করাচ্ছেন এবং শোয়াচ্ছেন! কী আজব ব্যাপার-স্যাপার! তারা র‍্যান্ডিকে ফোন করলেন, বিষয়টি জানালেন।

র‍্যান্ডি ব্যাখ্যা দিলেন --

“এই জাদুটি করা খুব সহজ। ম্যাচের বাক্স হাতের ওপর রাখার সময় বাক্সটি একটু খুলে হাতের একটু চামড়া বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। মাংসপেশী সম্প্রসারণ আর সংকোচনের প্রভাবে এমনিতেই ম্যাচের বাক্সটি দাঁড়াবে এবং শুয়ে পড়বে।”

(v) জেমস হাইড্রিক নামের এক ধান্দাবাজ দাবি করলেন, তিনি হাত দিয়ে টাচ না করেই বইয়ের পাতা উলটাতে পারেন। র‍্যান্ডি তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তার বইয়ের পাতায় কিছু পাতলা ফোম আর বাদাম রেখে দিলেন।

টেবিলে বই রেখে, সে কয়েক পা দূর থেকে হেঁটে এসে টেবিলের কাছাকাছি বসত। হেঁটে আসা ও টেবিলের সামনে বসাতে, তার বডির সম্মুখমুখী মুভমেন্টের কারনে সম্মুখমুখী একটা এয়ার কারেন্ট তৈরি হতো। এই এয়ার কারেন্ট বইয়ের পাতাতে গিয়ে ধাক্কা লাগত, সে শুধু টাইমিং করে হাত উঁচু করত, মনে হতো সাইকিক পাওয়ার।

র‍্যান্ডি বইয়ের চারপাশে পাতলা ফোম ছিটিয়ে রাখার পরে হাইড্রিক ওই ট্রিক খাটাতে পারেনি। ধরা পড়ে যায় সে।

এই ধরনের অনেক ধান্ধাবাজের গল্প এবং তাদের জারিজুরি ফাঁস করে দেওয়ার কাহিনি তিনি লিখেছেন তাঁর ৯০টা বইতে। 'Conjuring' এবং 'The Faith Hellers' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় বই।

(জানামতে, তাঁর কোনো বই এখনো বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। আগ্রহী কোনো অনুবাদক কি এগিয়ে আসবেন প্লিজ?)

(vi) শুধু রিয়েল লাইফে নয়, তিনি প্রচুর লাইভ টিভি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। হিন্দি 'পিকে' সিনেমায় পিকে আর গুরুজী যেমন লাইভ বিতর্কে বসেছিল, সেইরকমভাবে জেমস র‍্যান্ডি অনেক টিভিতে লাইভ বিতর্ক করেছেন। 'Exploring Psychic Powers' এইরকম একটা টিভি শো ছিল।

টিভি পর্দায় অভিনেতা হিসেবেও দেখা গেছে তাঁকে অনেক জায়গায়। অতি সাম্প্রতিক নেটফ্লিক্সের 'The Messiah' তার উদাহরণ। এই টিভি সিরিয়ালে দেখা যায়, পায়াম গোলশিরি নামক এক লোক সিরিয়ার মরুভূমি থেকে উঠে এসে নিজেকে 'ইমাম মাহদি/দ্য মেসায়া / ত্রাণকর্তা' হিসেবে দাবি করছে। ঘটনাচক্রে সে নিউইয়র্কে পৌঁছায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লেইকে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে লোকজনকে মুগ্ধ করে।

টিভিতে তখন জেমস র‍্যান্ডি পায়াম গোলশিরিকে চ্যালেঞ্জ করে, আমার সামনে, টিভি ক্যামেরার সামনে, সকল চেকিং এর মধ্যে দিয়ে মেসায়া আবার এসে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে দেখাক। ট্রিক বাদে তার যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, সে অবশ্যই আবার হাঁটতে পারবে।

মেসায়া পায়াম গোলশিরি সেই চ্যালেঞ্জ নেয়নি।

সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টা সিনেমা বা টিভি শোতে জেমস র‍্যান্ডি অভিনয় করেছেন। অধিকাংশ জায়গায় তিনি নিজের পেশাগত পরিচয়েই অভিনয় করেছেন।

৩.

নিজের জেমস র‍্যান্ডি ফাউন্ডেশন বাদেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'Committee for Skeptical Inquiry', যেটা বিশ্বের অনেকগুলো স্কেপটিক সংগঠনের একটা আমব্রেলা। কার্ল স্যাগান, আইজ্যাক আসিমভসহ অনেক বিজ্ঞানী, এমনকি নোবেল লরিয়েট এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলেন।

বিশ্বব্যাপী একটা নতুন আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি, যেটা 'Skeptic Movement' নামে পরিচিত। বিভিন্ন দেশের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গুজব দূর করে, মানুষকে শিক্ষিত সচেতন করে তুলতে এই স্কেপটিক মুভমেন্ট (সংশয়বাদী আন্দোলন) অনেক ভূমিকা রেখেছে।

জেমস র‍্যান্ডির দেখানো পথে পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অনেক স্কেপটিক সংগঠনের জন্ম হয়েছে। উইকিপিডিয়ার এই লিস্টে এমন কমপক্ষে ২৬টা সংগঠন এবং চ্যালেঞ্জের কথা পাওয়া যায়।

আমাদের প্রতিবেশী ভারতের কলকাতাতেই 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' নামে একটা সংগঠন আছে। তারা যে-কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারলে ৫০ লক্ষ রুপি দিবে। এই দলের মূল কর্ণধারের নাম প্রবীর ঘোষ। তাঁর লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটা খুব জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে এমন কোনো সংগঠন নেই। তবে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে চেষ্টা করছেন। যেমন-

(i) জুয়েল আইচ একবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, কেউ যদি চীন থেকে আমদানি করা নকল ডিম দেখাতে পারে, তাহলে তাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এখনো কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। কিন্তু ডিম সংক্রান্ত গুজব চলছে সমানে।

সাভারের 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট' এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আতাউল গনি রব্বানিও একই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। কোনো দাবিদার পাননি তিনিও।

(ii) খুলনায় 'ALO - Antisuperstition Learning Organization' নামে একটি সংগঠনের কথা জানা যায়, যারা এমন অলৌকিক ঘটনা প্রমাণে এক লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল।

(iii) 'Baba Exposed' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপ বিভিন্ন ফকির/কবিরাজ/ঘোস্ট হান্টার/প্যারানরমাল রিসার্চারের ভণ্ডামি উন্মোচন করে দেয়। এদের সবচেয়ে বড় সাফল্য- এবিসি রেডিয়ো ৮৯.২ এফএম-এর 'ডর' নামক অনুষ্ঠান বন্ধ করা।

আরজে কিবরিয়া আর রাদবি রেজার পরিচালনায় এই রেডিয়ো শোতে লাইভ প্ল্যানচেট করা হতো, জ্বিন নামানো হতো, আংটি, পাথর, আতর বিক্রি করা হতো। সোশ্যাল মিডিয়ায় এদের ভণ্ডামি প্রকাশ করার পরে পুলিশ অ্যাকশন নেয়। আরজে রেজাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে। এবিসি রেডিয়ো অথরিটি 'ডর' অনুষ্ঠানটা বন্ধ করে দেয় এবং আরজে কিবরিয়াকে এবিসি রেডিয়ো থেকে বহিষ্কার করে।

(iv) বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তালাশ, খোঁজ, ইনভেস্টিগেশন ২৪, সার্চ লাইট জাতীয় বিভিন্ন অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান দেখায় এখন। এরা বিভিন্ন অপবিজ্ঞান বা ধান্দাবাজির ব্যাবসা এক্সপোজ করে নিয়মিত।

যেমন-ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির তালাশের এক এপিসোডে দেখা যায়, যশোর এলাকায় এক কবিরাজ জ্বিনের সাহায্যে করোনার চিকিৎসা করত। তালাশের ক্যামেরা-সাংবাদিক দেখে তারা ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়েছে। ক্যামেরার সামনে কনফেস করেছে যে, এইভাবে করোনা নিরাময় সম্ভব নয়।

(v) জনপ্রিয় লেখক ও অনুবাদক মুহম্মদ নাজিম উদ্দিন এর 'পেন্ডুলাম' নামক বইয়ের নায়ক চারু আহসানকে দেখা যায় একটি কাল্পনিক স্কেপটিক সংগঠন চালাতে। এটা পুরোপুরি কাল্পনিক চরিত্র নাকি মুহম্মদ নাজিম উদ্দিনের পরিচিত কেউ এমন কার্যক্রম চালাচ্ছেন এবং তাকে দেখে তিনি এই বই লিখতে ইনস্পায়ার্ড হয়েছেন সেটা জানা যায়নি।

৪.

গুজব

আমরা, বাংলাদেশের মানুষ, অনেক বেশি গুজব শুনি, গুজব শুনে কাজ করি।
জেমস র‍্যান্ডির মতো বিচার বিশ্লেষণ করি না, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনেই দৌড় মারি চিলের পেছনে।
পদ্মা সেতুতে কল্লা লাগবে শুনেই ছেলেধরা সন্দেহে নিরীহ মাকে পিটিয়ে মেরে ফেলি।
চাঁদের গায়ে রাজনৈতিক নেতার ছবি দেখা গেছে শুনেই রাস্তায় নেমে ভাঙচুর শুরু করি।

থানকুনি পাতা খেলে করোনা সেরে যাবে শুনে গভীর রাতে থানকুনি পাতা খুঁজি।

ব্যাঙাচি

বিভিন্ন রোগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অন্যান্য অপচিকিৎসকদের কাছে ছুটি এবং নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনি।

জেমস র‍্যান্ডির মতো বিশ্লেষণী ক্ষমতার লোক আমাদের ঘরে ঘরে দরকার। ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবনে র‍্যান্ডি পৃথিবীবাসীকে সচেতন করার যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই ধারা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন আপনার, আমার, প্রত্যেক সচেতন মানুষের।
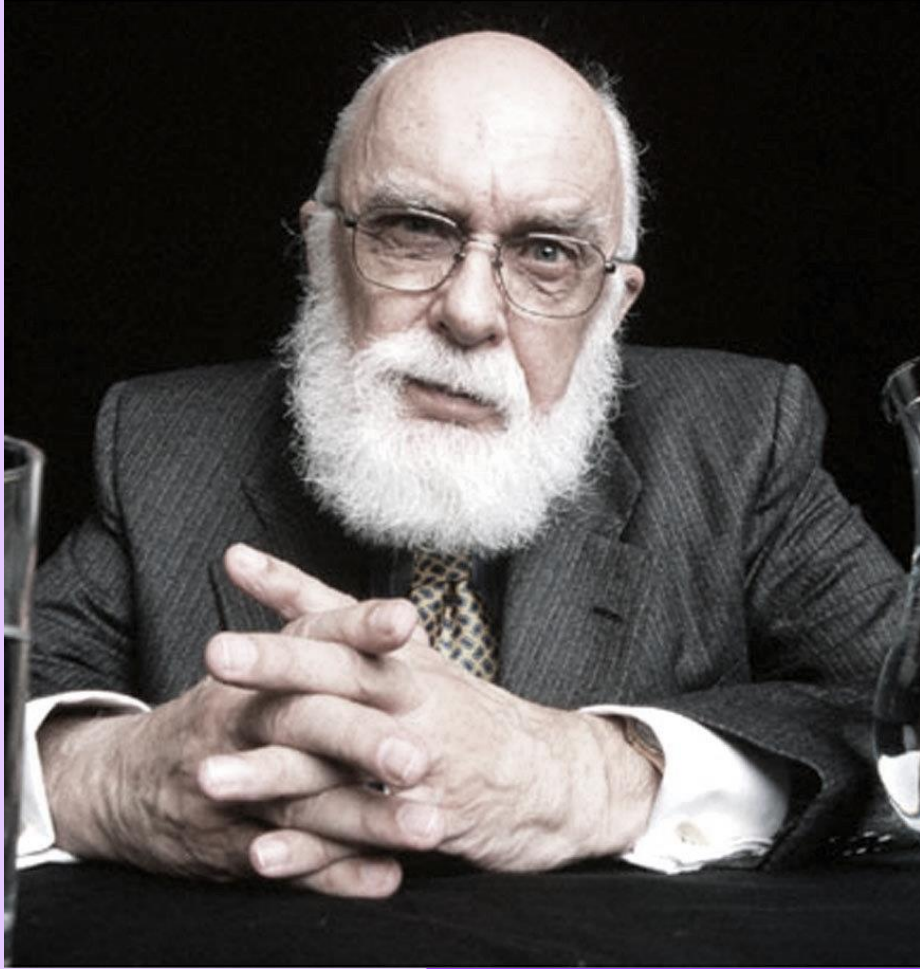
পিঁপড়ারা কি সত্যিই ঘুমায় না?

রওনক শাহরিয়ার

হ্যাঁ, পিঁপড়া ঘুমায়। কিন্তু তাদের ঘুম আমরা সাধারণত বুঝতে পারি না। ঘুম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের, বিশেষত পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের একটি জৈবিক অবস্থা, যা আমরা সচরাচর লক্ষ করলে বুঝতে পারি। কিন্তু একাকী বা দলবদ্ধ অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ঘুমের ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়। এজন্য মানুষের মাঝে বিষয়টা নিয়ে ধারণা না থাকায় বিভিন্ন গুজব প্রচলিত আছে। পিঁপড়া তেমনই একটি প্রাণী যারা কখনও ঘুমায় না বলে বিভিন্ন ফ্যাক্ট প্রচলিত আছে। পিঁপড়ারা যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে তাদের ঘুম কেমন?

বেশিরভাগ পিঁপড়াই কাজ করে (মূলত শ্রমিক শ্রেণি) এবং দিনে পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারে না। একটি ছোট্ট সংখ্যক পিঁপড়া, যারা অন্য পিঁপড়াদের শাসন করে, (মূলত রানি পিঁপড়া) তারা ৯ ঘণ্টা ঘুমানোর মতো বিলাসিতা করে।

পিঁপড়ারা কিন্তু মানুষদের মতোই সামাজিক প্রাণী, যেখানে সবাই পরিশ্রমী এবং প্রতিদিনের কাজ সম্পন্ন করে যা তাদের ঘুমের সময়কে কমিয়ে আনে। মানুষদের মতোই পিঁপড়াদের কম ঘুমের জন্য তাদের আয়ু কমে যায় এবং তারা মাত্র ৩ বছর বেঁচে থাকে। যেখানে নিয়মিত ঘুমানোর জন্য রানি পিঁপড়াদের জীবনকাল দীর্ঘ হয়, তারা প্রায় ৩০ বছরের দীর্ঘ জীবন পায়।

পিঁপড়াদের ঘুমের ধরন মানুষের থেকে অনেক আলাদা। তারা কোনো সময়সূচি ফলো করে না। কর্মী পিঁপড়ারা দিনে প্রায় ২৫০ বার ঘুমিয়ে থাকে, যার কোনোটিই এক মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় না। যেখানে রানি পিঁপড়া দিনে ৯০ বারের বেশি ঘুমিয়ে থাকে, যার কোনোটা ৬ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কর্মী পিঁপড়ারা অনুর্বর হয় এবং তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু রানি পিঁপড়ার সেবা করা। তারা যখন ঘুমিয়ে থাকে না, তখন পাহাড়ায় বা কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিকে পুরুষ পিঁপড়ারা রানি পিঁপড়ার সাথে প্রজননে থাকে, কর্মী পিঁপড়াদের এখানে কোনো কাজ নেই।

পিঁপড়ারা মূলত ফেরোমনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে যা তাদের অ্যান্টেনা ধরতে পারে। এর মাধ্যমে পিঁপড়ারা একাকী বা দলবদ্ধভাবে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

একটি পিঁপড়ার ঢিবিতে কমপক্ষে ৮০% কর্মী পিঁপড়া জেগে থাকে ও সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করে; যেন যখনি প্রয়োজন হয়, তখনি নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারে এবং পিঁপড়াদের বাসস্থানগুলো নিয়মিত নজরদারিতে আছে কি না নিশ্চিত করে। এতে আলো-অন্ধকার কাজের বাধা হয় না। একটি পিঁপড়া যে ঘুমাচ্ছে, তার লক্ষণ হলো এদের দেখতে মৃত মনে হবে এবং অ্যান্টেনাগুলো নড়বে না। আর রানি পিঁপড়াদের ঘুম ও জাগার প্যাটার্ন সুসংগঠিত হওয়ায় তাদের ঘুম দীর্ঘ হয় (মুখ খোলা থাকে, অ্যান্টেনাগুলোও মাঝ পর্যায়ে থাকে) এবং তারা সম্ভবত স্বপ্নও দেখে! (REM ফেইজ রানি পিঁপড়াতে লক্ষণীয়, কারণ মানুষের REM ফেইজে চোখের মুভমেন্টের মতো পিঁপড়াদের অ্যান্টেনা নড়াচড়া করে থাকে!)

বিড়াল কি ভূত দেখতে পায়?

জান্নাতুল ফেরদৌস লিয়া

বিড়াল মাঝেমাঝেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বিড়াল কেন মাঝেমাঝে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে? তারা কি ভূত দেখতে পায়? উত্তর হচ্ছে, না। বিড়ান ভূত দেখতে পায় না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার অনেক অর্থ হতে পারে। চলুন বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

আপনার বিড়ালটি যদি আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, এর মানে হয়তো সে আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এখন তার খাওয়ার সময়? না। বিড়ালের রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাছাড়া তারা খুব অনুসন্ধিৎসু। তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা মানুষ পায় না। যেমন: ঘরের অপর প্রান্তে থাকা ক্ষুদ্র মাকড়সার জাল বোনা থেকে শুরু করে বাইরের একটি ক্ষুদ্র ধুলিকণায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন। এসব আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হলেও বিড়ালের জন্য বিশাল কিছু। তাদের অনুসন্ধিৎসার জন্যও তারা এমনটা করে থাকে। আর এই স্বভাব তাদের টিকে থাকায় সহায়ক।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়াল অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়। বিড়ালের চোখে মানুষের তুলনায় বেশি পরিমাণে আলোক-সংবেদী রড কোষ থাকে। এসব কোষ তাদের মৃদু আলোতেও দেখতে সাহায্য করে।

বিড়াল এমন সব শব্দও শুনতে পায় যা আমরা শুনি না। যখন আপনি দেখছেন, বিড়াল একদৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আসলে সে হয়তো মনোযোগ সহকারে কোনো শব্দ শুনছে যা আমরা শুনি না। বিড়ালের মস্তিষ্ক রহস্যময়, যা বিজ্ঞানীরা এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। কোনো উদ্দীপক বস্তুর গন্ধ বিড়ালের আগ্রহকে ঘণ্টার্পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাখতে সক্ষম। সুতরাং, যখন বিড়ালটি কোনো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন হয়তো সে কোনো রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত থাকে! অথবা, বিড়ালরা যখন বিপদ অনুভব করে, তখনও সেভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিপদ কেটে গেছে মনে হলেই তারা নড়ে।

বিড়ালরা শিকারের দিকে নজর রাখতে সিদ্ধহস্ত। যদিও আপনার বিড়ালটি জঙ্গল থেকে দূরে, তবুও তার মধ্যে পূর্বপুরুষের প্রবণতা রয়েছে। জঙ্গলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার প্রবণতাটুকু তাদের টিকে থাকার জন্য অনেক বেশি দরকার।কাজেই, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।

তবে কখনো কখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা feline hyperesthesia syndrome-এর লক্ষণও হতে পারে। লক্ষণগুলো হচ্ছে–

নিজের লেজে আক্রমণ করা
চোখের পিউপিল বড়ো হওয়া
জোরে আওয়াজ বা চিৎকার করা

স্পর্শের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, ইত্যাদি।
এসব লক্ষণ থাকলে ভেটেনারি চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

জোড়া কলা খেলে যমজ বাচ্চা হয়?

মনিফ শাহ চৌধুরী

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ওপরের কথাটা শুনেছেন। এটা একটা প্রচলিত মিথ। হয়তো ছোটোবেলায় আপনাকে বুঝ দেওওয়ার জন্য নানী অথবা দাদী বলেছিলেন এবং সেটা আপনার মাথায় এখনও আছে।

কলা খাওয়ার সাথে যমজ বাচ্চা হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। শৈশবে পাওয়া চাকচিক্যময় তথ্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে চলুন। এবার জেনে নিই যমজ কীভাবে হয়।

যমজ সাধারণত দুই প্রকার:
১. Identical
২. Non-identical

১. সাধারণত Identical twins একই জাইগোট (zygote) থেকে জন্ম নেয়।

জাইগোট কী?
একটি পুরুষ থেকে একটি শুক্রাণু তার নিউক্লিয়াসে থাকা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা ডিএনএ একটি স্ত্রীর ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে নিষিক্ত করিয়ে দেয়। দুটি কোষ এক হয়ে তৈরি করে একটি একক কোষ, যাকে আমরা জাইগোট বলি। এই জাইগোট বহুবার বিভাজিত হয়ে একটা ক্লাস্টার বা বলের মতো আকার তৈরি করে, যা আসলে অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। একটা নির্দিষ্ট স্টেজে এটাকে "Embryo" বলে। এরপর ফিটাস, সবশেষে বাচ্চার জন্ম।

যাহোক, এই যে জাইগোটের বহুবার বিভাজনের কথা বললাম, এমন হতেই পারে কোনো একটা কোষ মূল বল আকৃতির সাথে না থেকে কোনোভাবে আলাদা হয়ে গেল। এরপর জরায়ুর অন্য স্থানে গিয়ে সেটে বসে গেল। নিজের মতো বিভাজিত হতে লাগল। তাহলে, কয়েক মাস পর আমরা কী পাব?
দুইটা ফিটাস। অর্থাৎ, দুইটা বাচ্চা। যেহেতু এরা একই embryo থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে, তাই এরা আইডেন্টিক্যাল। কারণ এদের মূল জাইগোট একটাই। অর্থাৎ, কোনো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন নেই। এভাবে আমরা পেয়েও গেলাম হুবুহু এক দেখতে এক জোড়া সন্তান।

২. যমজ অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন: সাধারণত একজন নারী প্রতি মাসে মাত্র একটা Ovum বা ডিম্বাণু Ovary বা ডিম্বাশয় থেকে তার ডিম্বনালী (Oviduct) -এ আনতে পারে। কিন্তু, কখনো কখনো কোনো মাসে দুইটা oviduct -এ দুটো আলাদা ovum-এ উপস্থিত থাকতে পারে। যেহেতু এরা আলাদা কোষ তাই এদের নিজেদের মাঝেও জেনেটিক ভ্যারিয়েশন রয়েছে। আবার, এই দুটোর

কাছে দুটো আলাদা স্পার্মও পৌঁছাতে পারে। দুটো স্পার্মের মাঝেও আবার জেনেটিক ভ্যারিয়েশন রয়েছে!

এভাবে দুটো আলাদা Oviduct-এ আলাদাভাবে নিষিক্তকরণে পরবর্তী দুটো জাইগোট তৈরি করবে এবং এরা জরায়ুতে এসে দুটো আলাদা ফিটাসে পরিণত হবে। যেহেতু, তারা আলাদা জাইগোট থেকে এসেছে তাই তাদের মাঝে অনেক পার্থক্য থাকবে। তারা হবে Non-identical twins. আশা করি, এরপর থেকে জোড়া কলা খাওয়া এড়াবেন না। কলা অনেক পুষ্টিকর খাবার। বেচারার নামে এত অপবাদ ছড়ানো ঠিক নয়।

রোমান সংখ্যা পদ্ধতি

রাজু আহমেদ

১.

রোমান সংখ্যা হলো প্রাচীন রোমে উদ্ভূত একটি সংখ্যা পদ্ধতি। মধ্যযুগ পর্যন্ত সারা ইউরোপজুড়ে সংখ্যা লেখার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার হতো। এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগুলি লাতিন বর্ণমালা থেকে অক্ষরের সমন্বয়ে উপস্থাপন করা হয়। বর্তমান ব্যবহৃত হিসেবে রোমান সংখ্যা নিম্নরূপ সাতটি চিহ্ন ব্যবহার করে। প্রতিটির একটি নির্দিষ্ট পূর্ণমান আছে।

মান	চিহ্ন
১	I
৫	V
১০	X
৫০	L
১০০	C
৫০০	D
১০০০	M

রোমান সংখ্যাসমূহের ব্যবহার রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরেও অব্যাহত ছিল। ১৪ শতাব্দীর পর থেকে রোমান সংখ্যার পরিবর্তে আরও বেশি সুবিধাজনক আরবি সংখ্যার ব্যবহার শুরু হয়। তবে রোমান সংখ্যার ব্যবহার ধীরে ধীরে ছিল এবং বিভিন্ন ছোটখাটো ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এখনো চলছে।

১.

রোমান সংখ্যা

মান	চিহ্ন
১	I
২	II
৩	III
৪	IV
৫	V
৬	VI
৭	VII
৮	VIII
৯	IX
১০	X

২০	XX
৩০	XXX
৪০	XL
৫০	L
৬০	LX
৭০	LXX
৮০	LXXX
৯০	XC
১০০	C
২০০	CC
৩০০	CCC
৪০০	CD
৫০০	D
৬০০	DC
৭০০	DCC
৮০০	DCCC
৯০০	CM
১০০০	M

২.

রোমান সংখ্যা গঠনের পর্যালোচনা :

রোমান সংখ্যার মোট চিহ্ন ৭টি যা আলোচনা করা হয়েছে।

ধাপ-১ :

১ = I
২ yu = ১+১ = II
৩ = ১+১+১ = III
৪ = ৫ থেকে ১ কম = IV যত কম তা আগে বসবে
৫ = V
৬ = ৫+১ = VI
৭ = ৫+২ = VII
৮ = ৫+৩ = VIII
৯ = ১০ থেকে ১ কম = IX যত কম তা আগে বসবে
১০ = X

ধাপ-২:

২০ = ১০+১০ = XX
৩০ = ২০+১০ = XXX
৪০ = ৫০ থেকে ১০ কম = XL যত কম তা আগে
৫০ = L
৬০ = ৫০+১০ = LX
৭০ = ৫০+২০ = LXX
৮০ = ৫০+৩০ = LXXX
৯০ = ১০০ থেকে ১০ কম = XC যত কম তা আগে
১০০ = C
২০০ = ১০০+১০০ = CC
৩০০ = ২০০+১০০ = CCC
৪০০ = ৫০০ থেকে ১০০ কম = CD যত কম তা আগে
৫০০ = D
৬০০ = ৫০০+১০০ = DC
৭০০ = ৫০০+২০০ = DCC
৮০০ = ৫০০+৩০০ = DCCC
৯০০ = ১০০০ থেকে ১০০ কম = CM যত কম তা আগে

১০০০ = M

উদাহরণস্বরূপ:

২০২০ = ২০০০+২০ = MM+XX = MMXX

১৯৮২ = ১০০০+৯০০+৮০+২ = MCMLXXXII

১৪৯২ = ১০০০+৪০০+৯০+২ = MCDXCII

৭১১ = ৫০০+২০০+১০+১ = DCCXI

এভাবে I V X L C D M কে ভিত্তি হিসেবে ধরে ভেঙে ভেঙে খুব সহজেই যে-কোনো রোমান সংখ্যা লিখতে পারবেন।

মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস হয়

নাফিউল ফেরদৌস অরণ্য

অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন (Insulin) নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন এমন একটি হরমোন যা দেহে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর উৎপাদন যথাযথ না হলে স্থায়ীভাবে শর্করা বেড়ে যায়, যাকে আমরা বলি ডায়াবেটিস মেলিটাস (সংক্ষেপে ডায়াবেটিস)।

জেনেটিক সমস্যা, নানা সংক্রামক ব্যাধি, অগ্ন্যাশয়ের রোগসহ নানা কারণে এ রোগ হয়।

ডায়াবেটিস হওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া নিষেধ কারণ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি টাইপ-১ হলে ইনসুলিন তার দেহে একেবারেই তৈরি হয় না। টাইপ-২ হলে তা খুবই সামান্য তৈরি হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এমনিতেই ইনসুলিনের সমস্যা, এরপর আবার অতিরিক্ত সুগার বডিতে প্রবেশ করলে শর্করার যে ব্যালেন্সটুকু বজায় ছিল, তাও থাকে না। এতে মৃত্যুঝুঁকি পর্যন্ত থাকে।

যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নয়, তার মিষ্টি খাওয়া বা না খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আক্রান্ত হলে অবশ্যই কৃত্রিম চিনি অথবা খুব সামান্য পরিমাণ চিনি ব্যবহার করতে হবে।

মশার কামড়ে এইডস ছড়ায়!

স্বপ্নীল জয়ধর

এটি তেমন শক্ত গুজব না তবে এই গুজব সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা ৯ম-১০ম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের শেষের অধ্যায় থেকে আমাদের মনে জন্মায়।
সেখানে এক জায়গায় লেখা আছে, "এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জ (ইঞ্জেকশন), ব্লেড বা অন্যান্য জিনিস একজন সুস্থ মানুষ ব্যবহার করলে তার এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বা এইডস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

আবার আরেক জায়গায় লেখা আছে, "এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত যদি কোনোভাবে একজন সুস্থ মানুষের রক্তের সংস্পর্শে আসে তবে তার এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বা এইডস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" এই লাইনটা পড়ে অনেকের মাথায় হয়তো প্রশ্ন জেগেছে। ভাবুন, ভাবুন।
প্রশ্ন না জাগলেও সমস্যা নাই, সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্নটা পড়তে পারেন।

প্রশ্ন অনেকটা এই রকম, কোনো রক্তখেকো কীট যেমন: মশা তো অনেক রক্তবাহিত রোগ ছড়ায়। যদি এই মশা একজন এইচআইভি ভাইরাসে বা এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত খেয়ে নেওয়ার পর অন্য একজন সুস্থ মানুষের রক্ত খায় তবে কি তার এইচআইভি ভাইরাসে বা এইডসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে?
এই প্রশ্নের সোজাসাপটা উত্তর হচ্ছে, না। মশার কামড়ে এইচআইভি বা এইডস ছড়ায় না। খুব জানতে ইচ্ছা করছে না কেন ছড়ায় না? তো চলুন জেনে নেওয়া যাক কেন এই হতভাগা মশা এত রোগ ছড়াতে পারার পরও এইচআইভি ভাইরাস কেন ছড়াতে পারে না।

১) মশার সুচ আর সিরিঞ্জের সুচ একই নয়:
অনেকে মনে করে, মশার সুচ আর সিরিঞ্জের সুচ একই। কিন্তু আসলে তা নয়। মশার সুচ আর সিরিঞ্জের সুচ এক নয়। উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ নিয়ে পরে নিচে আলোচনা করব।

আপাতত যদি আপনার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমি বলব আপনি হাতে একটা মশা নেন আর একটা সিরিঞ্জ নেন। তাহলেই বুঝতে পারবেন আসল কাহিনি। যদি বুঝে থাকেন তাহলে সামনে এগিয়ে যাওয়া যাক।

যখন একজন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি সিরিঞ্জের সুচ ব্যবহার করে তখন সেই সুচে বেশ কিছু পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে। যা পরে একজন সুস্থ ব্যক্তি ব্যবহার করলে সেই রক্ত তার রক্তের সংস্পর্শে আসে ফলে সে এইডসে আক্রান্ত হয়।

আর অন্যদিকে একটি মশা যখন একজন মানুষের কাছ থেকে রক্ত খায়, তখন খুবই অল্প পরিমাণ রক্ত তার সুচে লেগে থাকে। আর এরপর যখন সেই মশা একজন সুস্থ মানুষকে কামড়ায়

তখন সেই রক্ত তার রক্তের সংস্পর্শে আসে ঠিকই কিন্তু তা তাকে এইচআইভিতে আক্রান্ত করার মতো যথেষ্ট নয়।
(এতটুকু পড়ে যদি ধারণা করে নেন যে মূলত এই কারণেই মশা এইচআইভি ভাইরাস বা এইডস ছড়ায় না, তাহলে বলব এখনো আরো কয়েকটা কারণ আছে যার কারণে মশা এইচআইভি ভাইরাস বা এইডস ছড়ায় না।)

২) মশার পেট এইচআইভি ভাইরাসের সংরক্ষণাগার নয়:
আবার যদি ধরে নেওয়া হয় মশায় পর্যাপ্ত রক্ত খেয়েছে আর তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাইরাস রয়েছে, তবুও মশা এইচআইভি ভাইরাস ছড়াতে পারে না। কেননা মানবদেহের বাইরে এইচআইভিকে বাঁচতে হলে অন্তত ৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রা এবং বিশেষ কেমিক্যালসহ উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। কিন্তু মশার পেটের মধ্যে সেই রকম কোনো ব্যবস্থাই থাকে না। তাই মশা এইচআইভি ভাইরাস ছড়াতে পারে না। আবার এইচআইভি ভাইরাস CD4 সেল ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর CD4 সেল একমাত্র মানুষ আর ইঁদুরের দেহেই থাকে। আর মশার এইচআইভি ভাইরাস না ছড়ানোর পিছনে এটাও একটা কারণ।

আবার ধরেও নিলাম মশার মধ্যে CD4 সেল রয়েছে। মশা কিন্তু তারপরও এইচআইভি ভাইরাস ছড়াতে পারবে না। এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো মশার পেটে থাকা অ্যাসিড। এই অ্যাসিড এইচআইভি ভাইরাসকে পেটেই ধ্বংস করে দেয়, তাই কোনো বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। তাই মশার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে না।

এখন আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি এটা সত্যি হয় তাহলে মশা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার মতো ভাইরাসগুলো কীভাবে মশা ছড়াতে পারে?

ওয়েল, এই প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক। আসলে অন্যান্য ভাইরাসগুলো এইচআইভি ভাইরাসের মতো অতটা অ্যাসিডের প্রতি সংবেদী নয়। তাই এই ভাইরাসগুলো অ্যাসিড দ্বারা পেটে ধ্বংস হয় না। ফলে এইসব ভাইরাস অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং মানুষকে অসুস্থ করে দিতে পারে।

আবার, যদি মশা ওপরের শর্তগুলো বিনা বাধায় পালন করে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য উপযুক্ত হয়েও যায়, তারপরও একজন মানুষকে এইচআইভ পজিটিভ করতে অন্তত 10,000,000 মশার কামড় লাগবে। তারপরও তার এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে।

সুতরাং, বলাই যায়, মশার কামড়ে এইচআইভি (H.I.V.) বা এইডস (A.I.D.S.) ছড়ায় না। এটা পুরোই মিথ্যা।

যে মিথ কখনোই হারিয়ে যাবে না

মাহতাব মাহদী

1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135448622705260462818 90...

ওপরে যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও বা ফাই। দিয়ে নির্দেশ করা হয় একে। অনেকটা পাই () এর মতোই একটা অমূলদ সংখ্যা। শুধু এটুকুই? আসলেই কি এটা শুধুমাত্র একটি ধ্রুবক?

গণিতবিদদের মতে, এই ফাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা। অনেকে সুন্দরের সংজ্ঞা দেন গোল্ডেন রেশিও দিয়ে। পৃথিবী কি গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে? গোল্ডেন রেশিও দিয়ে কি সৌন্দর্যের পরিমাপ করা যুক্তিযুক্ত? আমাদের আশেপাশে প্রকৃতিতে কি সবসময় গোল্ডেন রেশিও মেনে চলা হয়? গোল্ডেন রেশিও কি আমাদের ব্রেইন চায়? আমাদের ব্রেইন কি গোল্ডেন রেশিওকেই সবচেয়ে সুন্দর মনে করে? আমাদের দেহ গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে? ফাই কি মহাবিশ্বের সৌন্দর্যের ভাষা?

ওপরের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটাই; না! কী এই গোল্ডেন রেশিও?

একটা স্ট্রেট লাইন নিই। মাঝে একটা ভাগ করে পুরো লাইনটাকে ২ ভাগে ভাগ করে দিই। একটা পার্টের নাম দিই a আর আরেকটা b। তো গোল্ডেন রেশিও বলতে যেটা বোঝায় তা হলো, এই ভাগ করা দুইটা পার্টের অনুপাত আর পুরো রেখার সাথে বড়ো অংশের অনুপাত একই। তা হলো 1.618 বা ফাই, গোল্ডেন রেশিও।
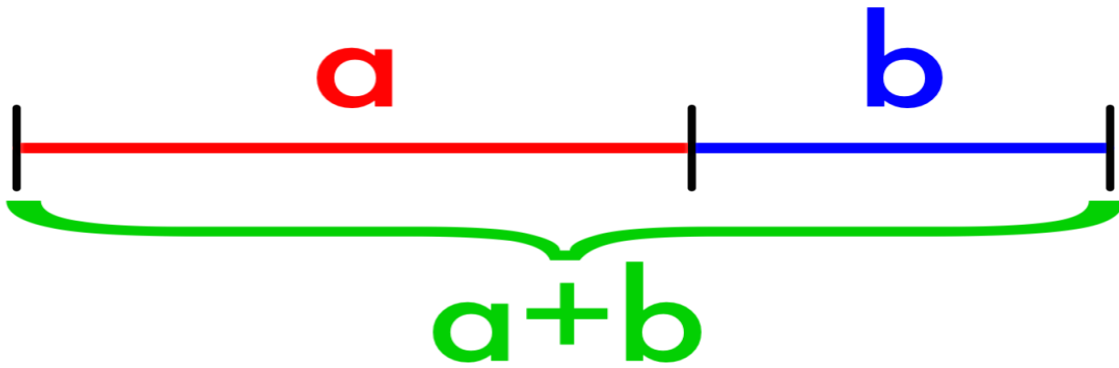
চিত্র ১ : সরলরেখার মাধ্যমে গোল্ডেন রেশিও

অর্থাৎ,

ab=aba=

গোল্ডেন রেশিওর উদ্ভব হলো ফিবোনাচ্চি সিরিজ থেকে। লিওনার্দো পিসানো (Leonardo Pisano) তাঁর বইয়ে প্রথম এই ফিবোনাচ্চি টার্মের উল্লেখ করেন খরগোশের প্রজনন এর একটা গল্পের ব্যাখ্যা দিয়ে। তো ফিবোনাচ্চি নাম্বারের সাথে ফাই এর সম্পর্ক কীভাবে? নিচে ফিবোনাচ্চি সিরিজটা দেখি।

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

এই নাম্বারগুলোর রেশিও করে দেখা যায়...

3 / 2 = 1.5

13 / 8 = 1.666

55 / 34 = 1.61764

233 / 144 = 1.61805

…

317,811/196,418 = 1.61803

যেতে যেতে দেখা যায়, আমরা আসলেই গোল্ডেন রেশিওর কাছে চলে আসি। তো, এটাই মোটামুটি গোল্ডেন রেশিওর ছোটোখাটো পরিচয়, যাকে আমরা একটা আয়তক্ষেত্রের (golden rectangle) মধ্যে প্রকাশ করলে চিত্র ২ -এর মতো স্পাইরাল দেখতে পারব।
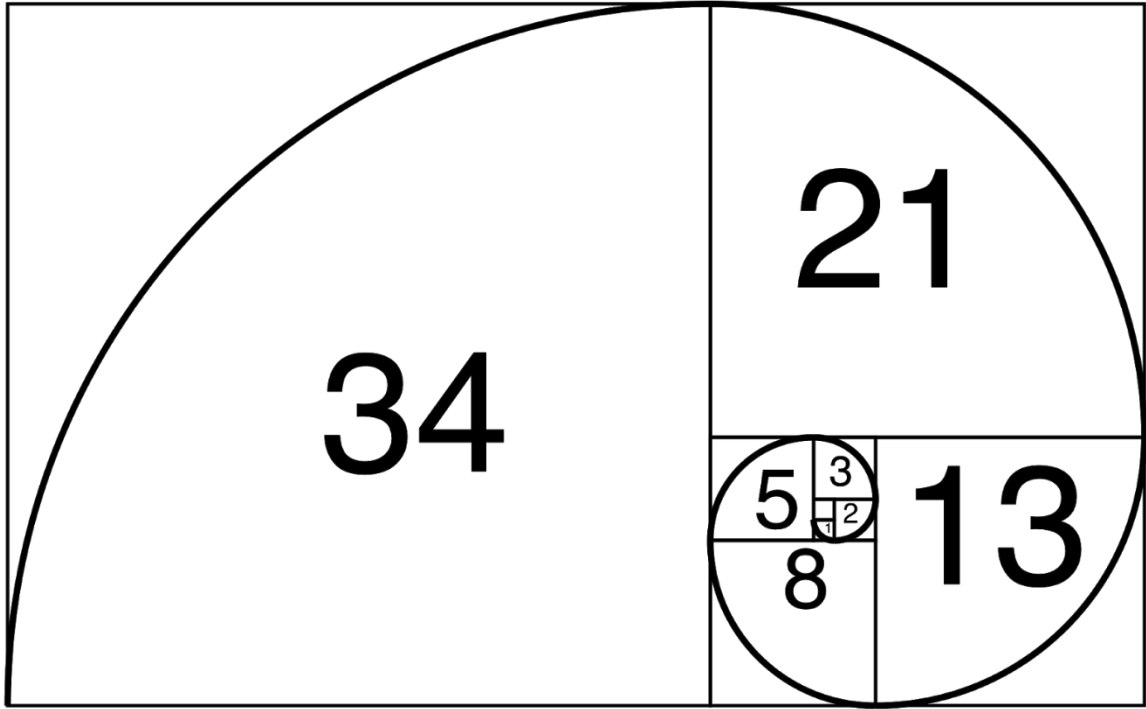
চিত্র ২ : গোল্ডেন স্পাইরাল।

গোল্ডেন রেশিও শুধু একটা ধ্রুবক। তাই কি? মোটেও না! এটা মহাবিশ্বে সব জায়গায় দেখা যায়, প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়, প্রাচীন স্থাপত্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই একটা মানুষের সৌন্দর্য কতটুকু , তা বের করা যায়। যাদের দেহে ফাই বা গোল্ডেন রেশিওর উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাদের বেশি সুন্দর লাগে। আমাদের চোখ ও মস্তিষ্ক ফাইয়ের ভাষা বোঝে। প্রাচীন সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যের মতো লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জগদ্বিখ্যাত আর্ট, মোনালিসাতেও ফাই বা গোল্ডেন রেশিওর প্রমাণ আছে। এত প্রমাণ থাকার পরেও ফাই বা গোল্ডেন রেশিও কীভাবে শুধু একটা ধ্রুবক হতে পারে? এটা নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের সৌন্দর্যের ভাষা!

এইসব কথা বার্তা যুগের পর যুগ ধরে চলেএসেছে, এলোআমরাও গিলতে লাগলাম। পরে Dr. George Markowsky তাঁর গবেষণা করে এসে এই মিথ ডিবাঙ্ক করলেন। এখন সেই ডিবাঙ্কের দিকে আমরা যাব। একটা একটা করে প্রমাণ দেবো।

প্রথমে আসি আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে। আমাদের মস্তিষ্ক কি গোল্ডেন রেশিও এর ভাষা বোঝে? যেসব জিনিস গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে, তাদেরকে পছন্দ করে?

আসুন, ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্টে যাই। চিত্র ৩ -এর ছবিতে কিছু আয়তক্ষেত্রের ছবি দিচ্ছি। দেখেন তো, কোনটা ভালো লাগে?
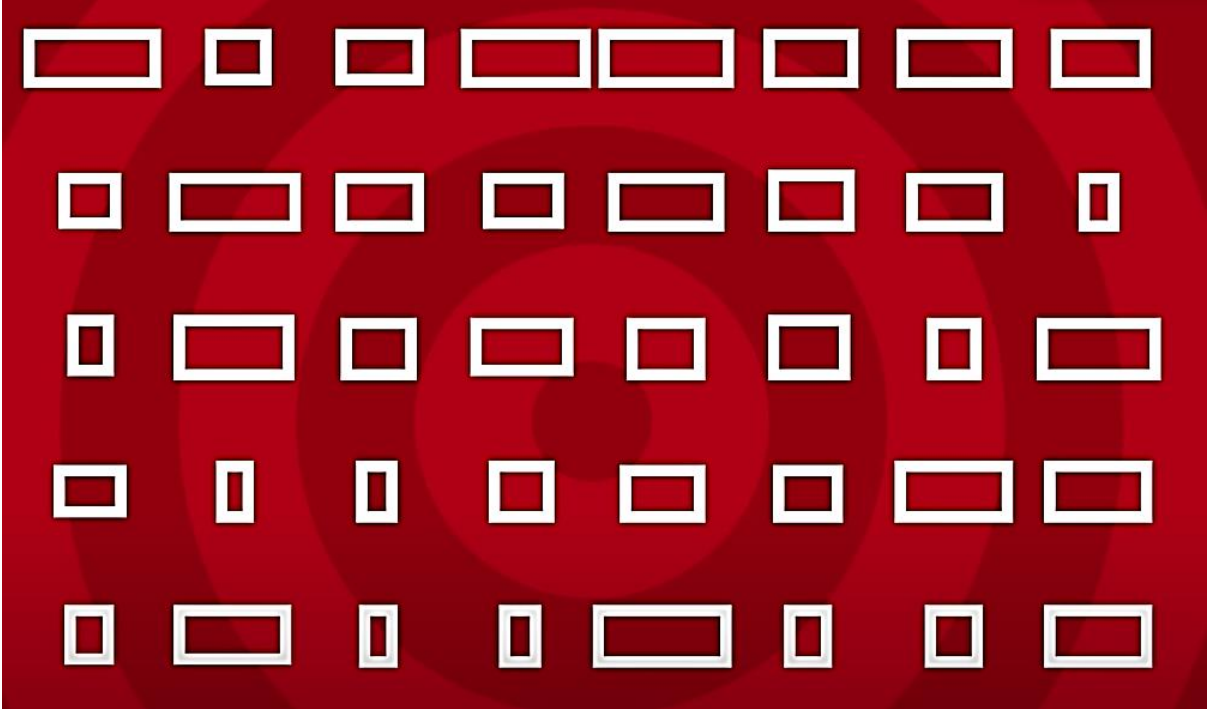
চিত্র ৩ : এক্সপেরিমেন্ট (৯/৩)

কোন আয়তক্ষেত্রটা সবচেয়ে ভালো লাগল? মনে রাখবেন তার কলাম আর সারি নাম্বার। পরে উত্তর বলছি। স্থাপত্যতে কি গোল্ডেন রেশিও মেনে চলা হতো? গোল্ডেন রেশিও মেনে বানানো স্থাপত্য কি বেশি সুন্দর? অনেকে বলে থাকেন, প্রাচীনকালের যেসব বিখ্যাত বিখ্যাত স্থাপনা যেমন–: পিরামিড, পিসার হেলানো টাওয়ার ইত্যাদি। এগুলো কি গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে?

অনেক আগে থেকেই মানুষ গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে জানত। তাদের বইয়ে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনেকে বলেন, আগের স্থাপত্যে গোল্ডেন রেশিওর ব্যবহার প্রবল। এই ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা উদাহরণ হলো The Parthenon (৪, ৫ ও ৬ নাম্বার ছবিতে দেখানো হলো) আর সাথে তাজমহল আর পিরামিডেরও উদাহরণ দিয়ে থাকেন অনেকে।

স্থাপত্যে গোল্ডেন রেশিওর উপস্থিতি জোর করে প্রমাণের চেষ্টা!
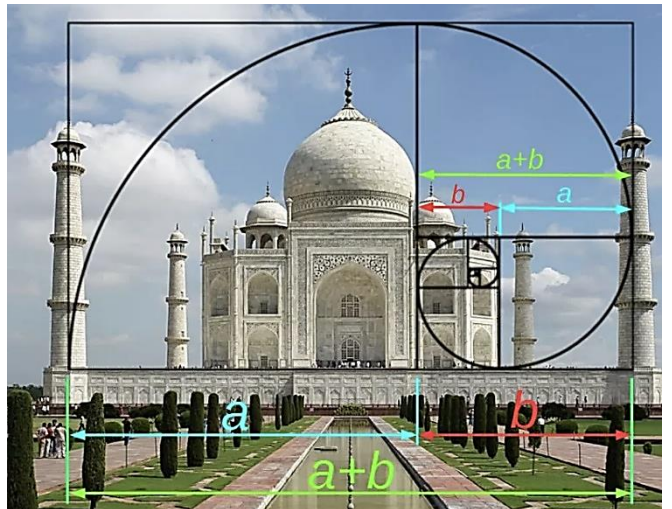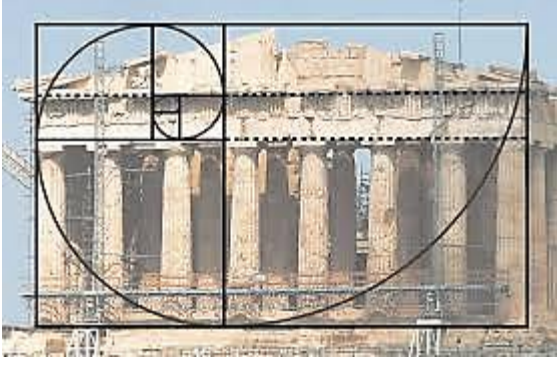
আরেকবার ছবি ৩টার দিকে তাকান। ছবি ৩টায় একটাও কি তাদের গোল্ডেন আয়তক্ষেত্রে সঠিকভাবে পূর্ণ হয়েছে? না, হয়নি। আবার দেখুন, একটা ছবিতেও তাদের আয়তক্ষেত্র তাদের পাদবিন্দু থেকে শুরু না করে ধরা হয়েছে এমন একটা জায়গা থেকে, যেখান থেকে ধরলে পুরো স্ট্রাকচারটা আয়তক্ষেত্রে পূর্ণ হয়। এরপরেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক হয়নি। তো এখানে কি জোর করে মেলানোর চেষ্টা চলছে না?
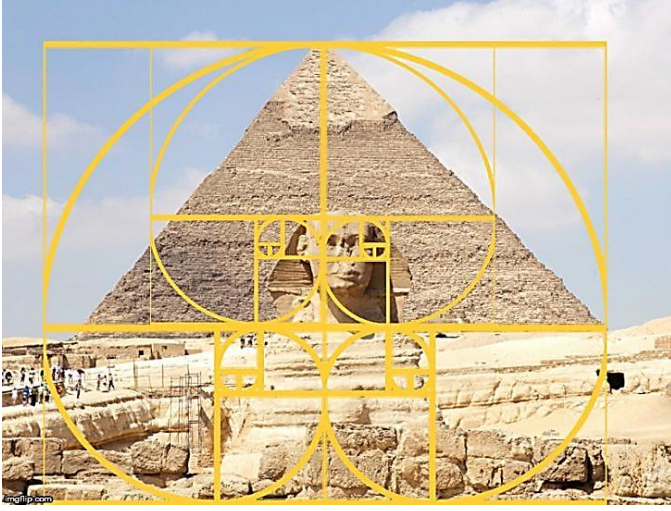
আরেকটা উদাহরণ দিই। যদি গোল্ডেন রেশিও মেনে চললেই আমাদের ব্রেইন তা সুন্দর বলে ধরে নিত, তাহলে কেন মাত্র কয়েকটি স্থাপত্যেই তা জোর করে মেলানো হয়? পিসার হেলানো টাওয়ার, ব্যাবিলনের উদ্যান বা আমাদের জাতীয় সংসদেও গোল্ডেন রেশিও স্পাইরাল মেনে চলা হয়নি। তার মানে কি আমাদের চোখে সেগুলো দেখতে খারাপ লাগে? অবশ্যই না।

এখন আসি সেই আয়তক্ষেত্রের কথায়। মনে আছে আপনাকে কিছু আয়তক্ষেত্র দিয়েছিলাম? সেখান থেকে কোন আয়তক্ষেত্রটা সবচেয়ে সুন্দর লাগে সেটা বের করতে বলেছিলাম? মনে না থাকলে দেখে আসুন।

পরীক্ষাটি আসলে জর্জ ম্যারকোয়াস্কির। তিনি এখানে ৪টা গোল্ডেন আয়তক্ষেত্র রেখে পরীক্ষা করেছিলেন। ৪টা গোল্ডেন আয়তক্ষেত্র ৭ নাম্বার চিত্রে দেখানো হলো :
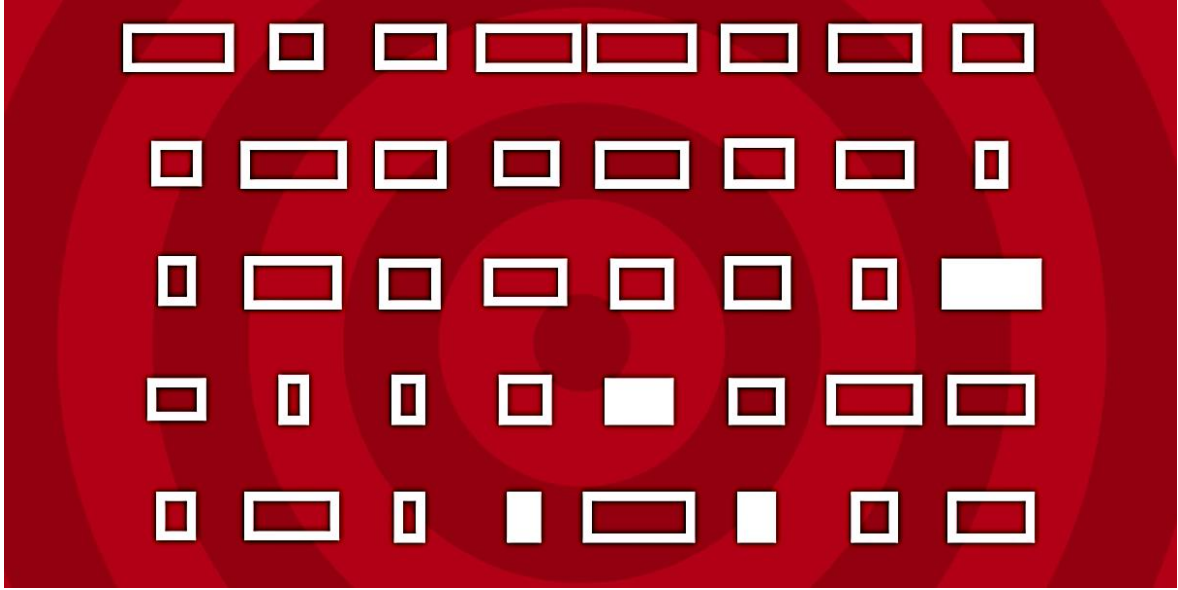
চিত্র : এক্সপেরিমেন্ট (২/৩)

চিত্র: এক্সপেরিমেন্ট (৩/৩)
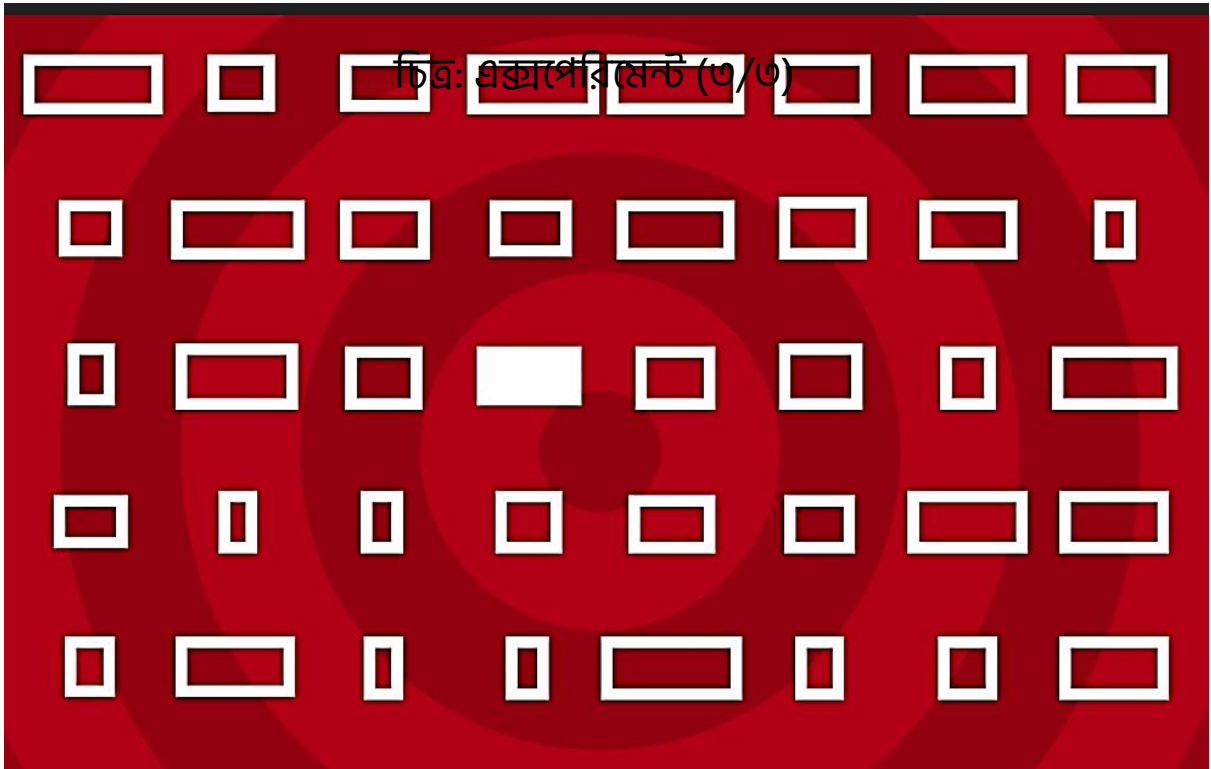
ধরতে পারেননি, তাই তো? অবশ্য আপনার দোষ নয়। কয়েক হাজারের বেশি মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে জর্জ দেখলেন, কেউই সঠিকভাবে এই ৪টি গোল্ডেন রেশিওযুক্ত আয়তক্ষেত্র সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেননি। তার ওপর, বেশিরভাগ মানুষ শনাক্ত করেছেন ৮ নাম্বার চিত্রের আয়তক্ষেত্র।

এই ছোট্ট পরীক্ষাটিই গোল্ডেন রেশিওর মিথকে ডিবাঙ্ক করার জন্য যথেষ্ট।

আমাদের দেহ কি গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে? যাদের চেহারায় গোল্ডেন রেশিও থাকে, তাদের কি দেখতে সুন্দর লাগে?

আমাদের দেহে অনেক অনেক ধরনের রেশিও বা অনুপাত নির্ণয় করা সম্ভব। অনেকগুলো রেশিও ১.৫, ১.৬ এর কাছাকাছি! তবে একেবারেই ১.৬১৮... হওয়া প্রায় অসম্ভব। গণিতবিদরা, যারা গোল্ডেন রেশিওর মতো একটা সংখ্যা দিয়ে সৌন্দর্যের পরিমাপ করেন, তারা বলেন, "যাদের চেহারার বিভিন্ন অনুপাত, যেমন: চেহারার উচ্চতা/চেহারার প্রশস্ততা, নাকের দৈর্ঘ্য/ভ্রুর দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। এসব অনুপাত যদি ১.৬১৮ এর কাছাকাছি যায়, তবে সেই চেহারাকে আমাদের ব্রেইন সুন্দর বলে ধরে নেবে। আসলে এটার কোনো প্রমাণ নেই।"

আকর্ষণীয় চেহারা আমাদের ভিজুয়াল কর্টেক্সে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা, তাতে কখনোই গোল্ডেন রেশিও মেনে চলার কথা বলা হয়নি, বলার কথাও নয়। বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে সৌন্দর্য বা আকর্ষণ গোল্ডেন রেশিওর ওপর নির্ভর করে না।

চিত্র : জর্জ বুশের ওপর জুতা অ্যাটাক।

যদি গোল্ডেন রেশিও মেনে চললেই আমাদের মস্তিষ্ক সুন্দর ধরে নিত, তবে আমাদের চোখে অনেক বীভৎস ছবিও শুধু গোল্ডেন রেশিও মেনে চলার কারণে ভালো লাগত, চোখ আরাম পেত। আসলে তা হয় না। কারণ আমি চাইলেই জোর করে যে-কোনো ছবিতে গোল্ডেন রেশিও খুঁজে বের করতে পারব ।

তো, আপনার মাথার মধ্যে যদি এটা থেকে থাকে যে গোল্ডেন রেশিও সৌন্দর্য পরিমাপ করে, তালে মাথা ফ্রেশ করেন। এই মিথ থেকে নিজেকে বাঁচান!

বি.দ্র. : অনেকে (বিশেষ করে কোরিয়ান) প্লাস্টিক সার্জারি করার সময় চেহারায় গোল্ডেন রেশিও এনে নিজেদের বিশ্বসুন্দরী দাবি করেন। যদিও গত ১০ বছরে বিশ্বসুন্দরী হওয়া সবার চেহারার গড় রেশিও ১.৫৮৮।

প্রকৃতি কি গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে?

আমরা আগেই দেখেছি, গোল্ডেন রেশিও ফিবোনাচ্চি সংখ্যার অনুপাত থেকে আসে। প্রকৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই ফিবোনাচ্চি সংখ্যার ধারা মেনে চলে। দু-একটা উদাহরণ দিই– সূর্যমুখীর বীজে, পাতার স্টেম কোষে, আনারসের খাঁজে ইত্যাদি। তো প্রশ্ন হচ্ছে, এরা কেন ফিবোনাচ্চি সংখ্যা মেনে চলে?

প্রথমত, প্রকৃতি সবসময় গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে না। হ্যাঁ, কিছু জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় তা অবশ্যই সত্য; কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম, সব যথাযথ হয় না, জোর করে মেলানোর চেষ্টা করা হয়। এরপরেও দেখা যায় অনেক জায়গায় আমরা এ রকম স্পাইরালের দেখা পাই। কেন পাই তা বিশাল এক কাহিনি, সেটা অন্য একটা আলোচনা, রেফারেন্সে কিছু লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। ছোট্ট গল্প বলে একটু বুঝিয়ে **দিই।**

আমাদের এই ফিবোনাচ্চি সংখ্যার জন্ম একটা গল্পের মাধ্যমে। খরগোশের গল্প। একটা খামারে আগে কোনো খরগোশ ছিল না। এরপরে সেখানে নতুন জন্ম নেওয়া ১ জোড়া খরগোশ আনা হলো; একটা ছেলে, , আরেকটা মেয়ে। খরগোশরা জন্মের ২ মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১ জোড়া বাচ্চা জন্ম দেয়। যদি ধরি খরগোশগুলো মারা না যায়, তবে খরগোশের সংখ্যা ঐ খামারে কীভাবে বাড়বে?

১ম মাস শেষে জোড়া থাকবে ১টা,
২য় মাস শেষে জোড়া থাকবে ২টা,
৩য় মাস শেষে জোড়া থাকবে ৩টা,
৪র্থ মাস শেষে জোড়া থাকবে ৫টা।
এভাবে চলতেই থাকবে।
খেয়াল করে দেখুন, ফিবোনাচ্চি প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন কি?
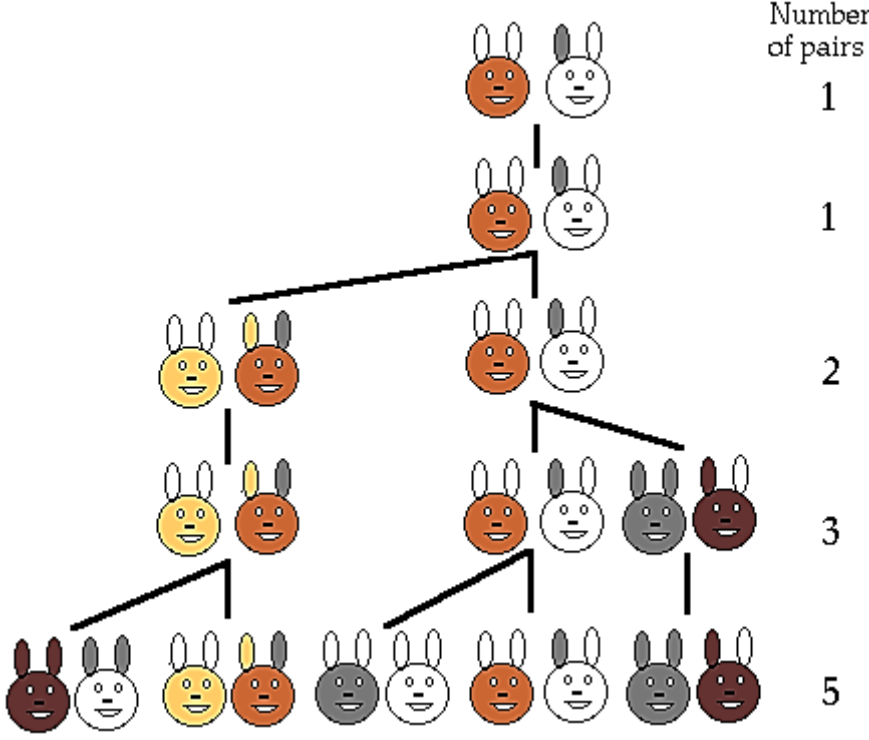
চিত্র: খরগোশের জন্মে ফিবোনাচ্চি প্যাটার্ন।

সবশেষে বলে রাখি, বিবর্তনের জন্য পরিবেশে ফিবোনাচ্চি সংখ্যা খুঁজে পাওয়া কোনো ধরনের রহস্য নয়।

রবিন প্যাটিনসন ও বেলা হাদিদ কি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর মানুষ?

গোল্ডেন রেশিও সৌন্দর্যের মানদণ্ড না। সৌন্দর্যকে শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা উচিত নয়। বর্তমানকালের গণিতবিদরাও এ বিষয়ে একমত যে গোল্ডেন রেশিও সৌন্দর্য পরিমাপের একক নয়। কারো কাছে বেলা হাদিদ আর রবিন প্যাটিনসনকে সুন্দর লাগতেই পারে, তবে তা এইজন্য না যে তাঁদের চেহারায় গোল্ডেন রেশিওর উপস্থিতি পাওয়া যায়। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা আরও বিশাল এবং আমাদের কাউকে পছন্দ হওয়ার কারণ হলো ভিজুয়াল কর্টেক্সের উদ্দীপনা। তাই গোল্ডেন রেশিও তাঁদের চেহারায় আছে সেটা সত্য, তবে তাঁরা যে পৃথিবীর সেরা সুন্দর মানুষ, এটা মানার কোনো কারণ হয় না।

বি.দ্র: দুজনেই প্লাস্টিক সার্জারি করেছেন।

তাহলে এই আর্টিকেল থেকে আমরা যা যা শিখলাম:

১) গোল্ডেন রেশিও সৌন্দর্যের প্রকাশক নয়।
২) প্রকৃতিতে বা মহাবিশ্বে গোল্ডেন রেশিও খুঁজে পাওয়া রহস্যের কিছু নয়, মিথ মাত্র।

৩) বিভিন্ন স্থাপত্যে গোল্ডেন রেশিও ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টা অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

৪) ডিজাইনে গোল্ডেন রেশিওর অবদান আছে, কিন্তু গোল্ডেন রেশিও মেনে তৈরি হলেই যে ডিজাইন সুন্দর, তা ভুল।
৫) আমাদের দেহে অনেক রেশিও খুঁজে বের করা সম্ভব। কোনো রেশিওর মান গোল্ডেন রেশিওর কাছাকাছি হলেই যে তা সুন্দর, এটা ভুয়া।
৬) আমাদের ব্রেইন গোল্ডেন রেশিওকে সুন্দরের ভাষা বলে ধরে নেয় না।

মিথ হওয়ার পরেও অনেকেই জানে না এই মিথের বিষয়ে। এখনো বিশ্বে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা হিসেবে গোল্ডেন রেশিও মেনে চলে অনেকে। ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এটা এখন প্রচুর ফলো করা হয়। আলাদা টপিকই এটা একটা। এখনো প্লাস্টিক সার্জারি করার সময় মানুষ গোল্ডের রেশিও ফলো করেন। এই সব দেখেই হয়তো কেইথ ডেভলিন বলেছিলেন, "এই মিথটা মানবসভ্যতা থেকে কখনোই যাবে না।" হয়তো সত্যই বলেছিলেন।

The missing link was never missing, it had never existed at all

সমুদ্র জিত সাহা

একসময় অনেকে ভাবত, প্রাণীরা বিবর্তিত হয় একটা সোজা 'লাইন' ধরে; কোনো এক প্রজাতি থেকে ধীরে ধীরে 'উন্নততর' প্রজাতিতে পরিণত হয়। আমরা যে একটা ছবি দেখতে পাই–একটা বানর টাইপের প্রাণী ধীরে ধীরে মানুষে পরিণত হচ্ছে, সেটা কোনো সায়েন্টিফিক থিওরি ছিল না, প্রমাণের অভাবে। শুধুমাত্র একটা হাইপোথিসিস বলা যায়। সেই মডেল অনুযায়ী দুটো প্রজাতির মাঝামাঝি কোনো ফসিল না পেলে তার নাম দেওয়া হতো 'মিসিং লিংক'।

সেটা প্রায় শত বছর আগের কথা। এখন যুগ পাল্টেছে, আস্তে আস্তে আরও প্রচুর ফসিল পাওয়ার সাথে সাথে আমরা বুঝেছি বিবর্তন এরকম কিছু না। লাইন ধরে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি আসে না, আসে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দিয়ে।

আমরা বুঝেছি ‘মিসিং লিংক’ টার্মটাই ভুয়া! প্রমাণ? সারা পৃথিবী জুড়ে খুঁজে পাওয়া অসংখ্য ফসিল। তাদের টাইমলাইন ও ভৌগোলিক জায়গা অনুযায়ী সাজানো, ডিএনএ টেস্টসহ আরও অনেক প্রক্রিয়া। বিজ্ঞান এভিডেন্সের ওপর নির্ভরশীল। প্রমাণ না পেলে ঐ অনুকল্পের কোনো দাম নেই। ভুয়া ফসিল? না। বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেন, বরং মিসিং লিঙ্কের ধারণা আসা ফসিলটাই ছিল ফেইক।

দুঃখের বিষয়, এখনো অধিকাংশ মানুষ বিবর্তন বোঝে না, তারা এখনো শত বছর আগের 'মডেল' এর ভুল ধরে বিবর্তনকে ভুল বলে।

গুগলে সার্চ করলেই শুরুতেই উইকিপিডিয়ার লাইন ভেসে ওঠে, "Missing link is an unscientific term for a transitional fossil. It is often used in popular science and in the media for any new transitional form." আর ইংরেজি উইকিপিডিয়া যথেষ্ট রেফারেন্স যুক্ত করা থাকে।

এসব ব্যাখা করে সুন্দর একটা ভিডিয়ো আছে ইউটিউবে। এখানে থেকে দেখে আসতে পারেন। আর ভিডিয়োটি যথেষ্ট রিসোর্স নিয়ে তৈরি করা।

টিকটিকি পানি পান করে না

এ. এস. আলীম মারুফ

"টিকটিকি কখনোই পানি পান করে না"—একটা বহুল পরিচিত গুজব। আসুন, দেখি কেন বলে সেটা।

টিকটিকি হচ্ছে শীতল রক্তবিশিষ্ট সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী।

কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা তাদের গ্রহণ করা খাবার থেকে কীভাবে পানি শুষে নেওয়া যায় সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু টিকটিকি সাধারণত পানি পান তো করেই না বরং এই নিয়মেও পানি নেয় না শরীরের জন্য!

তাহলে তারা কীভাবে পানি নেয়? বেঁচে থাকার জন্য তো পানি অবশ্যই দরকার!

টিকটিকির ত্বক ক্যারোটিনের তৈরি ওভারল্যাপিং স্কেলে ঢাকা থাকে। আর এজন্য তারা পানি শোষণ করে তাদের ত্বকের মাধ্যমে। হ্যাঁ, ঠিক পড়েছেন। আর এভাবে পানি শোষণ করে তা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখে টিকটিকি।

এভাবে পানি নিতে নিতে যখন তাদের পুরো শরীর ভিজে যায়, তখন তারা তাদের মাথা নিচু করে রেখে বাকি শরীর উঁচু করে রাখে যাতে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মুখ দিয়ে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়।

এখন আসেন আমাদের মেইন কথা বলি, টিকটিকি ত্বক দিয়ে পানি শোষণ করে—এটা এত বেশি ছড়িয়ে গিয়েছে যে, টিকটিকি যে মুখ দিয়ে পানি পান করে, এটা অনেকে জানেই না। তাই টিকটিকি কখনোই মুখ দিয়ে পানি পান করে না, এটা সত্য নয়। অনেক ধরনের টিকটিকি আছে যারা মুখ দিয়ে ডোবা, পুকুরের পানি পান করে, বৃষ্টির পানি পান করে।

চাইলে এখানে অথবা এখান থেকে টিকটিকির পানি পান করার ভিডিয়ো দেখে আসতে পারেন।

বৈদ্যুতিক শকে কীভাবে মানুষ মারা যায়?

জাভেদ ইকবাল

শরীরের ভেতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যায়, সেটা শরীরের কিছু ক্ষতি করতে পারে। তাপ বাড়িয়ে আগুনের মতো পুড়িয়ে দিতে পারে, ফুসফুস প্যারালাইজ করে দিয়ে অক্সিজেনের অভাবে মেরে ফেলতে পারে, হৃৎপিণ্ডের ছন্দ ভেঙে দিয়ে হার্ট অ্যাটাক ঘটাতে পারে।

অনেকে ভাবে, যত বেশি ভোল্টেজ, মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। আসলে মানুষ বা অন্য প্রাণী মারা যায় কারেন্টের পরিমাণের জন্য, ভোল্টেজের জন্য না। ৪০-৫০ ভোল্টেই মানুষ মারা যেতে পারে, যদি যথেষ্ট কারেন্ট তার শরীর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তবে ভোল্টেজ বাড়লে সাধারণত কারেন্টও বাড়ে এবং ভোল্টেজ শরীরের রোধ কমিয়ে দিয়ে এই 'যথেষ্ট কারেন্ট' পরিবহনে সাহায্য করতে পারে। তাই ভোল্টেজের একটা পরোক্ষ প্রভাব আছে। চিত্র:১ ছবিতে কত কারেন্টে শরীরে কী হবে, সেটার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। ২য় ছবিতে একই জিনিস আরও বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। এখানে ভোল্টেজের কোনো উল্লেখ নেই, কারণ সেটার সরাসরি কোনো প্রভাব নেই।

প্রথমে কিছু সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা। এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই সহজ রাখার জন্য কিছু বিস্তারিত বর্ণনা বাদ দিয়েছি। এই লেখার জন্য সেগুলি দরকারি না।

১) শক কী? শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য আমাদের যে শারীরিক অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া হয়, সেটার নাম শক।

২) বিদ্যুৎ : কোনো মাধ্যম (তার ইত্যাদি) দিয়ে চার্জের (আধানের) প্রবাহ। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এখানে চার্জ মানেই ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রনের প্রবাহই বিদ্যুৎ।

৩) ভোল্টেজ বা বিভব : একটা মাধ্যমের দুই প্রান্তে চার্জের পরিমাণের পার্থক্য। (এটা অতি সরলীকরণ করা হয়েছে এই লেখার জন্য)। এটার একক ভোল্ট। বাংলাদেশে বাসার তারে ২২০-২৪০ ভোল্ট থাকে।

৪) কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ : চার্জের প্রবাহের হার। প্রতি সেকেন্ডে যত বেশি চার্জ যাবে, কারেন্ট তত বেশি। এটা মাপের এ

বৈদ্যুতিক শক	
কত অ্যামপিয়ার	কী হয়
১ বা বেশি	মারাত্মক রকম পুড়ে যায়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়
০.২	
	হার্ট অ্যাটাক, সাম্ভাব্য মৃত্যু
০.১	
	নিঃশ্বাস নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়
	কষ্ট করে নিঃশ্বাস নেয়া লাগে
	অনেক ব্যথা দেয়ার মত শক
	প্যারালাইসিস--ছাড়তে পারে না
	ব্যথা দেয়ার মত শক
০.০১	
	ভালভাবেই টের পাওয়া যায়
০.০০১	অনুভব করা শুরু হয়

গুলি দিয়ে ভালো চলে না, সেগুলি কুপরিবাহী। আর যেগুলি দিয়ে একদমই চলে না, সেগুলি অপরিবাহী। আমরা ওপরে বলেছি, ইলেকট্রনের প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাহলে এটা থেকে বোঝা যায়, সুপরিবাহীতে ইলেকট্রন সহজে চলে, অপরিবাহীতে চলে না।

৬) কোনো মাধ্যমের দুই প্রান্তে ভোল্টেজের তফাত না থাকলে সেটার ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাবে না। ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্ট বাড়বে, রোধ বাড়লে কারেন্ট কমবে। সুতরাং একটা মাধ্যমে কতটুকু কারেন্ট যাবে, সেটা নির্ভর করে ভোল্টেজ আর রোধের ওপর।

৭) একটা তুলনা দিই। মনে করি, একটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে একটা চার্জ বা ইলেকট্রন। সোমবার সকাল ৬টার সময় সব ইলেকট্রন যার যার বাসায়, স্কুলে একজনও নেই। সুতরাং, চার্জের পার্থক্য আছে দুই প্রান্তে (স্কুল ও বাসা)। স্কুলের সময় হলে সবাই স্কুলের দিকে যাবে (চার্জের প্রবাহ)। প্রতি মিনিটে কতজন গেইট পার হয়ে ঢুকছে, সেটা হচ্ছে কারেন্ট। যত বেশি ছাত্রছাত্রী (ভোল্টেজ), এই গেইট পার হওয়ার হার (কারেন্ট) তত বেশি। আর যদি তুমুল বৃষ্টি থাকে, রাস্তায় জ্যাম থাকে, সেগুলি হচ্ছে রোধ। রোধ যত বেশি, প্রতি মিনিটে কতজন গেইট পার হয়ে ঢুকছে, সেটার হার (কারেন্ট) কমতে থাকবে।

আর মানুষ যত জ্যামে পড়বে, স্কুলে যেতে যত দেরি হবে, মেজাজ/ভয় তত বাড়বে। তড়িৎ প্রবাহের সময়ও রোধ বেশি হলে তাপ বাড়তে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, চার্জের চলাচলের যে শক্তিটা আছে, সেটা বাধাপ্রাপ্ত হলে তাপে পরিণত হয়। ইলেকট্রিক হিটার বা লাইট বাল্বের কাছে হাত নিলেই এই তাপ টের পাওয়া যায়।

সবশেষে, যদি বাসা থেকে স্কুলে যাওয়ার একাধিক পথ থাকে, তাহলে যে রাস্তায় জ্যাম কম, সেই রাস্তা দিয়ে বেশি ছাত্রছাত্রীরা যাবে। ঠিক তেমনই, কারেন্ট চলার যদি একের বেশি পথ থাকে, তাহলে যে পথে রোধ কম সেই পথ দিয়ে বেশি কারেন্ট যাবে।

অন্য যে-কোনো মাধ্যমের মতোই, মানুষের শরীরও একটা মাধ্যম এবং সেটার রোধ আছে। মানুষের শরীর শুকনা থাকলে মানুষের শরীরের গড় রেজিস্ট্যান্স বা রোধ হয় ৫০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ ওহম। ঘেমে গেলে (লবণাক্ত ও ভেজা) রোধ কমে যায়। চামড়ায় কাটা-ছেঁড়া থাকলে সেখানেও রোধ কমে যায়।

আমরা ওপরে দেখেছি, যত বেশি ভোল্টেজ, তত বেশি চার্জ এবং রোধের ভেতর দিয়ে চার্জ গেলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। যত বেশি রোধ, তত বেশি তাপ।

তাহলে মানুষের শরীরে কী হবে? যদি যথেষ্ট ভোল্টেজ থাকে, তাহলে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পুড়ে যাবে। চামড়া পুড়ে গিয়ে ক্ষত তৈরি হবে, সেখানে রোধ কমে যাবে, ফলে কারেন্টের প্রভাব বেড়ে যাবে।

শুনতে অবাক লাগে, কিন্তু আমাদের শরীর বিদ্যুৎ তৈরি করে এবং সেই বিদ্যুৎ আমাদের জন্য খুব জরুরি। আমরা যখন হাত-পা নাড়াতে চাই, আমাদের মস্তিষ্ক হাত-পা কে আমাদের নার্ভ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠিয়ে সেই কাজ করায়। মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনাতেও বৈদ্যুতিক সংকেত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের হৃৎপিণ্ডও সংকুচিত ও প্রসারিত হয় বৈদ্যুতিক সংকেত পেয়ে। সেই সংকেত যদি সময়মতো না পায়, তাহলে হৃৎপিণ্ড পাম্প করবে না, রক্ত চলাচল থেমে যাবে। আবার উলটা-পালটা সংকেত পেলে হৃৎপিণ্ড উলটা-পালটা পাম্প করা শুরু করবে। ফলাফল—হার্ট অ্যাটাক।

আমরা যদি তাই কারেন্ট চলছে এমন কিছুতে হাত দিই তাহলে শিরশির অনুভূতি হতে পারে। এটা হচ্ছে নার্ভে বাইরের অপরিচিত কারেন্ট ঢোকার ফলাফল। নার্ভ সেই বৈদ্যুতিক সংকেত মস্তিষ্কে পাঠায়, মস্তিষ্ক এই অনুভূতি তৈরি করে। যদি কারেন্ট বাড়তে থাকে, একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটা মস্তিষ্ক থেকে আসা সংকেতকে ছাপিয়ে যায় (বাসার পাশে প্রচণ্ড শব্দে মাইক বাজার মতো—পাশের লোকের কোনো কথা আর বোঝা যায় না)। ফলে মস্তিষ্ক যদি নির্দেশ দেয়, "পা, দৌড় দাও", সেই সংকেত পায়ের পেশি পর্যন্ত আর যেতে পারে না। ফলাফল : প্যারালাইসিস। ফলে আটকে থেকেও মারা যেতে পারে মানুষ। তাকে টেনে ছাড়াতে গেলে সেই উদ্ধারকারীর নিজে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশে এরকম পরিস্থিতিতে কাঠের টুকরা দিয়ে পিটিয়ে ছোটাতে দেখেছি।

কারেন্ট আরও বাড়লে এই প্যারালাইসিস ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারে, ফলে প্রথমে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে আসে এবং এক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তারপর হয় সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা। কারেন্টের একটা বিশেষ পরিমাপে সেটা হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেতের সাথে ঝামেলা করা শুরু করে। ফলে হৃৎপিণ্ড উলটা-পালটা বিট করা শুরু করে এবং ফলে মৃত্যু হতে পারে। তার মানে ওই কারেন্টে হাত লাগা মানেই কি হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে? না, সব কারেন্ট হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। তবে যদি কেউ এক হাত দিয়ে তড়িৎপ্রবাহী তার ছোঁয় আর অন্য হাত দিয়ে মাটি ছোঁয়, তাহলে এক হাত থেকে আরেক হাতে কারেন্টের প্রবাহ হবে এবং সেটা খুব সম্ভবত হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়েই যাবে। হাত দিয়ে তার ধরলে এবং পা যদি মাটিতে থাকে, তাহলেও হৃৎপিণ্ড দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে। এছাড়াও, হৃৎপিণ্ডের পেশিরও ক্ষতি হতে পারে। কেউ যদি এক হাত বা এক পা দিয়ে তার ছোঁয় কিন্তু শরীরের বাকি অংশ বাতাস বাদে অন্য কিছুকে স্পর্শ না করে থাকে তাহলে হৃৎপিণ্ড দিয়ে কারেন্ট যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু কারেন্ট যদি সেই পরিমাপের (০.২ অ্যাম্পিয়ারের) ওপরে থাকে, তাহলে হৃৎপিণ্ডের পেশি আড়ষ্ট হয়ে যায়, ফলে উলটা-পালটা বিট করতে পারে না। সাথে করে তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে শরীরে আগুন লাগার মতো পুড়ে যায় এবং

নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে আসতে পারে। তাই ১১,০০০ ভোল্টের লাইনে ছোঁয়া লেগে নিমেষে হাত ছাই হয়ে গিয়েছে কিন্তু বেঁচে ফিরেছে এমন ঘটনা আছে, অথচ মাত্র ২২০ ভোল্টে মারা গিয়েছে, এমন ঘটনাও হয়।
চিত্র:১ ছবিতে দেখানো হয়েছে, ০.১- ০.২ অ্যাম্পিয়ারে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হতে পারে। এছাড়াও কত কারেন্টে শরীরে কী হবে, সেটার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে একই জিনিস আরও বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। সেখানে অনুভূমিক অক্ষে কারেন্টের পরিমাপ আর উল্লম্ব অক্ষে সময় দেখানো হয়েছে। সাথে করে ছবিতে রং দিয়ে বিপদের মাত্রা বোঝানো হয়েছে। প্রথম আর দ্বিতীয় ছবিতে আপাতদৃষ্টিতে একটু তফাত আছে বলে মনে হয়। সেটার কারণ প্রথম ছবিতে সময়কে হিসাবে না নিয়ে অতি সরলীকরণ করা হয়েছে।

ছবির নীল AC-1 অংশে বিদ্যুতের পরিমাণ এক অ্যাম্পিয়ারের ১০ লক্ষ ভাগের মধ্যে ৫০০ ভাগ বা আরও কম (৫০০ μ অ্যাম্পিয়ার)। এখানে বিদ্যুতের প্রবাহ মানুষ টের পাবে না, যত সময় ধরেই চলুক না কেন।
সবুজ AC-2 অংশে টের পাবে, কিন্তু পেশিতে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না প্রথমে। তবে যদি এক অ্যাম্পিয়ারের ১০০০ ভাগের ৫ ভাগ হয় (৫ মিলি অ্যাম্পিয়ার), তাহলে ৫ সেকেন্ডের পরে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সেটা যদি ১০ মিলি অ্যাম্পিয়ার হয়, প্রতিক্রিয়া হবে ২ সেকেন্ডের মধ্যে। ১০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার বা ০.১ অ্যাম্পিয়ার হলে প্রতিক্রিয়া হবে ০.১ সেকেন্ডে।

এই একই ০.১ অ্যাম্পিয়ার, প্রথম ছবির লাল অংশের শুরু, ২য় ছবিতে সময়ের অক্ষে দেখানো হয়েছে ৫০০ মিলি সেকেন্ড বা অর্ধেক সেকেন্ডে লাল অংশে চলে গিয়েছে।

এই লাল অংশ হচ্ছে মারাত্মক ঝুঁকির ইঙ্গিত।
AC-4.1 এ পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড উলটা-পালটা বিট করবে। ২য় ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এই AC-4.1 এলাকা সময়ের সাথে (যত ওপরে উঠছে) তত বামে সরছে (কম কারেন্টেও এটা হবে)। AC-4.2 এলাকাতে ৫০% ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা হবে। আর AC-4.3 তে ৫০% এর বেশি ক্ষেত্রে এই সমস্যা হবে।

দুইটা বিশেষ ঘটনা দিয়ে লেখাটা শেষ করি :
১) একটা বজ্রপাতে ৪০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ ভোল্ট পর্যন্ত থাকতে পারে। আর কারেন্ট থাকতে পারে ৫,০০০ থেকে ২ লাখ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত (আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, সেখানে আরও অনেক বেশি থাকে)। তাহলে যেখানে বাসার ২২০ ভোল্ট, ১৫ অ্যাম্পিয়ারে মানুষ মারা যায়, ১১,০০০ ভোল্টের তারে লেগে হাত ছাই হয়ে যেতে পারে, সেখানে বজ্রপাতের পরেও মানুষ বাঁচে কীভাবে? এটার একটা আভাস ২য় ছবিতে আংশিক দেওয়া আছে। উত্তরটা হচ্ছে সময়—এক সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ সময় এই ভোল্টেজ ও কারেন্ট থাকে। ফলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার বা প্যারালাইসিস হওয়ার সময় পায় না। তবে সময় যত কমই হোক না কেন, এত ভোল্টেজের কারণে তাপমাত্রা একটু বাড়ে। ফলে মানুষ পুড়ে যায়, অনেকে মারাও যায়।

২) পাখি কীভাবে আহত/নিহত না হয়ে বিদ্যুতের তারে বসে? পাখির বেঁচে থাকার কারণ হচ্ছে, পাখির দুই পা একই তারে স্পর্শ করে থাকে। তার

সুপরিবাহী, পাখির শরীর সুপরিবাহী না। কারেন্টের নিয়ম, যেই পথে বাধা বা রোধ কম, সেই পথ দিয়ে যাবে। ফলে সুপরিবাহী তার দিয়েই সব কারেন্ট যায়, পাখির শরীর দিয়ে যায় না, ফলে পাখির কিছু হয় না।

পাখিটার দুই পা যদি দুই ভোল্টেজের দুই তারে থাকত? তাহলে পাখির শরীর দিয়ে এক তার থেকে আরেক তারে বিদ্যুৎ যেত এবং পাখিটা মারা যেত। মাঝে মাঝে শরীরের দুই অংশ দুই তারে লেগে কাক বা অন্য পাখি মারা যায়।

তার মানে মানুষ কি এই কাজ করলে বেঁচে থাকবে? হ্যাঁ। কেউ যদি লাফ দিয়ে দুই হাত দিয়ে একটা ইলেকট্রিকের তার ধরে ঝুলে পড়ে, তার শরীর আর কিছু স্পর্শ না করে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকে, তাহলে সে পাখির মতোই শক খাবে না। এই পরীক্ষা যেন আবার কেউ না করে, কারণ কিছুতে ছোঁয়া লেগে গেলেই শেষ। তবে প্রতিদিন বহু বাসায় এর কাছাকাছি একটা ঘটনা ঘটে—স্পঞ্জের (অপরিবাহী) স্যান্ডেল পরে ইলেকট্রিশিয়ানরা বিদ্যুতের তারে হাত দেয়। শুধু ইলেকট্রিশিয়ানরা না, সাধারণ মানুষও হাত দিয়ে হালকা শক খায়, অথবা কোনো শকই খায় না। কারণ পায়ে অপরিবাহী স্যান্ডেল থাকায় তার শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ চলার কোনো পথ পায় না, ফলে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দিয়েই চলতে থাকে। আবারও বলছি, বাসায় এই পরীক্ষা কেউ করতে যেও না। সব স্যান্ডেল যে অপরিবাহী সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই; সেটা ছাড়াও অন্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

শেষ কথা—বিদ্যুৎ মারাত্মক জিনিস। না জেনে, যথেষ্ট সাবধানতা না নিয়ে এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গেলে সাংঘাতিক আহত হওয়ার বা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

*ভোল্টেজের আসল সংজ্ঞা হচ্ছে একটা চার্জকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে কতটুকু কাজ করা লাগে, তার পরিমাপ। তবে এটা এই লেখা বোঝার জন্য জানার দরকার নেই।

*আমাদের শরীরে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেগুলি সহজ করে বললে ব্যাটারির ভেতরের কেমিক্যালের মতো কাজ করে এবং শরীরের কোষগুলি ব্যাটারির মতোই বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। এটা থেকে শরীরে এইসব রাসায়নিকের সঠিক পরিমাণের গুরুত্বও বোঝা যায়।

*মস্তিষ্ক যেহেতু বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায় এবং মস্তিষ্ক নিজেও কাজ করে বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে, তাই বিদ্যুৎ মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। বড়ো শক খেলে যেমন : বজ্রপাতে মানুষের বিষণ্নতা রোগ হতে পারে। এক সময়ে মানসিক রোগীকে শক দিয়ে চিকিৎসা করা হতো। এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানেন না এটা ঠিক কীভাবে কাজ করে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

*অনেকের বিভিন্ন কারণে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা থাকে। তাদের শরীরে অপারেশন করে পেইস-মেকার বলে একটা যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়, যেটার কাজ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত শক দিয়ে চালিয়ে রাখা।
ইমপ্ল্যান্টেবল ডিফিব্রিলেটর বলে আরেক ধরনের যন্ত্র আছে, যেটা হৃৎপিণ্ডের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং দরকার হলে বিশাল শক দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডকে আবার চালিয়ে দেয়। সিনেমায় মাঝে মাঝে এই ধরনের
জিনিস দেখা যায়, তবে সেটা বাইরে থেকে শক দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে আবার চালু করে।

মানুষ চাঁদে কি আদৌ গিয়েছিল?
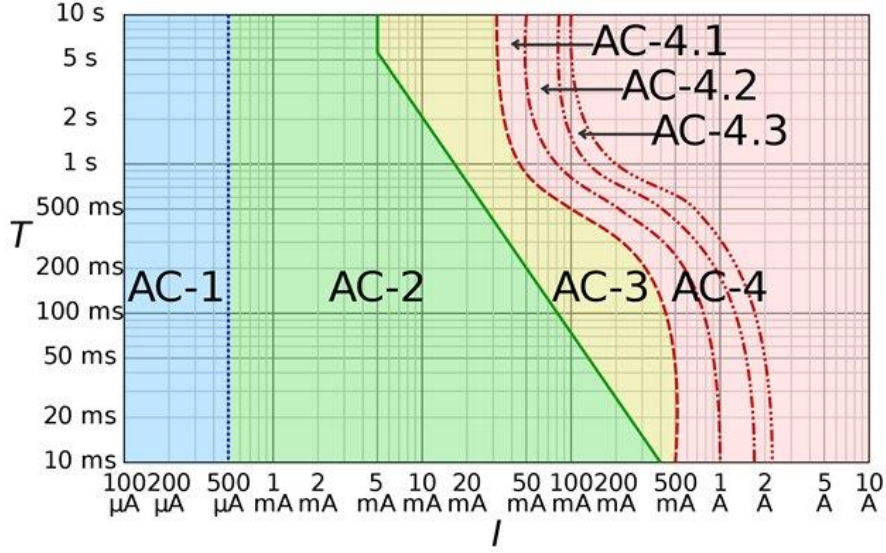
মোঃ শাহিদুল্লাহ্

নিল আর্মস্ট্রং নাকি চাঁদে যাননি?
এরকম হাজারো প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনে। অনেকেই চন্দ্রাভিযানকে গুজবও মনে করে। কি, তাই না?

১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই চাঁদে পা রাখে মানুষ। মহাকাশযাত্রার এক নতুন দিগন্তের শুরু হয় সেদিন থেকেই। প্রথম এই চন্দ্রাভিযানে তিনজন গিয়েছিলেন চাঁদে। তাঁদের মধ্যে দুজন চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। তাঁরা হলেন নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অল্ড্রিন। আর তৃতীয়জন ছিলেন মাইকেল কলিন্স, যিনি চাঁদের কক্ষপথে অবস্থান করছিলেন। চন্দ্রবিজয়ী এই তিন নভোচারী বাংলার বুকেও পা রেখেছিলেন। মানুষ প্রথম চাঁদের বুকে নেমেছিল অ্যাপোলো-১১ মিশনের হাত ধরে। এরপর একে একে আরও পাঁচটি অভিযানে আরও ১০ জন নভোচারী চাঁদের বুকে পা রাখেন।

চাঁদে অভিযান নিয়ে সন্দেহের শেষ নেই। আমাদের অনেকের মনে এখনো এই প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে গিয়েছিলেন? আমাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগার অন্যতম কারণ হলো আমাদের সমাজের কিছু মানুষ যারা চন্দ্রাভিযান কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের মতে এটি হলো অ্যারিজোনার মরুভূমিতে করা শুটিং, যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে মহাকাশ রেইসে (race) হারানোর জন্য করা। তাদের প্রশ্ন আর আমাদের কিছু ভাবনা:

১। চাঁদের মাটিতে তো বাতাস নেই, তাহলে পতাকা কীভাবে উড়ছিল?
আসলে পতাকা উড়ছিল না। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই দেখা যায়, পতাকাটি ওপরের দিক থেকে একটি ফ্রেমের সাথে যুক্ত। আর পাশের দিকেও রয়েছে আরেকটি ফ্রেম। দুই দিকেই ফ্রেম ছিল বলে পতাকার নিচের অংশ একটু কুঁকড়ে ছিল। কুঁকড়ে থাকা পতাকা দেখেই অনেকে ভেবেছে পতাকাটি উড়ছে। কারো মনে যদি তারপরও সন্দেহ থেকে থাকে, তারা চাইলেই চাঁদে তোলা নভোচারীদের ছবিগুলো দেখতে পারেন। ছবিতে নভোচারীদের অবস্থান, অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তন হলেও পতাকার কুঁকড়ানো অংশের কোনো পরিবর্তন নেই।

২। চাঁদের আকাশে তারা নেই কেন?
আসলে ছবি তোলার সময় লেন্সের ফোকাস কমিয়ে-বাড়িয়ে চাঁদের পৃষ্ঠের দৃশ্যগুলো স্পষ্ট করার জন্য হয়তো-বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালো হয়েছে। মহাকাশ স্টেশন থেকে তোলা পৃথিবীর পৃষ্ঠের অনেক ছবিতেও তারা দেখা যাওয়ার কথা থাকলেও তারা দেখা যায় না।

৩। এরপর মানুষ আর কেন চাঁদে যায়নি?
যদি ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের মধ্যে একে একে ১২ জন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, এরপর মানুষ আর কেন চাঁদে যায়নি? মানুষ যদি চন্দ্রাভিযানে সফলই হয়, তাহলে এর ধারাবাহিকতা থাকল না কেন?

আমার কাছে মনে হয় এর সদুত্তর আসলে এটাই যে, মানুষ আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। মানুষ এখন চাঁদে বসবাসের কথা চিন্তা করছে। অ্যাপোলো মিশন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে ২০৩০ এর মধ্যে। নাসা এখন পরিকল্পনা করছে প্রথম কোনো নারীকে চাঁদে পাঠানোর। ২০২৪ সালের এই মিশনের জন্য নাসার Artemis Program কাজ করছে।

৪। অ্যাপোলো-১১ মিশন শেষে নিল আর্মস্ট্রং কেন জনসম্মুখে আসেননি?

কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। নিল আর্মস্ট্রং ঢাকাতেও এসেছিলেন। দিনটি ছিল ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর। চন্দ্রবিজয়ের পর তিন নভোচারী প্রায় ২৩টি দেশে ঘুরেছেন। পরবর্তীতে নিল তাঁর পরিবারের দিকে মনোযোগী হন। তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন, তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁকে অনেক সাক্ষাৎকারেই দেখা গেছে।

৫। নভোচারীদের নেওয়া ছবিগুলোতে একেক বস্তুর ছায়া একেক দিকে কেন?

চাঁদের এবড়ো-থেবড়ো পৃষ্ঠ এর কারণ। উঁচু-নিচু অসমতল স্থানে বস্তুর ছায়া আঁকাবাঁকা হয়। চাঁদের পৃষ্ঠেও তাই হয়েছে। আর চাঁদের পৃষ্ঠ খুব ভালো প্রতিফলন করতে পারে, তাই ছবিগুলোতে বিভিন্ন দিকে আলোর উৎস আছে বলে মনে হচ্ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিফলিত আলোর কারণে বিভিন্ন বস্তুর ছায়া বিভিন্ন দিকে ছিল।

৬। অল্ড্রিনের একটি ছবির হেলমেটে নিলকে দেখা গেলেও তাঁর হাতে কোনো ক্যামেরা ছিল না। তাহলে ছবি কে তুলল?

আসলে ছবিটি অল্ড্রিন নিজেই তুলেছিলেন। তাঁর হাতের দিকে খেয়াল করলেই বিষয়টি বোঝা যায়। অলড্রিনের হেলমেটের গ্লাসে নিলকে আর ল্যান্ডারটিকে দেখা যাচ্ছিল।

৭। অ্যাপোলো-১১ মিশনে তাঁরা কি চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো প্রমাণ রেখে এসেছিলেন?

চাঁদের মাটিতে নভোচারীরা একটি প্রতিফলক রেখে এসেছিলেন, যা দিয়ে পৃথিবী থেকে লেজারের মাধ্যমে চাঁদের দূরত্ব মাপা যেত। তাঁদের পতাকাও রয়েছে—যদিও ধারণা করা হয় যে, চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফেরার সময় ল্যান্ডারের আঘাতে অ্যাপোলো-১১ এর পতাকা চাঁদের মাটিতে নুয়ে পড়ে যায়।

এরকম আরও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন আপনিও হয়তো হয়ে থাকবেন। একটু ভেবে দেখলে এর উত্তরও পেয়ে যাবেন। তাই আর কোনো সন্দেহ নয়, এখন সময় সামনে এগিয়ে যাওয়ার। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখন মঙ্গলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। নিল আর্মস্ট্রংও তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "একদিন আমরা মঙ্গলে পৌঁছে যাব।"

মজার ব্যাপার হলো, অ্যাপোলো-১১ মিশনে ব্যবহার করা কম্পিউটারের মেমোরি ছিল মাত্র ০.০৭৮ মেগাবাইট।
চাঁদের বুকে পা রাখা ১২ জন : নিল আর্মস্ট্রং, বাজ অল্ড্রিন, চার্লস পেটে কনরেড, এলান বেন, এলান শেফার্ড, এডগার মিশেল, ডেভ স্কট, জিম ইরুইন, জন ইয়ং, চার্লি দিউক, ইউজিন জেন কারনান, হ্যারিসন জ্যাক স্মিথ।

ষাঁড় লাল কাপড় দেখলে রেগে যায়

আবু রায়হান

টিভি চ্যানেলে আমরা প্রায়ই দেখি যে, ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই উৎসব হচ্ছে।

ম্যাটাডরের হাতে লাল কাপড় বা টুপি দেখেই ষাঁড় ক্ষিপ্রগতিতে তেড়ে আসে; আমরা অনেকেই এমন জেনে এসেছি। ভাবি, লাল রং ষাঁড়ের রক্তেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এখানেও আমরা নিজেদের মতো করে অর্থ আরোপ করেছি। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, আসলে রং নয়, বস্তুর নড়াচড়া ষাঁড়কে এমন উন্মত্ত করে, ক্ষিপ্রতা দেয়।

২০০৭ সালে ডিসকভারি চ্যানেলের 'মিথবাস্টার্স' অনুষ্ঠান থেকে এমনই এক লড়াইয়ের গবেষণা চালানো হয়।

ষাঁড়ের রেগে ছোটার কারণ কী? যোদ্ধার লাল কাপড় না কি রং?
এই প্রশ্নের উত্তর তিনভাবে নির্ণয়ের
চেষ্টা করা হয়:

১।
প্রথম নিরীক্ষায় বসানো হয় তিনটি পতাকা—লাল, নীল, সাদা। কিন্তু ষাঁড় তিনটি রঙের দিকেই ছুটে যায়।

২।
দ্বিতীয় নিরীক্ষায় রিংয়ে তিনজন নকল প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হয় লাল, নীল ও সাদা পোশাকে। এবারও ষাঁড় তিনটিকেই আক্রমণ করে রং নির্বিশেষে। শুধু তা-ই নয়, লাল আক্রান্ত হয়েছিল সবার শেষে।

৩।
সবশেষে একজন জীবন্ত ব্যক্তিকে লাল জামা পরিয়ে রিংয়ে পাঠানো হয়। তাঁকে বলা হয়, স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে। একই সময়ে দুজন কাউবয়কে, যাদের কারোরই লাল জামা ছিল না, বলা হয় রিং ঘিরে ঘুরতে।

ষাঁড় আপাদমস্তক লাল জামার অনড় লোকটিকে এড়িয়ে চলমান দুই কাউবয়কে আঘাত করতে ছুটে যায়।

ষাঁড় যদি লাল রং না-ই চেনে, তবে কেন তার প্রতিপক্ষ লাল কাপড় হাতে উস্কানি দেয়?
আসলে, ষাঁড়ের লড়াইয়ের শেষ ভাগে এই পর্বটি থাকে। এই পর্বে ষাঁড়ের ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। লাল [কাপড়ের মাধ্যমে] এই নৃশংস দৃশ্য আড়াল করারই চেষ্টা থাকে। আর এটা জাস্ট একটা মিথের ওপর বিশ্বাস রেখে লাল জামা দিয়ে উস্কানি দেওয়া হয়।

গুজব

আসলে আমরা এসব দেখে দেখে এমনভাবেই মস্তিষ্কের ছাঁচ তৈরি করেছি, [যার কারণে] অবচেতন মন বলে, মানুষের মতো আর সবাই সাত রঙেই রামধনু দেখে। আমাদের প্রবণতাই হচ্ছে [সবাইকে] নিজের মতো করে বোঝা। অন্যের চোখে দেখার মতো এমপ্যাথি তথা সহানুভূতি কয়জনের থাকে!

মানবকুলে কেউ কেউ বর্ণচোরা হয়, তবে এ অসুখ দুর্লভ। উলটোটা চলে প্রাণিজগতে।

তাদের জগৎটা আমাদের মতো [নয়]। আমরা পৃথিবীটাকে যতটা রঙিন দেখি, সেটা অতটা রঙিন নয় ওদের কাছে। আবার কোনো পোকা, প্রাণীর কাছে আমাদের চেয়েও বেশি রঙিন। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয় নানা তরঙ্গে। সেই তরঙ্গ আমাদের চোখের ‘কোন’ নামক সেল বা কোষে এসে পড়ে। তারপর তাতে থাকা [রঙের অনুভূতি] দেখারুতি সৃষ্টিকারী রিসেপ্টরগুলো (রড, কোন) আমাদের মস্তিষ্কে রঙের প্রকৃতি এবং রঙের উজ্জ্বলতা অনুভব করায়।

নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোককে আমরা আলাদা আলাদা রং হিসাবে অনুভব করে থাকি।

কুকুর, বিড়ালদের চোখে থাকে [দু]ই ধরনের কোন কোষ। এই দুই ধরনের কোন[] কোষ দিয়ে তারা শুধুই হলুদ আর নীল রং এবং এদের সমন্বয়ে তৈরিকৃত রংগুলো বুঝতে পারে।

সুতরাং[,] টমকোনো কুকুরই এ রংগুলো ছাড়া বাকি রংগুলো বোঝে না। এগুলো ছাড়া সবকিছুই

ব্যাঙাচি

তাদের কাছে ধূসর বর্ণ। [খোলা মাঠে ওদের একটা বল ছুঁড়ে দিলে, ওরা বলের রং দেখে ওটার পেছনে ছোটে না।] [ওরা] আসলে সবুজ ঘাসের মধ্যে গড়িয়ে যাওয়া একটা বল দেখতে [পায়] মাত্র। তাই দেখে [ওরা] [ওটার পেছনে ছোটে]।

ঠিক তেমনটাই ষাঁড়ের ক্ষেত্রেও। লাল রং তার চোখে আমাদের মতো লাল রং হয়ে ধরা দেয়নি। লালের বদলে অন্য কোনো রঙের জিনিস চোখের সামনে নড়াচড়া করলেও সে কিন্তু তাড়া করবে।

কুকুর, বিড়াল, ষাঁড়ের গল্প তো বললাম। এমন কিছু সরীসৃপ, উভচর, মাছ, পাখি আর পতঙ্গ রয়েছে যাদের চোখে আছে চার ধরনের কোন কোষ। আছে ফলে এরা মানুষের চেয়েও বেশি রং দেখতে পায়। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীদের চোখে তিন ধরনের কোন কোষ কোষ তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষের মতো তারাও একাধিক রং দেখতে পায়। কপাল খারাপ বিড়াল, কুকুর, ইঁদুর, খরগোশ, গোরুদের। মাত্র [দু]ই ধরনের কোন নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তাদের কাছে দুনিয়াটা শুধুই হলুদ, নীল আর ধূসর বা সাদা বা আর কিছু যৌগিক রঙের।

ষাঁড় সবুজ, নীল, বেগুনী ও এদের সমন্বয়ে তৈরি আরও কিছু কালার বুঝতে পারে, কিন্তু লাল কালার বুঝতে পারে না।

সোর্স :তথ্যসূত্র:

https://www.livescience.com/amp/3370
0-bulls-charge-red.html
https://www.scienceabc.com/nature/animals/do-bulls-really-hate-red-colour-blind.html

https://www.kalerkantho.com/print-edition/oboshore/2016/03/12/334843

https://www.colour-blindness.com/general/myths/

https://wtamu.edu/~cbaird/sq/mobile/2012/12/12/what-is-it-about-red-that-makes-bulls-so-angry/

https://www.scienceabc.com/nature/animals/do-bulls-really-hate-red-colour-blind.html

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার

প্রজেশ দত্ত
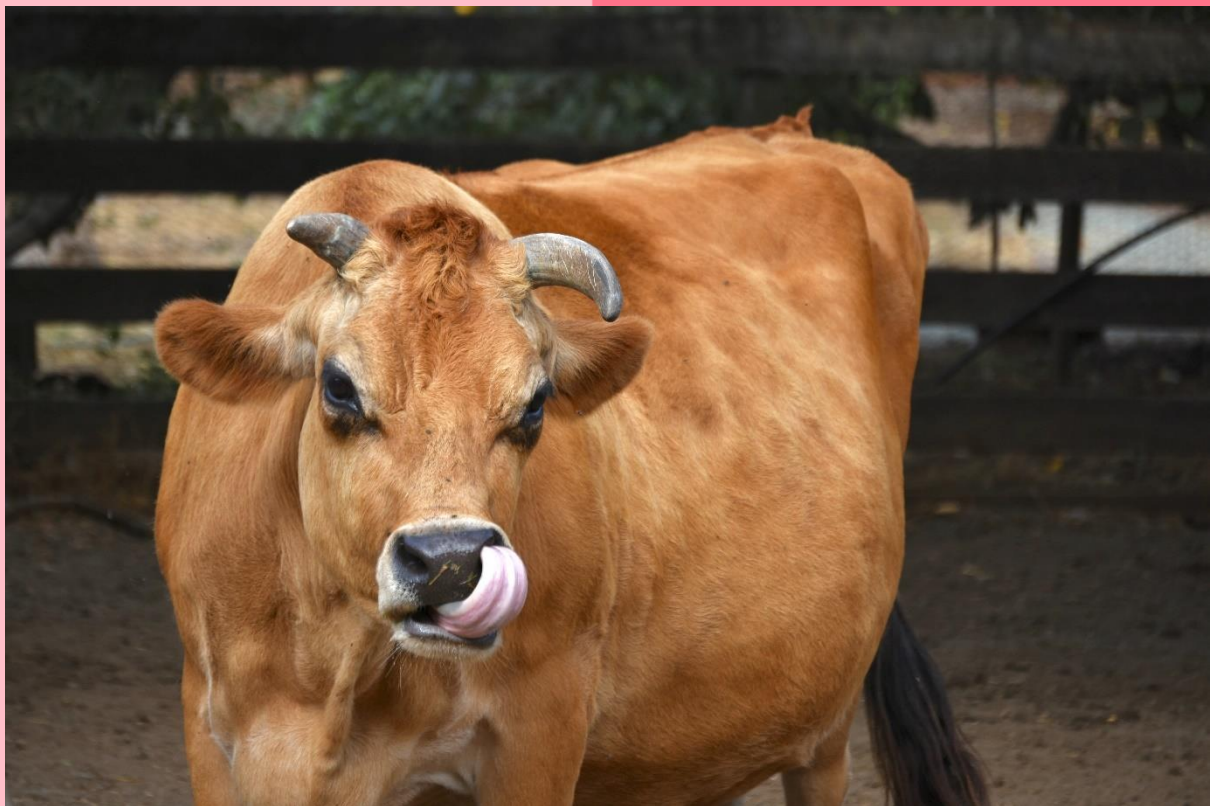
বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার নিয়ে বেশ বড় একটা দ্বিধা রয়েছে আমাদের সবার মধ্যে। আবার আনেকে জানেন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জেমস ওয়াট। তো চলুন দেখা যাক বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পেছনের কাহিনি।

ইয়োলিপাইল: হিরোর ইঞ্জিন

১ম শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন গণিতবিদ ও যন্ত্রপ্রকৌশলী থাকতেন। বড্ড সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন নিজ গ্রামে। মুখে সহজ-সরল বললেও প্রকৌশলী আর গণিতবিদ হওয়ার খাতিরে হয়তো তাঁর মাথায় নানা কিছু ঘুরতেই থাকত। তিনি হলেন আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো। উঁহু, তিনি কমিক্স বা চলচ্চিত্রের হিরো নন, তাঁর নামই হিরো (Heron)। বলা যায় তাঁর হাত দিয়ে প্রথমে বাষ্পচালিত কিছু একটা মানবজীবনে এসেছে। এটা অপূর্ণাঙ্গ। ঠিক আধুনিক ইঞ্জিনের মতো নয়। বাষ্পীয় টারবাইন। এর নাম ইয়োলিপাইল।

স্টিম জ্যাক

তাকি-আদ-দ্বিন সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত এই জ্যাক তৈরি করেন। জ্যাক ব্যবহৃত হয় ভারি কোনো বস্তু তোলার জন্য। রোস্টিং জ্যাকের একটি ছবি দেওয়া

হয়েছে যেখানে মাংস রোস্ট করা হচ্ছে। বাষ্পচালিত এই জ্যাকও কোনো প্রপার ইঞ্জিন নয়।

ইতিহাসের পাতার দুইজনের নাম আর তাঁদের বাষ্প নিয়ে কাজ জানলাম। কোনোটাকেই ইঞ্জিন বলা গেল না।

মাঝে মাঝেই হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মেসেঞ্জারে দেখা যায়, “এই ম্যাসেজটি ২০ জনকে পাঠালে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সুখবর পাবেন।” আচ্ছা কে কে এমন ম্যাসেজ ফরওয়ার্ড করেছেন জীবনে একবার হলেও? সুফল কতটা পেয়েছেন জানতে বড় ইচ্ছা করে।

মাঝে মাঝে এমন দেখা যায়- অমুক ম্যাসেজ ফরওয়ার্ড না করলে আইডি হ্যাক হয়ে যাবে, ডিজেবল হয়ে যাবে। মা গো মা, টু রু সিকিউরিটি সিস্টেম।

এই ধরনের পোষ্ট গুজব ছড়ানোর খুব জনপ্রিয় হাতিয়ার। আর দেশের লোকজন দেখি এগুলো শেয়ারও করে খুব। সচেতন হন, যাচাই করতে শিখুন।

এবার আস্তে আস্তে আমরা পরিপূর্ণ বাষ্পীয় ইঞ্জিন সম্পর্কে জানা শুরু করব।

ফায়ার ইঞ্জিন অ্যাক্ট: টমাস সাভেরির আগমন
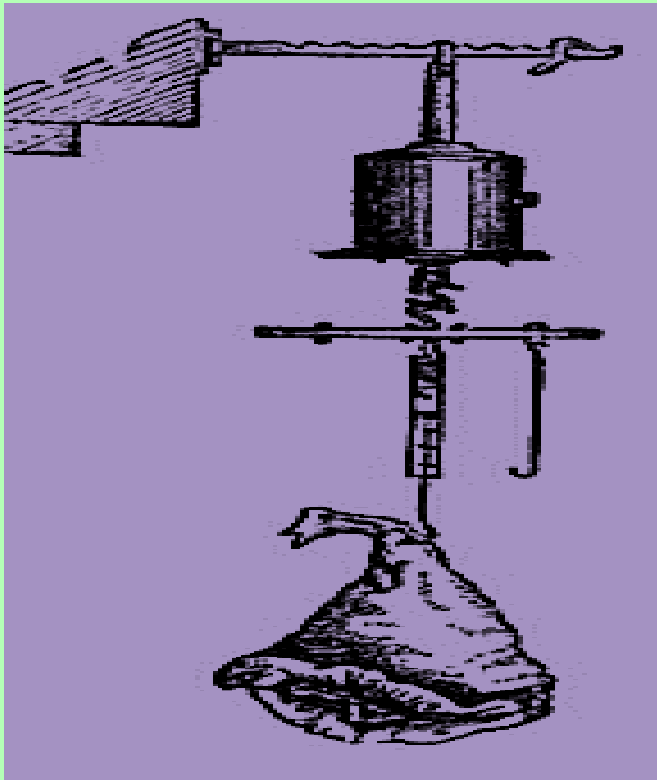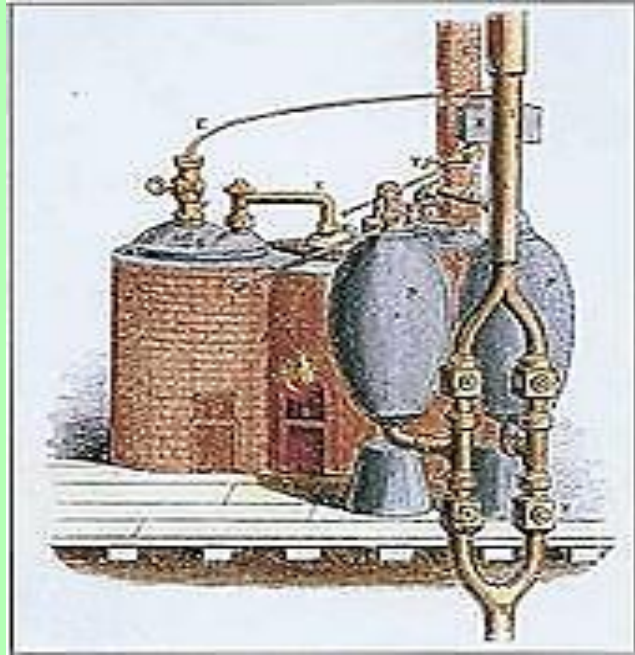
১৬৯৮ সালে টমাস সাভেরি সর্বপ্রথম এই ইঞ্জিন তৈরি করেন। একটি পরিপূর্ণ বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তিনি [রয়েল]সোস্যাইটির সামনে এই যন্ত্র ১৬৯৯ সালে উপস্থাপন করেন। কিন্ত এর কলাকৌশল তখনো অপ্রকাশিত ছিল। পরে ১৭০২ সালে এই ইঞ্জিনের কলাকৌশল লিখে একটা বই প্রকাশ করেন টমাস সাভেরি। The Miner's Friend; or, An Engine to Raise Water by Fire বইয়ে তিনি যন্ত্রটি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

তাঁর ইঞ্জিনের সাহায্যে পানি এক পাত্র থেকে অন্যপাত্রে নিয়ে কাজ করার কৌশল ছিল অনেকটা এরকম:

- বয়লারে গরম বাষ্প তৈরি হয়।
- গরম বাষ্প ইঞ্জিনের ফাঁকা ভেসেলে প্রবেশ করে এবং ভেসেলগুলোকে পূর্ণ করে।
- ভেসেলগুলো পাইপ দ্বারা যুক্ত থাকে। গরম বাষ্প এই পাইপ দিয়ে পানি পূর্ণ ভেসেলে প্রবেশ করে।
- ভেসেলগুলো বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেলে বয়লার এবং ভেসেলের মধ্যকার পাইপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
- পানিপূর্ণ ভেসেলে বাষ্প প্রবেশের ফলে পানির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এসময় উত্তপ্ত বাষ্প পূর্ণ ভেসেলকে বাইরে থেকে ঠান্ডা করে।
- ফলে আংশিক শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় পানিশূন্য ভেসেলে। ফলে এখানে চাপ কমে যায়, ভেসেল এবং বয়লারের মধ্যকার পাইপের মুখ আবার খুলে যায়।
- পানিপূর্ণ ভেসেলে চাপ বাড়ার ফলে সেখান থেকে পানি ঊর্ধ্বমুখী পাইপ দিয়ে পানিশূন্য ভেসেলে আসে।

এই ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা কম ছিল। অধিক পরিমাণে শক্তির অপচয় ঘটত এই ইঞ্জিনে। কিন্ত এটি ছিল প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন। ওই সময়ে এই কৌশল অবলম্বন করে যত ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে সবকিছুর ক্রেডিট দেওয়া হয় টমাস সাভেরিকে। এর জন্য পাশ হয়েছিল 'ফায়ার ইঞ্জিন অ্যাক্ট'।

নিউকোমেন থেকে জেমস ওয়াট

টমাস সাভেরিকে বলা হয় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জনক। আমাদের বইগুলোতে পড়ানো হয় জেমস ওয়াট হলেন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জনক। এরকম গল্পও শুনেছি, "জেমস ওয়াট একদিন চায়ের কেতলিতে চা গরম করছিলেন। কেতলির মুখ দিয়ে বাষ্প বের হচ্ছিল। তা দেখে হঠাৎ তাঁর মাথায় কিছু একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি কেতলির মুখ কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দেন। কিছু সময় পর দেখা যায়, বাষ্পের চাপে কেতলির মুখ হতে কাগজ ছুটে দূরে গিয়ে পড়ছে। এ থেকে তাঁর মাথায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরির আইডিয়া আসে।"

এটা মনে হয় নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার মতোই একটা গল্প। গল্পের সত্যতা কতটা ঠিক তা না জানলেও বাষ্পীয় ইঞ্জিন যে জেমস ওয়াট তৈরি করেননি তা ইতিহাস থেকেই জানা যায়।

টমাস সাভেরির ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য টমাস নিউকোমেন এই যন্ত্রে পিষ্টন যোগ করেন যা পানির ওপর চাপ বাড়িয়ে দিত। পরবর্তীতে জেমস ওয়াট এই ইঞ্জিনে কনডেন্সার যোগ করে এর কার্যক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দেন। এরপর অনেকভাবেই এই ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন হয়েছে। কিন্তু "বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জনক কে?" এ এই প্রশ্ন এলে একটাই নাম শোনা যাবে'—'টমাস সাভেরি'।

সবচেয়ে বড়ো বনভূমি এবং মরুভূমি

আবু রায়হান

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বনভূমি অ্যামাজন নয়!

হ্যাঁ, অ্যামাজন নয়। তাইগা সবচেয়ে বড়ো বনাঞ্চল, যার আয়তন অ্যামাজনের চেয়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ কি.মি. বেশি।

তাইগা: ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ কি.মি. প্রায়

অ্যামাজন: ৫৫ লক্ষ বর্গ কি.মি. (অববাহিকা হিসেবে ৭০ লক্ষ বর্গ কি.মি.)

তাইগা (Taiga):

পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চল। উত্তর আমেরিকায়, তাইগা কানাডার এবং আলাস্কার ভূপৃষ্ঠ জুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অংশেও তাইগা বনাঞ্চল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এটি 'নর্থউড' নামে পরিচিত। তাইগা সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ের উত্তরাংশ, রাশিয়ার সাইবেরিয়া, কাজাখস্তানের উত্তরাংশ, মঙ্গোলিয়ার উত্তরাংশ এবং জাপানের উত্তরাংশ জুড়ে বিস্তৃত। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বৃক্ষ তাইগা বনাঞ্চলে রয়েছে।

তাইগার আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ কি.মি. বা ১৭ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. বা ৬.৬ মিলিয়ন বর্গমাইল, যা পুরো পৃথিবীর স্থলের প্রায় ১১.৫% জায়গা দখল করে। বিশ্বের মোট বনাঞ্চলের
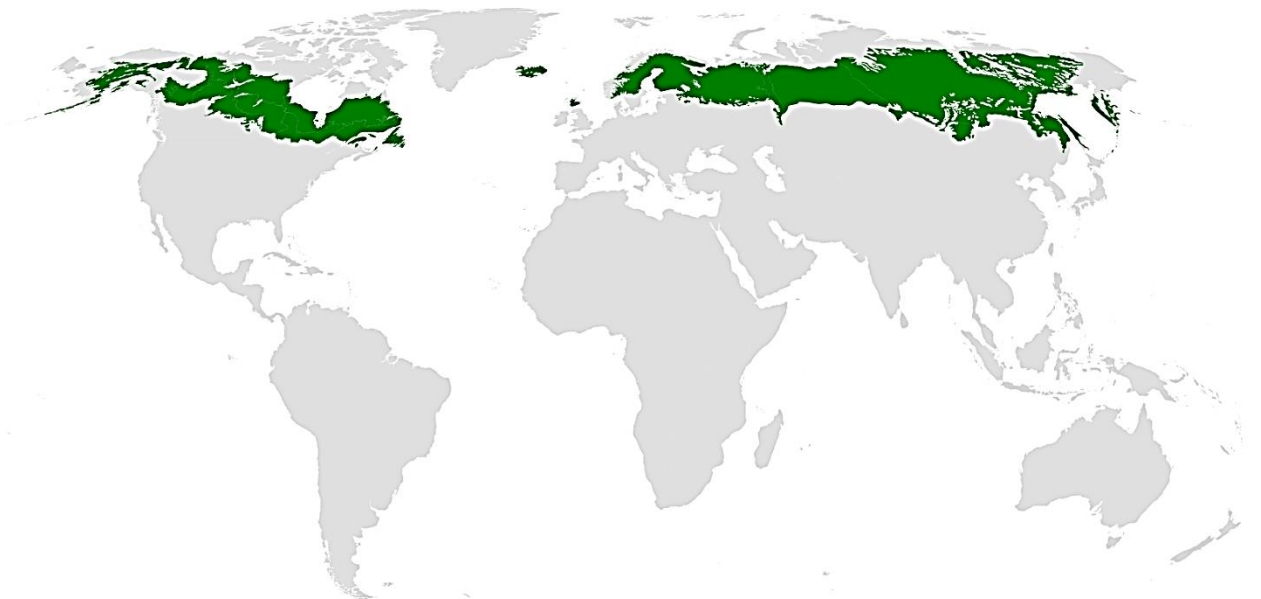
আয়তনের ২৭% দখল করে। এ বনের ৮৩% এলাকা আলাস্কা, কানাডা এবং রাশিয়াতে।

আর অ্যামাজনের আয়তন ৫৫ লক্ষ বর্গ কি.মি.। অববাহিকাসহ আয়তন ৭০ লক্ষ বর্গ কি.মি.।

তাইগার অধিকাংশ অঞ্চল রাশিয়া ও কানাডাতে অবস্থিত। বিশ্বের বনাঞ্চলসমূহের মধ্যে তাইগার তাপমাত্রা সর্বনিম্ন। রাশিয়ার উত্তরাংশে তাইগা বনাঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধারণ করা হয়েছে।

এই বনাঞ্চলের সুমেরুবৃত্তীয় জলবায়ু রয়েছে[;] তবে ঋতুভেদে এখানে তাপমাত্রার পার্থক্য অনেক বেশি। তাইগা শীতপ্রধান অঞ্চল। এখানে গ্রীষ্ম এক থেকে তিন মাসের মতো অবস্থান করে। তবে কখনোই চার মাসের বেশি স্থায়ী হয় না। সাধারণত তাপমাত্রা -৫ °C থেকে ৫°C এর মধ্যে থাকে। তবে সাইবেরিয়ার পূর্বে ও আলাস্কার মধ্যাঞ্চলে তাইগা বনাঞ্চলের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা -৬০°C এ পৌঁছে।

তাইগা বনাঞ্চলে বৃষ্টি ও তুষারপাত তুলনামূলকভাবে কম। এখানে বার্ষিক ২০০-৭৫০ মিলিমিটার বৃষ্টির বর্ষণ হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও এর পরিমাণ ৬০০০ মি.মি.। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি[,] শীতকালে তুষার এবং কুয়াশা পড়ে। নিম্নাঞ্চলের দিকে কুয়াশার পরিমাণ বেশি। গ্রীষ্মের সময়েও তাইগাতে সূর্যরশ্মির তীব্রতা খুব বেশি হয় না। বছরের অধিকাংশ সময় বাষ্পীভবনের পরিমাণ খুব কম হয়ে থাকে, কিন্তু বর্ষণের পরিমাণ বাষ্পীভবনের চেয়ে বেশি হয়। ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মে। আবার তাইগার উত্তরাঞ্চল তুষার মাটিতে নয় মাস পর্যন্ত ঢাকা থাকে।

তাইগা কিন্তু অ্যামাজনের মতো এত সমৃদ্ধ নয় (পরিবেশগত বৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য, বৃক্ষের উপস্থিতির দিক দিয়ে)।

আর তাইগা অ্যামাজনের মতো এত ঘনও নয়, পশুপাখির পরিমাণও সমৃদ্ধ নয়। আর অ্যামাজনের মতো এত অক্সিজেনও সরবরাহ করে না এ বনটা।

অ্যামাজন:

২য় বৃহত্তম বন তবে সবচেয়ে বড়ো রেইন ফরেস্ট বলা যায়।
৭০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অববাহিকা পরিবেষ্টিত এই অ্যামাজনের প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা মূলত আর্দ্র জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত, রেইনফরেস্ট বলা যায় যাকে।

রেইন ফরেস্ট কী?

অতিবৃষ্টি অরণ্য (*ইংরেজি: Rainforest*) হচ্ছে

পৃথিবীর সেইসব বনাঞ্চল যেখানে সারা বছর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিমাণ কমপক্ষে ১৭৫০ মিলিমিটার থেকে ২০০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সারা বছর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় বলে গাছের পাতা সবসময় সবুজ থাকে। মূলত নিরক্ষীয় হতে ক্রান্তীয় অঞ্চলেই এই অরণ্যগুলি দেখা যায়। অতিবৃষ্টি অরণ্যের মধ্যে বৃহত্তমটি হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলের অ্যামাজন নদীর অববাহিকাতে অবস্থিত অ্যামাজন অরণ্য।

অববাহিকা কী?

প্রধান নদী, তার উপনদীসমূহ এবং শাখানদীসমূহ একটি River System গঠন করে যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই সমগ্র অঞ্চলটিকে

একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করলে উক্ত অঞ্চলকে ঐ প্রধান নদীটির নদী অববাহিকা (River Basin) বলে।

সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি নয়!

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি অ্যান্টার্কটিকা।

১.

মরুভূমি মানেই শুধু বালুময় বৃহৎ এলাকা নয়। মরুভূমি শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে খুব শুষ্ক, ঝড়-বৃষ্টিহীন আর চারদিকে ধু-ধু বালিতে ঢাকা একটি বিস্তৃত অঞ্চল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হলো মরুভূমি। ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত চার ধরনের মরুভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

এগুলো হলো: মেরু-অঞ্চলীয় মরুভূমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মরুভূমি, শীতপ্রধান মরুভূমি এবং শীত উপকূলবর্তী মরুভূমি।

২.
মরুভূমির সংজ্ঞায় এর বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সাধারণ অর্থে মরুভূমি বলতে এমন স্থানগুলোর কথা বোঝানো হয়ে থাকে যা অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিপাত যেখানে বিরল একটি ঘটনা এবং গাছপালা যেখানে জন্মে না বললেই চলে। সে হিসেবে বরফময় মেরু অঞ্চলও মরুভূমির কাতারে পড়ে।

মরুভূমিগুলোতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ সেন্টিমিটারেরও কম। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের তিন ভাগের এক ভাগই মরুভূমি।

৩.
পৃথিবীর মোট মরুভূমির মাত্র ২০ শতাংশ বালুময়। মরুভূমির তীব্র গরমে এক-দুই ঘণ্টাও পার করা যে কঠিন একটা কাজ, সে তো সবারই জানা। তবে পৃথিবীতে এমন মরুভূমিও কম নয় যেখানে ঠান্ডায় প্রাণ টিকিয়ে রাখা এক রকমের অসাধ্য কাজ।
বরফে ঢাকা এ ধরনের মরুভূমিগুলোকে শীতল মরুভূমি বলা হয়।
৪.
১ম স্থানে আছে অ্যান্টার্কটিকা। অ্যান্টার্কটিকা হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি এবং একইসাথে সর্ববৃহৎ শীতল মরুভূমি। আর সর্ববৃহৎ উষ্ণ মরুভূমির নাম সাহারা। আয়তনের দিক দিয়ে সাহারা তৃতীয় বৃহত্তম।

দ্বিতীয় স্থানে আছে উত্তর গোলার্ধের আর্কটিক শীতল মরুভূমি।
তৃতীয় স্থানে আছে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত সাহারা মরুভূমি, যার বিস্তৃতি ১২টি দেশে। এটি তৃতীয় বৃহত্তম।
চতুর্থ স্থানে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি।
পঞ্চম স্থানে পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় মরুভূমি।

১.
অ্যান্টার্কটিকা:
আয়তন ১৪,০০০,০০০ (১ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গ কি.মি. বা ৫,৫০০,০০০ (৫৫ লক্ষ বর্গমাইল)

২।
আর্কটিক:
আয়তন ১৩,৯৮৫,০০০ (১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গ কি.মি. বা ৫,৪০০,০০০ (৫৪ লক্ষবর্গমাইল) বিস্তৃতি: Alaska, Canada, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Russia এবং Sweden–এ দেশসমূহে এ মরুভূমি জুড়ে আছে।

৩।
সাহারা মরুভূমি:
আয়তন ৯,০০০,০০০ এর (৯০ লক্ষ বর্গ [কি.মি.]) এর বেশি বা ৩,৩০০,০০০ (৩৩ লক্ষ বর্গমাইল) এর বেশি।
বিস্তৃতি: উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে–Algeria, Chad, Egypt, Eritrea, Libya, Mali,

Mauritania, Morocco, Niger, Sudan এবং Tunisia.

৫।

আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকা:

পৃথিবীর দুই মেরুতে অবস্থিত দুটি অঞ্চল।
আর্কটিক, সুমেরু বা উত্তর মেরুতে, অ্যান্টার্কটিকা, দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুতে অবস্থিত।

আর্কটিক:

আর্কটিক একটি বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল। এই মহাসমুদ্রকে ঘিরে রয়েছে বরফ আচ্ছাদিত এক স্থলভূমি, যেখানে সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো উদ্ভিদ নেই। উত্তর মেরু ও আর্কটিক সার্কেলের ভেতরে এই অঞ্চলটির অবস্থান।

অ্যান্টার্কটিকা:

আর্কটিকের ঠিক বিপরীতে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত অ্যান্টার্কটিকা, যেটি মূলত একটি মহাদেশ, যা পুরোপুরি সমুদ্র দিয়ে পরিবেষ্টিত। আর্কটিক হলো সাদা ভাল্লুকের অভয়ারণ্য।

অ্যান্টার্কটিকার প্রায় ৯৮ শতাংশ এলাকা বরফে আচ্ছাদিত। এসব বরফ আস্তরণের ন্যূনতম গভীরতা জানলে আঁতকে উঠতে হয়, প্রায় এক মাইল পুরু বরফের চাদরে আবৃত একটি মহাদেশ
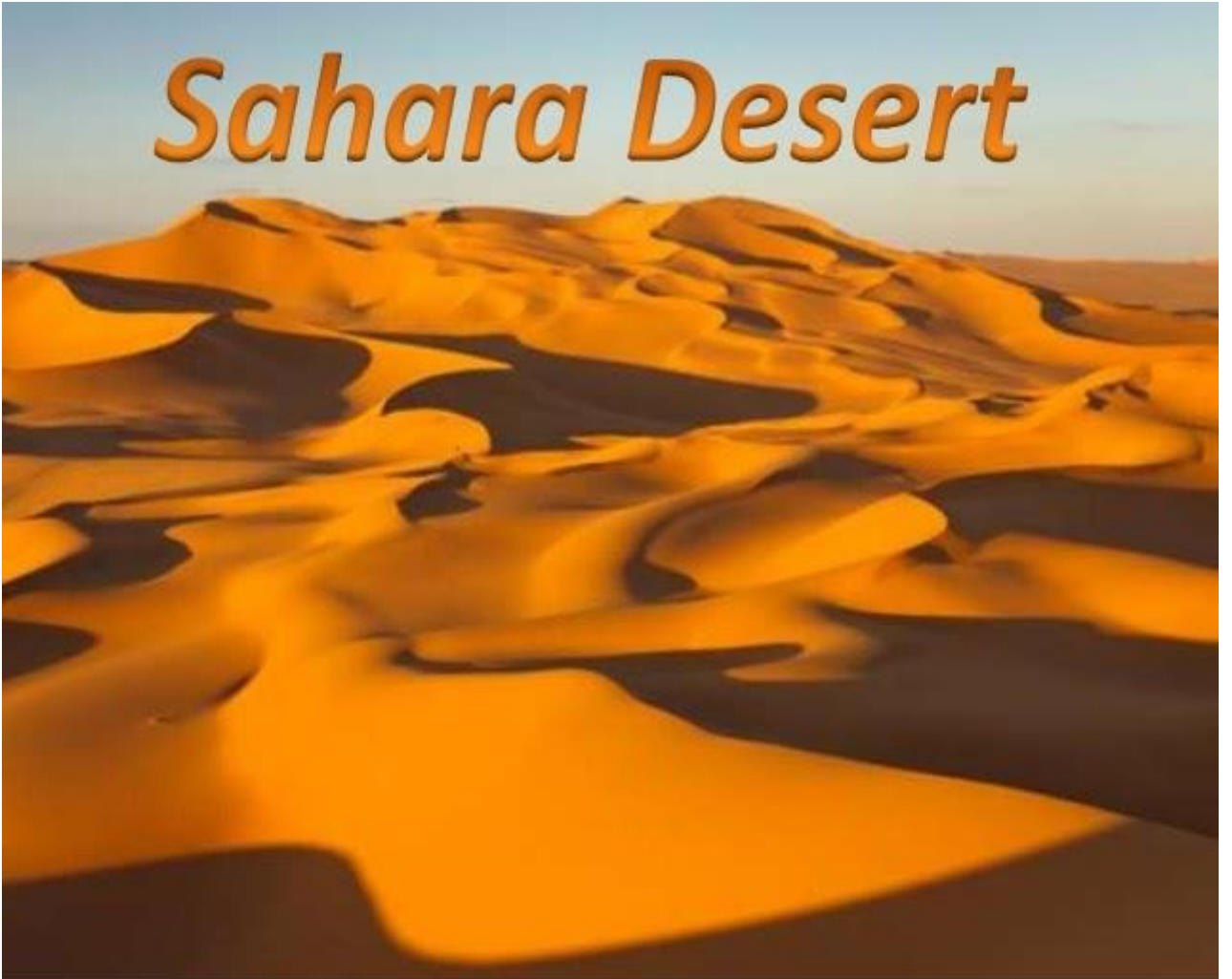
এটি! এটি পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল, শুষ্ক ও বায়ু প্রবাহপূর্ণ মহাদেশ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মেরু অঞ্চলে সারাবছরই তুষারপাত হয়, কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা এতই শুষ্ক যে এটিকে বলা যায় একটি মরুভূমি!

এর উপকূলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ২০০ মিলিমিটার। মূল ভূমিতে তো আরও কম।

তথ্যসূত্র:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Taiga

http://www.wilds.mb.ca/taiga/tbsfaq.htm

https://www.themistakenweb.com/knowledge/10-biggest-forest-in-the-world/

https://greenglobaltravel.com/biggest-forests-in-the-world/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amazon_rainforest

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_deserts_by_area

https://www.livescience.com/23140-sahara-desert.html

বাদুড় নিয়ে ৫টি গুজব

আবু রায়হান

বাদুড় নিয়ে অনেক গুজব প্রচলিত আমাদের মাঝে। চলুন, সেসবের মাঝে ৫টি গুজবের মূল সত্যতা যাচাই করা যাক।

বাদুড় কি চোখে দেখে না?

সবাই বলে, বাদুড় পুরোই দৃষ্টিহীন, শব্দতরঙ্গ অনুসরণ করেই তার সব ওড়াউড়ি। বাদুড়ের শ্রবণশক্তি যে প্রচণ্ড প্রখর তা সত্যি। তবে এ কথাটা একদম ঠিক নয় যে বাদুড় চোখে দেখে না। কিছু বড়ো বাদুড়ের দর্শনক্ষমতা তো আমাদের চেয়ে প্রায় বিশগুণ বেশি এবং রাতে ৯ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতেও পারে।

মেরুর দেশ ও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছাড়া সারা বিশ্বে বাদুড় দেখা যায়। পৃথিবীতে তালিকাভুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী-প্রজাতির ২০ শতাংশই বাদুড়। বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে—৯৬০০ প্রজাতির বাদুড়ের সবাই দেখতে পায়, আর তা ভালোভাবেই; নিশাচর অনেক প্রাণীর মতো দৃষ্টিশক্তিটা তাদের তত প্রখর না অবশ্য। প্রধানত বাদুড়ের দুটি গোষ্ঠী—মেগাকিরোপেটরা ও মাইক্রোকিরোপেটরা। প্রথম গোষ্ঠীর বাদুড়েরা আকারে মাঝারি থেকে বড়ো, দৃষ্টিকেন্দ্র শক্তিশালী, চোখ বড়োসড়ো। শিকারের সময় গন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি—দুটিই এরা ব্যবহার করে। মানে শব্দের প্রতিধ্বনির পাশাপাশি এরা চোখও পথ চলতে ব্যবহার করে।

তাছাড়া ফ্লাইং ফক্স জাতের বাদুড়ের কথাই যদি ধরি, ওরা দিনের আলোয় শুধু ভালো দেখতেই পায় না, পৃথক পৃথক রঙেই সব দেখে। সত্যি বলতে, দিনের আলোই ওদের প্রধান প্রাণশক্তি। চাঁদহীন ঘুটঘুটে রাতে মেগাকিরোপেটরা উড়তেই পারে না।

"বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।"

সুকুমার রায়ের ছড়ার এই চামচিকেই আমাদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বাদুড়-মাইক্রোকিরোপটেরা। এরা মূলত পতঙ্গভোজী, ক্ষুদ্রাকায়। স্তন্যপায়ী চোখের রেটিনায় দুই ধরনের আলোকগ্রাহী কোষ থাকে—দিনে ও রং দেখার জন্য 'কোন' আর নৈশ দর্শনের জন্য 'রড'। এই সেদিনের ধারণা ছিল— নিশাচর মাইক্রো বাদুড়ের শুধুই রড থাকে, কোন নেই। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, নাজুক ছোট্ট চোখ দিয়েই এই বাদুড় দিনে দেখতে পায়। অন্ধকার নামলেই শিকারে বেরোতে হবে। তাই আলো-আঁধারির হিসাবটাও এদের ভালোই জানা। কাছাকাছি ওড়ার বেলায় নিজেদের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনলেই চলে তাদের। এই চলার সময় শব্দ করে ওড়ে বাদুড়, যাতে সামনে কোনো বাধা থাকলে কতখানি দূরত্বে আছে, কোন দিকে যেতে হবে—এসব বোঝা যায়। গাঢ় অন্ধকারে চুলের মতো সরু পদার্থকেও বুঝতে পারে বাদুড়। আবার

তা শনাক্ত করে এড়িয়েও চলতে জানে। দূরের পথ পাড়িতে চোখ অবশ্যই ব্যবহার করা লাগে।

রব মিয়েস মিশিগানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, 'অর্গানাইজেশন ফর ব্যাট কনজারভেশন'-এর নির্বাহী পরিচালক, মিয়েস, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সাময়িকীকে বলেন, "Blind as a bat" বলার দিন শেষ। বড়োসড়ো বাদুড় মানুষের চেয়েও প্রখর দৃষ্টিশক্তি রাখে। সেই সঙ্গে শব্দ ধরে পথচলায়ও বাদুড়ের জুড়ি নেই।

দিনের বেলা কিংবা যখন পর্যাপ্ত আলো থাকে, দেখার কাজে বাদুড় তাদের চোখ যথার্থভাবেই ব্যবহার করতে পারে। তাই বাদুড় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী—কথাটি ডাহা মিথ্যা, এটা এদের প্রতি অপবাদই বলা যায়।

জাতিগতভাবেই অন্ধ—এমন কোনো বাদুড় কোথাও নেই। বাদুড়ের ৯৩০০+ প্রজাতির মধ্যে কোনোটাই অন্ধ নয়। দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য কম-বেশি আছেই, তবে পুরোপুরি অন্ধ নয়।
তাছাড়া পরিবেশ-প্রকৃতির তারতম্যের কারণে কোনো কোনো বাদুড় চোখ বেশি ব্যবহার করে, কেউ করে একটু কম। এদের পৃথিবীতেও রং আছে। এরা সে রঙে সব কিছু রঙিন দেখে। এদের ভুবনও আলোয় ভরা।

বাদুড় কেন রাতে চলাচল করে?
বাদুড় রাতে চলাচল করার সময় মুখ দিয়ে শিস দেয়। শিসের শব্দ সামনের কোনো বস্তুতে লেগে বাদুড়ের কানে ফিরে আসে। সেই শব্দ বিশ্লেষণ করে সেই বস্তুর নিখুঁত অবস্থান জানতে পারে। এই ঘটনাকে ইকোলোকেশন বলে।

বাদুড় তার শব্দ ছুড়ে দেওয়ার কতক্ষণ পর সেটা আবার কানে ফিরে আসে তার ওপর নির্ভর করেই বাদুড় বাধা ও খোলা পথের নিশানা ঠিক করতে পারে। বাদুড়ের মস্তিষ্ক এখানে সূক্ষ্ম কম্পিউটারের মতো কাজ করে। কারণ সামনের বাধার দূরত্ব কত—সেটা বুঝতে অবশ্যই শব্দের বেগ ব্যবহার করতে হয়। বাদুড়ের মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই সেটা জানে। মুহূর্তের মধ্যে শব্দের বেগ, দূরত্ব আর সময়ের মধ্যে সঠিক অঙ্ক কষে সঠিক নিশানা ঠিক করতে পারে সে।

দিনের বেলায় মানুষ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীই জেগে থাকে। তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের দরুন কোটি কোটি শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। দিবাচর প্রাণীদের কোলাহলে বাদুড়ের পথ চলার সেই বিশেষ শব্দ তরঙ্গ হারিয়ে যায়। তাই কোটি কোটি শব্দ তরঙ্গের ভিড়ে নিজের শব্দতরঙ্গটি খুঁজে পেতে সমস্যা হয় বলে বাদুড় দিনের বেলা বাসা ছেড়ে তেমন বের হয় না।

কেন আমরা বাদুড়ের শব্দ শুনতে পাই না?
বাদুড়ের শ্রবণ ক্ষমতা শ্রাব্যতার পাল্লায় এক লক্ষ হার্জ। আর আমাদের শ্রাব্যতার সীমা ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ। মানে এ সীমার হার্জের মধ্যে যে-কোনো শব্দ আমরা শুনতে পাব।

বাদুড় পথ চলার জন্য এক ধরনের শব্দতরঙ্গ বাতাসে ছুড়ে মারে যা আমরা শুনতে পাই না। রাতে পেয়ারা বা লিচু গাছে আক্রমণ করলে হয়তো বাদুড়ের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়। কিন্তু সেটা ওদের পথ চলার শব্দ নয়, ওটা ওদের সাধারণ ডাক। পথ চলা ও খাদ্য খোঁজার জন্য বাদুড় ইনফ্রাসনিক কিংবা আল্ট্রাসনিক শব্দ ব্যবহার

করে। এসব শব্দ আমাদের কান ধরতে পারে না। তাই সেসব শব্দ মানুষের শুনতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ ইনফ্রাসনিক শব্দের হার্জ ২০ এর নিচে যা আমাদের শ্রাব্যতার সীমার বাইরে।

কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য বাদুড়ের এই শব্দ এতই তীক্ষ্ম যে তা আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করলে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু বাদুড়ের শব্দ ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকে বলেই আমরা সে শব্দ শুনতে পাই না।

বাদুড় মূলত ফলভোজী। পেয়ারা, লিচু, জামরুল ইত্যাদি ফলের ঠিকানা খুঁজে বের করতে তারা শব্দতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাকের গন্ধ শক্তির ওপরও নির্ভর করে।

উলটা হয়ে ঝুলে থাকেলে কেন?

বাদুড় কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব; পাখি কিংবা পোকা নয়। তাই তাদের পেশি, হাড়, টেন্ডন—সামগ্রিক স্ট্রাকচারই পাখি বা পোকা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

বাদুড়ের উড্ডয়ন করাটা পাখির মতো এত সহজসাধ্য নয়। পাখিরা মাটিতে বসে থাকলে স্থিরাবস্থা থেকেই পেছনের পায়ে বল প্রয়োগ করে বাতাসে উড্ডয়ন করতে পারে এবং বায়ুথলি ও শক্তিশালী উড়নক্ষম পাখা দিয়ে সহজেই উড়তে পারে। কিন্তু বাদুড়ের ক্ষেত্রে তা একটু কষ্টসাধ্য। পারে না এমন নয়, তবে তা সাধারণ পাখির তুলনায় বাদুড়ের জন্য তুলনামূলক কঠিন।
কারণ তাদের পেছনের পা তুলনামূলকভাবে বেশ ক্ষুদ্র। এ কারণে তারা যে-কোনো সময় চাইলেই উড্ডয়ন করার মতো স্পিড তৈরি করতে পারে না। ফলে তারা ডালে উলটা হয়ে ঝুলে থাকে। কারণ কখন কোনো প্রাণী আক্রমণ করে বসে, কখন না জানি আত্মরক্ষা করতে হয়। এখন যদি ডালে স্বাভাবিক পাখির মতো শুয়ে থাকে বা বসে থাকে তবে তারা উড়াল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শারীরিক সক্ষমতা তৈরির পূর্বেই আরেক শত্রু প্রাণী বা শিকারির আক্রমণের শিকার হতে পারে। মাটি থেকে আকাশে উড্ডয়ন করা আর ডাল থেকে উড্ডয়নে প্রায় একই শক্তি ও সক্ষমতার দরকার পড়ে, যা তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নেই।
তাই উলটো হয়ে ঝুলে থাকাটাই তাদের গতিময় আত্মরক্ষার জন্যে পারফেক্ট পজিশন। তাই বাদুড়রা তাদের পায়ের শক্ত নখ দিয়ে ডালকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে আর প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হলেই নখ ছেড়ে দিয়ে উড়াল দিতে পারে। এতে পেছনের পায়ের ওপর উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি তৈরি করতে হয় না। জাস্ট নখের আঁচড় খুলে উড়াল দিলেই হলো। এভাবে উলটা হয়ে ঝুলে থাকাটা তাদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থারই একটা অংশ। এর ফলে তারা যে-কোনো সময় উড়াল দিতে প্রস্তুত থাকে।

বাদুড় কি মুখ দিয়ে খায় আবার মুখ দিয়েই মলত্যাগ করে?

বাদুড়ের পরিপাকতন্ত্রের শুরু হয় মুখ থেকে আর শেষ হয় পায়ু ছিদ্রে। এরা মানুষের মতোই মুখ দিয়ে খায় আর পায়ুপথে মলত্যাগ করে। অনেকে ধারণা করে বাদুড় উলটা হয়ে ঝুলে মলত্যাগ করে কীভাবে? তাই মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে??

আমরা মলত্যাগ করার জন্য যেমন ল্যাট্রিনে যাই, তেমনই বাদুড় মলত্যাগ করার জন্য উড়ে বাইরে যায়। তখন তার মুখ ওপরের দিকে থাকে এবং মলদ্বার থাকে নিচের দিকে।

তাছাড়া উলটা হয়ে ঝুলে থাকলেও মলত্যাগ করতে পারে। আমরা বাদুড়কে উলটা হয়ে ঝুলে থাকতে দেখি। মলত্যাগের বেগ পেলে বাদুড় সেক্ষেত্রে তার উলটা হওয়ার পজিশন থেকে কিছুটা স্থান পরিবর্তন করে নিচে ঝুলে থাকা বডিকে ওপর দিকে ঘোোরায়।
মনে রাখবেন, বাদুড় যখন ঝুলে থাকে তখন দুটি পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে এবং হাত সহ শরীরের বাকি অংশ উলটা হয়ে ডালে ঝুলে থাকে।
মলত্যাগ করতে চাইলে বাদুড় তার দেহের উলটা পজিশনটা পরিবর্তন করে ফেলে এবং নিচে ঝুলে থাকা হাত দিয়ে ওপরের ডালকে আঁকড়ে ধরে এবং মুখ ওপরের দিকে এনে, মলদ্বার নিচের দিকে তাক করে মলত্যাগ করে।

তার মানে, তখন বাদুড় পুরোপুরি উলটে ঝুলে থাকে না। কত ভদ্র, তাই না? তারপরেও তাদের নামে কত দুর্নাম!

তাহলে এ মিথ কীভাবে বিস্তার পেল?
আসলে বাদুড়দের আমাদের মতো ফাইবার হজম করার তেমন ক্ষমতা নেই। আমরা যেমন কোনো ফলের সবটাই খেতে পারি, বাদুড় তেমনটা পারে না। বাদুড় শুধু রসটাই খাবে, বাকিটুকু ছুড়ে ফেলে দিবে। এ কারণে কিন্তু খেজুর রসেও তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। বাদুড়ের হজমের সময় খুব দ্রুত, প্রায় বিশ মিনিটের মতো। ফলে এরা দ্রুত যতটুকু সম্ভব খাবার খায় এবং বাকিগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়। আর মুখ দিয়ে ছুড়ে ফেলাটাই আমরা মল হিসেবে ভেবে থাকি। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো বাদুড়েরও মলদ্বার আছে যা দিয়ে বাদুড় মলত্যাগ করে। শুধু শুধু বেচারাটার নামে আমরা এ অপবাদ রটাচ্ছি আমাদের নিজেদের অজ্ঞতার কারণে।

বোনাস:

বাদুড় অপরিচ্ছন্ন:
বাদুড় মোটেই কিন্তু এত অপরিচ্ছন্ন নয়। বাদুড়ও বিড়ালের মতো নিজের শরীর নিজে লেহন করে পরিষ্কার করে থাকে।
প্রায় ৩০০ প্রজাতির ফল পরাগায়নের জন্য বাদুড়ের ওপর নির্ভরশীল। বাদুড় প্রচুর খেতে জানে এবং প্রাকৃতিক কৃষকের মতো বনবাদারে বীজ ছিটিয়ে, পরাগসংযোগ করে পরাগায়নে সাহায্য করে।
একটি বড়ো বাদুড় এক রাতে প্রায় ষাট হাজার বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে।
তাছাড়া এরা মশা, মথ, পোকামাকড় খেয়ে পোকামাকড়ের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখে।

বাদুড় মানেই ভ্যাম্পায়ার:
Blood-sucking বা Vampire Bat কেবল মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে দেখা যায়। এগুলো খুবই ছোটো। ৫০ গ্রামের চেয়েও কম ওজন। এদের প্রধান শিকার হলো গৃহপালিত পশুপাখি।

সূত্র:
১।
https://www.mentalfloss.com/article/574568/why-do-bats-hang-upside-down

২।

https://www.wonderopolis.org/wonder/why-do-bats-sleep-upside-down-

http://ipfactly.com/top-10-facts-about-bats/

https://batrescue.org.au/new/about-bats-2/myths-and-facts.html

এক আলোকবর্ষ

জাভেদ ইকবাল

এক আলোকবর্ষ মানে কত বছর?
উত্তর: "ঠিক এক বছর।"

আমাকে পাগল ভাবার আগে সম্পূর্ণ লেখাটা পড়ার অনুরোধ করব। অনেকের মধ্যে এই এক আলোকবর্ষ নিয়ে বেশ বিহ্বলতা দেখা যায়।

আলোকবর্ষ দূরত্বের পরিমাপ, সময়ের নয়। তাহলে কেন আমি ওই উত্তরটা দিলাম?

প্রথমে একটা প্রচলিত গল্প বলা যাক।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নে এই সমস্যাটি এসেছিল। একটি ব্যারোমিটারের সাহায্যে কীভাবে একটি সুউচ্চ ভবনের উচ্চতা পরিমাপ করবে? দেখতে একদমই নিখাদ ও সাদামাটা মনে হলেও প্রশ্নটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে ছিল। প্রশ্নকর্তার প্রত্যাশা ছিল অনেকটা এমন— ছাত্ররা প্রথমে ভবনের সবচেয়ে উঁচুতে ব্যারোমিটারের চাপ নির্ণয় করবে এবং পরে ভবনের সবচেয়ে নিচুতে (ভূমি) ব্যারোমিটারের চাপ নির্ণয় করবে। ওপরের চাপ এবং নিচের চাপের পার্থক্য থেকে হিসাব নিকাশ করে ভবনের উচ্চতা বের করা যাবে।

কিন্তু এক ছাত্র এই পদ্ধতির ধারে কাছেও না গিয়ে অনেকটা রসিকতা করেই লিখল: প্রথমে ব্যারোমিটারটিকে ভবনের ছাদে নিয়ে যেতে হবে। তারপর এর সাথে লম্বা একটি দড়ি বাঁধতে হবে। বাঁধার পর একে ছাদ থেকে ধীরে ধীরে ভূমিতে নামাতে হবে। ভূমি স্পর্শ করার পর দড়ির দৈর্ঘ্য ও ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য যোগ করলে যে ফল আসবে, তা-ই হবে ভবনটির উচ্চতা।

ছাত্র তো উত্তর দিয়ে দিলো, কিন্তু শিক্ষক তো তাতে কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট নন। এমন দায়সারা অলস উত্তরে শিক্ষক তাকে শূন্য দিয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

তারপর অনেক কিছু হলো এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বিচারক ছাত্রটির কাছে জানতে চাইলেন সে আসলেই প্রাসঙ্গিক উত্তরটি জানে না কি জানে না? ছাত্র জানায়, সে আসলে জানে। কিন্তু সে এমন করেছে কারণ হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা যেভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করা সম্পর্কে পড়িয়েছেন, তাতে সে বিরক্ত হয়ে গেছে। (এই গল্পের ছাত্রটি নিলস বোর বলে প্রচলিত, তবে আসলে সেটা সত্যি নয়।)
তাহলে আবার মূল প্রশ্নে ফেরত যাই—এক আলোকবর্ষ মানে কত বছর? এর প্রচলিত উত্তর

হচ্ছে, "আরে, আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের একক বা পরিমাপ, সময়ের একক বা পরিমাপ নয়।" কিন্তু আলোকবর্ষ দিয়ে কি সময়ের পরিমাপ সম্ভব?

ধরলাম, সময় রাত ২টা। একটা গাড়ি ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে ৩ কি.মি. দূরে এবং ঠিক ৩০ কি.মি./ঘণ্টা সমবেগে এগোচ্ছে। যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছাবে তখন কত সময় যাবে?

এই অঙ্কটা কঠিন না। ৩০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে ৩ কি.মি. যেতে সময় লাগবে ৩/৩০ ঘণ্টা = ৬ মিনিট।

তাহলে আমরা যদি জানি প্রক্সিমা সেন্টোরি ৪.২৪৩ আলোকবর্ষ দূরে, তাহলে একটা ফোটন যদি পৃথিবী থেকে পাঠাই, সেটা যখন পৌঁছাবে, আমরা ঘড়ি না দেখেই বলতে পারব, ৪.২৪৩ বছর
কেটেছে। ৯ আলোকবর্ষ দূরে যদি কিছু থাকত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম—
আলোর গতিতে এক আলোকবর্ষ যেতে কতক্ষণ সময় কাটবে পৃথিবীতে?
উত্তর: এক বছর। কেউ আলোকবর্ষ দিয়ে সময় মাপে না, কিন্তু ব্যারোমিটার দড়িতে বেঁধে বিল্ডিংয়ের উচ্চতা মাপার মতোই সেটা করা সম্ভব।
এত বড়ো প্যাঁচাল পাড়ার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, গৎবাঁধা চিন্তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত আমাদের।
https://roar.media/bangla/main/science/the-barometer-problem

নেকড়েরা কি আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার শিক্ষা দেয়?

রওনক শাহরিয়ার

একটি ফ্যাক্ট পোস্ট ফেসবুকে প্রায়ই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, যেখানে নেকড়েরা আমাদের নেতৃত্বের শিক্ষা দেয় বলে প্রচার করা হয়। সেখানে.দেখা যায় ডজনখানেক নেকড়ে সারিবদ্ধভাবে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আর সাথে এই লেখাটা থাকে—

"একটা নেকড়ের পালের চলার নির্দিষ্ট ধরন আছে। প্রথমের লাল বৃত্তের তিনটা নেকড়ে হলো সবচেয়ে বয়স্ক, অসুস্থ ও দুর্বল। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা বেশি। তাদের সামনে দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের গতি অনুযায়ী বাকি দল চলবে।

তাদের ঠিক পেছনের হলুদ দাগের পাঁচজন দলের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং যোদ্ধা নেকড়ে। তাদের কাজ অগ্রবর্তী দলকে সাপোর্ট দেওয়া এবং যে-কোনো আক্রমণ এলে সামাল দেয়া।
তাদের ঠিক পেছনে, নবীন আর কম শক্তিশালীরা থাকে। কিন্তু মাঝের দলটাই সবচাইতে প্রোটেক্টেড।

কারণ, তাদের পিছনে সবুজ চিহ্নিত দলটা খুব শক্তিশালী এবং যোদ্ধা নেকড়ে। তাদের কাজ পেছন থেকে কোনো আক্রমণ এলে প্রোটেকশান দেওয়া।

তাদের পেছনে নীল চিহ্নিত একাকী নেকড়েটা দলনেতা। সবার পিছনে সে আসছে। তার দায়িত্ব হলো কেউ পিছনে পড়ে যাচ্ছে কি না, কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তা খেয়াল রাখা।

সে লিডার। লিডারদের সবসময় সামনেই থাকতে হবে এমন নয়, প্রয়োজনে সবার পেছনেও যেতে হয়। লিডারশিপ ব্যাপারটা এমনই।"

বিষয়টা সম্পূর্ণ গুজব। ছবিটা 'Chadden Hunter' নামক ফটোগ্রাফারের তোলা এবং এটি ২০১১ সালে বিবিসির ডকুমেন্টারি 'ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড' এ দেখানো হয়। গার্ডিয়ান প্রকাশিত ক্যাপশনের মূল তথ্যটি হলো, 'আলফা ফিমেইল' নেকড়েদের দলটিকে নেতৃত্ব দেয় এবং দলের বাকিরা তাকে অনুসরণ করে শক্তি বাঁচানোর জন্য।

এই বর্ণনাটি ফেসবুকে প্রচার হওয়া তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি সঠিক, তবে কিছু গবেষক 'আলফা' শব্দটি ব্যবহার নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

ডেভিড মিক তাঁর গবেষণাপত্রে প্রাণিজগতে নেকড়েদের মধ্যে 'আলফা' বা দলের সদস্যদের ওপর আধিপত্য নেই বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নেতৃত্বদানকারী নেকড়েরা বেশিরভাগ সময় নেকড়েদের অভিভাবক হয়ে থাকে।

ছবিতে বাস্তব অর্থে দেখা যায় যে, একদল নেকড়ে তুষারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরা তিন জন বয়স্ক সদস্য বা আলফা ফিমেইল দ্বারা নয় বরং তাদের শক্তিশালী সদস্যদের মধ্যে একটি নেকড়ে তুষারের মধ্যে দিয়ে পথ তৈরির জন্য দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
https://www.wolf.org/wp-content/uploads/2013/09/267alphastatus_english.pdf

https://io9.gizmodo.com/why-everything-you-know-about-wolf-packs-is-wrong-502754629

https://www.theguardian.com/environment/gallery/2011/oct/19/bbc-frozen-planet-in-pictures

https://www.snopes.com/fact-check/wolf-pack-photo/

https://africacheck.org/fbcheck/no-wolves-cant-teach-people-a-leadership-lesson/

https://www.politifact.com/factchecks/2019/nov/20/viral-image/facebook-posts-viral-wolf-pack-image-miscategorize/

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ কি তাঁর মস্তিষ্কের ১০% ব্যবহার করেন?

তানভীর রানা রাব্বি

আসলে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন তার মস্তিষ্কের ১০০ শতাংশই ব্যবহার করেন। অনেকেই মনে করেন, মস্তিষ্কের ১০% ব্যবহার করা হয়। এগুলো ভিত্তিহীন আর শুনলে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই।

আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ১০০ শতাংশই ব্যবহার করি। বিভিন্ন অংশের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় ৮৯ শতাংশ (প্রায় ১৬ বিলিয়ন নিউরন) জায়গা জুড়ে আছে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অংশ, যার নাম 'কর্টেক্স'। আমাদের পুরো মস্তিষ্ক জুড়ে শুধু এ অংশটাই উদ্বিগ্ন (concious)। বাকি সবটা যন্ত্রের মতো নিজে থেকেই কাজ করে, যার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এক গবেষণায় দেখা গেছে, একটা বেসবলে ব্যাট আঘাত করতে ৫০ শতাংশ মস্তিষ্ক সক্রিয় করতে হয়। তাহলে দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ করতে কতটুকু সক্রিয় করতে হবে?

মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অংশ ব্যবহার না করে আমরা সামান্য হাঁটতেও পারতাম না। সব কাজেই কম-বেশি আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ১০০% ব্যবহার করি। কারণ মস্তিষ্ককে শুধু ওই নির্দিষ্ট কাজই করতে হয় না। ভারসাম্য রক্ষা, শারীরবৃত্তীয় কাজসহ আরও নানাবিধ কাজ করতে হয়। যেমন: আমাদের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কানের তিনটি অংশ (বাহির, মধ্য, ভিতর) এবং দেহের বিভিন্ন অস্থি এবং অস্থিসন্ধি থেকে ভ্যাস্টিবুলার সিস্টেমে সংকেত পাঠানো হয়। তারপর মস্তিষ্ক সেটা জটিল প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন অঙ্গে সংকেত পাঠানোর মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করে। এখানে মস্তিষ্কের অনেকগুলো অংশ কাজ করে। তাহলে দেখুন, এক দেহের ভারসাম্য

রক্ষা করার জন্যই এত কারবার। তাহলে অন্যান্য কাজ করতে কত কিছু করতে হয়! এতে সহজেই বোঝা যায় যে আমরা মোটেও মস্তিষ্কের ১০% ব্যবহার করি না। তাছাড়া, fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET(Positron Emission Tomography) এর মতো বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, খুব সাধারণ কাজ যেমন : হাত-পা নাড়ানো, বসে থাকা ইত্যাদি কাজের সময়ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এক গতিশীল প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। তবে নির্দিষ্ট কাজের সময় নির্দিষ্ট কিছু অংশ বেশি অ্যাক্টিভ থাকে যেমন: দেখার সময় ভিজ্যুয়াল কর্টেক্স, শোনার সময় অডিটরি কর্টেক্স ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক ১০০%-ই কাজ করে। কিন্তু মস্তিষ্কের ১০০%-ই মানুষ তার চিন্তায় ব্যয় করতে পারে না। কারণ মস্তিষ্কের একেক অংশের কাজ একেকটা যেটা আমি আগেই বলেছি। যে অংশ নার্ভাল

সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে, সে অংশ চিন্তা করতে পারে না। এমনকি ঘুমের ভেতরেও মস্তিষ্কের মেমোরি সংক্রান্ত পার্ট অ্যাক্টিভ থাকে এবং স্মৃতি গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। আমরা মস্তিষ্কের নিউরনগুলার মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় করতে পারি না যার জন্য অনেকে অনেক মেধাবী আর অনেকে দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু অনুশীলন করলে মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধন সহজ হয়, আর আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ানোও সম্ভব।

এবার আসি 'আমরা মস্তিষ্কের ১০% ব্যবহার করি' তার ব্যাপারে।

আসলে, ব্যাপারটা একটা মনগড়া গল্প যেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে এই ১০% কোথা থেকে এলো। তবে ধারণা করা হয় কয়েকটা কারণকে। যেমন: ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'SCIENCE' ম্যাগাজিনে উইলিয়াম জেমস তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন, "মানুষ তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ ব্যবহার করে।"
কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে কত শতাংশ তা বলেননি।

আবার ১৯৩৬ সালে ডেল কার্নেগির প্রকাশিত বই 'How to Win Friends and Influence People'-এ তিনি ১০% ব্যাপারটা উল্লেখ করেছিলেন। এখানে তিনি সেটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মস্তিষ্ক অনেক কিছু করতে পারে।

তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ, টেলিভিশন অনুষ্ঠান বা সিনেমাতে এরকম ব্যাপার অনেকবার বলা হয়েছে। এমনকি এখনও কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আমাদের মস্তিষ্কের মাত্র ১০% কোষে নিউরন সক্রিয়। কিন্তু এই ১০% ব্যাপারটা বেশি ছড়িয়েছে ইন্টারনেট আর সিনেমার মাধ্যমে।

অনেকে হয়তো লুক বেসনের 'Lucy' (2014) সিনেমাটি দেখে থাকবেন। যে সিনেমাটিতে স্কারলেট জোহানসন এবং মরগান ফ্রিম্যানের মতো বিখ্যাত অভিনয় শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। সেখানে ওই ১০% এর যে গুজব সেটা দেখানো হয়েছে। ২৫ বছরের অ্যামেরিকান মেয়ে লুসি তাইওয়ানে লেখাপড়া করতে গিয়ে ড্রাগ মাফিয়াদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তারপর CPH4 নামের একটা ড্রাগ তাঁর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় পাচার করার জন্য। কিন্তু তাঁর শরীরে সেটা ফেঁটে যায় এবং সেই ড্রাগের প্রভাবে তাঁর মস্তিষ্কের অনেক অংশ সক্রিয় হয়ে যায়; যেটা তিনি ব্যবহার করতে পারেন, আর একসময় সেটা ১০০% এ পৌঁছে যায়।

সিনেমাটি অসাধারণ। কিন্তু তাতে যা দেখানো হয়েছে সেটা মোটেও সত্যি নয়। আমরা প্রতিদিন মস্তিষ্ককে কোনো না কোনোভাবে ১০০%-ই ব্যবহার করে থাকি।
তাছাড়া বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখতে পারবেন, দেহের মোট ভরের মাত্র ২ শতাংশ জায়গা দখল করা মস্তিষ্ক দেহের ২০ ভাগ শক্তি ব্যবহার করে; যেখানে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী ২-১০% শক্তি ব্যবহার করে। মস্তিষ্ক দীর্ঘ সময়ের প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। তাই মস্তিষ্কের বিশাল অংশ অব্যবহৃত থাকলে অর্থাৎ তার থেকে কোনো সুবিধা পাওয়া না গেলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে যেত। যদি ১০%-ই ব্যবহার করতে হতো তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এটা ছোটোই থাকত; বাড়তি ৯০% হতো না।

ঘোড়া দ্যা সুপার অ্যানিম্যাল

নাঈম হোসেন ফারুকী

পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক সাপের কামড়ে সব প্রাণী মরে যায়। 😵

হাতি মরে। 😰
গন্ডার মরে। 😫
বাঘ মরে। 😓
কিন্তু ঘোড়ার কিচ্ছু হয় না। 💪

দুই-চারদিন অসুস্থ থাকে, এরপর সুস্থ হয়ে যায়। 😎
এই জন্য একমাত্র ঘোড়ার রক্তেই অল্প অল্প সাপের বিষ ঢুকিয়ে অ্যান্টি-ভেনম তৈরি করা হয়। 😌

প্রচলিত চরম অতিরঞ্জিত ভুয়া তথ্যগুলোর এটা একটা। তো দেখে আসি কী কী বিষয় ভুয়া এখানে।
১. অনেক প্রাণীর সাপের বিষের প্রতি ইমিউনিটি আছে। যেমন: হানি ব্যাজার, উডর্যাট ইত্যাদি। ঘোড়া তাদের মধ্যে নেই।

২. শরীর বড়ো হলে তাকে মারতে বিষ বেশি লাগে। হাতির শরীর আরও বড়ো। যে বিষে ঘোড়া মরে, হাতিকে মারতে তার চেয়ে বেশি বিষ লাগবে।

৩. হ্যাঁ, যথেষ্ট বিষ পেলে ঘোড়ার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেরকম হলে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যদিও অল্প বিষে সে সেরে ওঠে, তবে কয়েকদিন খুব কষ্ট পায়।

৪. ঘোড়ার বড়ো শরীর মিশুক, ইঞ্জেকশনে আপত্তি করে না–এসব বিবেচনা করে তাকে
অল্প অল্প বিষ দিয়ে তার থেকে অ্যান্টিভেনম বানানো হয়। ঘোড়া ছাড়াও ভেড়া, মুরগি এসব থেকেও বানানো যায়।

৫. এমনকি অল্প অল্প করে বিষ নিয়ে মানুষও বিষের প্রতি ইমিউন হতে পারে।

"বিষে ভরা ঘোড়া"

গুজব

ব্যাঙাচি

খারাপ হাতের লেখা কি বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ?

মাহতাব মাহদী

না, হাতের লেখার সাথে ব্রেইন তথা বুদ্ধিমত্তার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। "হাতের লেখা খারাপ মানেই যে সেই ব্যক্তি বেশি বুদ্ধিমান"–এ তথ্যের কোনো ভিত্তি নেই।

মিথটা 'ইন্ডিয়া টাইমস' এর মতো পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা সেখানে একজন সাইকোলজিস্টের কথাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন রিসার্চে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

তো, এখন আসি মূল কথায়। আমাদের ব্রেইন আমাদের হাতকে সংকেত পাঠায় লেখার জন্য। আমাদের হাত মস্তিষ্কের সেই নির্দেশ ফলো করে লেখে। একজন ৩-৪ বছরের বাচ্চার হাতের লেখা খারাপই হয়, প্রায় সবারই। আস্তে আস্তে তা ভালো হয়, আবার খারাপও হয়ে যেতে পারে। তো, আমরা যদি খারাপ হাতের লেখাকে বুদ্ধিমত্তার মানদণ্ড ধরি, প্রায় ৭০%+ শিশুকেই by born tallent বলে আখ্যায়িত করতে হবে, যা আসলে ভুয়া।

ডাক্তারদের হাতের লেখা খারাপ হয়, অনেক বিজ্ঞানীদের হাতের লেখা খারাপ হতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই না যে তাঁর ট্যালেন্টের জন্য তাঁর

হাতের লেখা খারাপ। খারাপ হাতের লেখার অনেক কারণ আছে। যেমন: তাড়াহুড়ো করে লেখার চেষ্টা করা, মনোযোগী না হয়ে লেখা,

লেখার সময় অন্য কিছু ভাবা, সঠিকভাবে কলম না ধরা, উদাসীন হয়ে লেখা ইত্যাদি।

অনেক বিজ্ঞানী বা ডাক্তারদের হাতের লেখাও অনেক ভালো হয়। তাছাড়া আগের বিজ্ঞানীদের হাতে লেখা রিসার্চ পেপার দেখে বোঝা যায়, তাঁদের হাতের লেখাও মোটামুটি ভালো ছিল।

প্রচলিত গুজবে হাতের লেখা খারাপ হওয়ার পেছনে যে কারণটা বলা হয় তা হলো,
"যারা জন্মগতভাবে বুদ্ধিমান, তাঁদের ব্রেইন হাতের চাইতে দ্রুত কাজ করে!"

এটা চরম ভুয়া তথ্য। মস্তিষ্কের তথ্য প্রসেসিং-এর দক্ষতা নিয়ে তো সন্দেহ থাকার প্রশ্নই আসে না। থাকলে থাকবে 'তথ্য পাঠানো' নিয়ে। আর মস্তিষ্ক নিউরনের মধ্য দিয়ে ১০০ মিটার/সেকেন্ড বা প্রতি সেকেন্ডে ১০০ মিটার বেগে তথ্য পাঠাতে পারে। যদি ৯০ লেটার পার মিনিট লেখে সেক্ষেত্রে ৬৫ হার্জ

ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করবে অর্থাৎ স্পিড হবে ২২ মিটারের মতো। আর মানুষের এভারেজ লেখার স্পিড ৬৮ ওয়ার্ড পার মিনিট।

এই যুক্তিতে তো সবাইকেই by born tallent বলা যায়। তাই নয় কি? অর্থাৎ, এটা ভুয়া যুক্তি।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে–হাতের লেখা বা ছবি আঁকার সাথে ব্রেইনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, এক কথায় উত্তর–সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। (অনেকে দাবি করে কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই, শুধুই ধারণা।) তবে হ্যাঁ, বেশ কিছু (শতকরা হিসাবে অর্ধেকেরও কম) মানুষের ছবি আঁকা ও হাতের লেখা দ্বারা তাঁরা কতটুকু সৃজনশীল তা আন্দাজ করা যায়, তবে কতটুকু বুদ্ধিমান তা পরিমাপে আমাদের হাতের লেখার কোনো ভূমিকা নেই।

রেফারেন্স:
https://graphology-world.com/messy-handwriting-sign-intelligence/

সাপের মণি

আবু রায়হান

১।
সাপের মাথায় কি আসলেই মণি থাকে?

সাপের মাথার মণি আজীবনই রহস্যময় একটা বিষয় ছিল। কত কত সিনেমায় দেখেছি মণি সংগ্রহ করতে গিয়ে কত কত সাপুড়ে প্রাণ হারায়! আর কত তার গুণাবলি!

চলুন, আজ জানা যাক সাপের মণির আদ্যোপান্ত।

সাপের মণির আরও অনেক নাম আছে। যেমন : স্কয়ার্জ স্টেইন, পিয়ের নয়ার, পাইদারিটাস নেগ্রাস, নাগমণি।

যাহোক, সাপের মাথায় আমরা যে অলৌকিক মণির অস্তিত্বের কথা মনে করে থাকি, তা পুরোটাই রূপকথা। তবে মণি জাতীয় কিছু না থাকলেও সাপের মাথার অভ্যন্তরে পাথর জাতীয় কিছু থাকে। আসলে পুরোটাই বৈজ্ঞানিক বিষয়।

মূলত সাপের মাথায় কোনো পাথর বা মণি প্রাকৃতিকভাবে থাকে না বা তৈরি হয় না। সাপের বিষ একটি বিষগ্রন্থিতে তৈরি হয় এবং গ্রন্থি থেকে বিষ দাঁতে প্রবাহিত হয়। কখনো কখনো বিষ দাঁতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তখন এই বিষ জমা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। এটাকেই বলা হয় 'সাপের মাথার মণি'। এই ঘটনাটি প্রকৃতিতে খুবই দুর্লভ।

বিষধর সাপের মাথার অভ্যন্তরে এ বিষথলি থাকে। এসব বিষথলিতে থাকা বিষ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হলে বা দেহ থেকে নিঃসৃত না হলে, তা সে বিষথলি/Gland-এ জমা হতে হতে শক্ত হয়ে যায়। আর সেটা শক্ত হয়ে কালো পাথরের মতো আকার ধারণ করে, যেটাকে ইংরেজিতে ব্ল্যাক স্টোন বলা হয়ে থাকে।
তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাপুড়েরা আমাদের সাথে ভাঁওতাবাজি করে থাকে।

সাধারণ সাপের বিষথলিতে বিষ জমবে কীভাবে? যেখানে এসব বিষ-ই নেই।

সাপুড়েরা এক্ষেত্রে ভীষণ ধূর্তামিপূর্ণ ট্রিকস অবলম্বন করে।

আমরা জানি, সাপ এক প্রকার সরীসৃপ। এর দেহে মূল দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তুলনামূলকভাবে পুরু ও ফ্লেক্সিবল একটি খোলস থাকে। কাঁকড়া, তেলাপোকা ইত্যাদি আর্থোপোডা পর্বের প্রাণীদের যেমন থাকে। এই খোলস সাপের দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন সাপের দেহের বৃদ্ধি ঘটে তখন সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে। বৃদ্ধি শেষে তার দেহে এমন আরেকটি পুরু ও ফ্লেক্সিবল খোলস তৈরি হয়ে

যায়। আমরা সাপের এই খোলসটিকেই দেখি। যাদের গ্রামে ভ্রমণের অভ্যাস আছে তারা হয়তো এরকম সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখেছে। এই খোলসটি ভেতরের সাপের দেহের সাথে চামড়ার মতো লাগানো থাকে না। অনেকটা চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোলসের মতো ফাঁপা অবস্থায় এই খোলসের ভেতর সাপের মূল দেহ থাকে। আপনি চাইলে সাপের এই খোলসের এক প্রান্ত একটু কেটে টান দিলে ভেতরের পুরো সাপটি কে খোলস থেকে বের করে আনতে পারবেন। সাপের এই বৈশিষ্ট্যটিই ব্যবহার করে সাপের মাথার মণি দেখানো হয়ে থাকে।

২।
এই সর্প-মণি বিশারদরা প্রথমে একটি সাপের ব্যবস্থা করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষহীন সাপকে এই কাজে ব্যবহার করে। তারপর তারা সাপের লেজের দিকে অল্প একটু কেটে সেখানে একটি রঙিন পাথর প্রবেশ করায়। তাহলে পাথরটি থাকে সাপের পাতলা চামড়ার বাইরে এবং শক্ত খোলসের নিচে। তারপর এটিকে রাবারের টিউবের মতো চেপে চেপে লেজের দিক থেকে পাথরটাকে সাপের মাথায় নিয়ে আসা হয়। এই সম্পূর্ণ কাজটি ঘটে আপনার অগোচরে। এরপর তারা পূর্বে প্রস্তুতকৃত সাপটিকে নিয়ে আসে আপনার সামনে।

আপনার লক্ষ থাকে সাপের মাথায়, লেজে নয়। তারপর আপনি যখন সাপটির মাথাটা কাটেন, তখন বেরিয়ে আসে সেই আগে থেকে প্রস্তুত পাথরটি। এরপর সেটিকে সাপের মাথার মণি বলে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং হাতিয়ে নেওয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা।

এই গুপ্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলটা যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে আপনার বিশ্বাস করে নেওয়াটা অস্বাভাবিক না যে সাপের মাথায় মণি থাকে, সেটা খুব দামি ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হ্যানত্যান।

তবে থাকুক আর না থাকুক এটি কখনোই কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। এমনকি আপনার ভাগ্য নির্ধারণের কোনো ক্ষমতাই এর নেই। আর এটি আংটিতে ব্যবহার করার মতো কোনো কঠিন পাথরের মতোও হয় না। তরল বিষ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে একটা irregular অবয়ব তৈরি করে মাত্র। অথচ সর্প-মণি বিশারদরা আপনাকে সাপের মাথা থেকে এনে দেবে সুন্দর আকৃতির একটি রঙিন পাথর।

আসলে পুরোটাই সাপুড়েদের ধোঁকাবাজি।
তবে Snake Catcher-রা সাপ ধরার সময় ঐ শুষ্ক শক্ত বিষকে সাপের মাথায় চাকু দিয়ে হালকা কেটে বের করে ফেলেন। এতে সাপের মৃত্যু হয় না

তবে এটির সাপের বিষ ঝেড়ে ফেলার বা শোষণ করার কোনো প্রমাণ আদৌ বিজ্ঞান পায়নি। পুরোটাই একটা মিথ।

তাহলে এ মিথ কীভাবে তৈরি হলো?
প্রায় ৩০,০০ প্রজাতির সাপের মাঝে মাত্র ৬০০ প্রজাতির সাপ হলো বিষধর। আর তার মাঝে ২০০

প্রজাতির সাপ (প্রায় ৬%) মানুষের শরীর ও অঙ্গের জন্য হুমকিস্বরূপ। ধরেন, কখনো কোনো সাপ আপনাকে কামড়াল; সাপটা কিন্তু বিষহীন বা হুমকি না হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৯০%। ধরেন, বিষহীন সাপই কামড়াল। আচ্ছা, ধরেন বিষাক্ত সাপই কামড়াল, তখন?

তবে জেনে নিন, ৫টা বিষাক্ত সাপের মাঝে ৪টাই বিষহীন কামড় দেয়।

বিষাক্ত সাপ বা যে-কোনো সাপের কামড় হলো প্রতিরক্ষামূলক। এক্ষেত্রে সাপ জাস্ট কামড় দেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে। বিষ ছাড়ে না। আর যাদের ছাড়ে তারা হয়তো চিকিৎসা নিয়ে ভালো হয় বা মারা যায়। সাপুড়ের চল তো উঠেই যাচ্ছে। কামড়ের পর যারা সাপুড়ে দেখায়, তাদের বেশিরভাগই বিষহীন সাপের কামড়ের প্রতিকার রূপে সাপুড়ে দেখায়।

সাপুড়ে এসে সে শক্ত বিষ জমা পাথরটা ভুজুংভাজুং হিসেবে বিষহীন সাপের কামড়ে ব্যবহার করে। রোগী কিন্তু এমনেতেই সেরে যেত। মাঝখান থেকে নাম হলো পাথরের বা কথিত সাপের মণির ও সাপুড়ের।

এই হলো আসল কাহিনি। যেহেতু বেশিরভাগ সাপই বিষহীন, তাই বেশিরভাগ সাপে কাটা রোগীর শরীরে বিষ প্রবেশ হতে পারে না। আর তাদের সারিয়ে তোলাও সহজ সাপুড়েদের পক্ষে।

ফলে সহজেই এ সাপের মণির বিষয়টা মিথ হিসেবে ছড়িয়ে গেছে। তার ওপর আমাদের প্রাচীন, বিজ্ঞানবিমুখ জাতির কুসংস্কার তো আছেই।

৩।
বর্তমানে কীভাবে মণি সংগ্রহ/তৈরি হয়?

উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী :

সাপের মণি হিসেবে প্রক্রিয়াজাত করে মণিপাথর তৈরি করতে গোরুর হাড় অথবা বিভিন্ন প্রাণীর হাড়কে ব্যবহার করা হয়।

এক্ষেত্রে তারা :

১. প্রথমে কোনো মৃত গোরুর শুষ্ক উরুর হাড় বেছে নেয়।
২. তারপর সে হাড়কে ছোটো ছোটো খণ্ড করা হয়।
৩. তারপর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়।
৪. তারপর Foil কাগজ দিয়ে তা মোড়ানো হয়।
৫. তারপর সে হাড়কে কয়লার আগুনে ১৫-২০মিনিট পোড়ানো হয় এবং পোড়ালে তা কালো হয়ে যায়। এভাবে কথিত মণি তৈরি করা হয়।

তবে আগেই বলেছি বিষাক্ত সাপের মাথা বা লেজের বিষগ্রন্থি থেকেও কথিত মণি সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সাপের জমে শক্ত হয়ে যাওয়া বিষ যাকে রংচং মাখিয়ে মণি হিসেবে উত্থাপিত হয়।

যাহোক, কৃত্রিম এ পাথর বা হাড়কে সাপের কামড়ের জায়গায় বসানো হয়। তারপর সেটা এক সময় বিষ শোষণ করে মাটিতে আপনা-আপনিই পড়ে যায়।

কীভাবে সম্ভব?

ব্যাখ্যা করছি। গোরুর এ হাড়গুলো সাধারণত অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয়। মনে করে দেখেন–গোরুর হাড় চিবুতে গিয়ে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হাড়ের দেখা পাননি? সবাই পেয়েছেন জানি।

সে হাড়গুলো তারা খুব শুষ্ক করে রাখে যাতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় হাড়গুলো বিষের রস শোষণ করতে পারে তার অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে।

বলেন তো, টিস্যু পেপার বা কাগজ কেন এত পানি শোষণ করতে পারে? টিস্যু পেপারের পানি শোষণ করার ঘটনাটার মতো হুবহু ঘটনা সেখানেও ঘটে। কিন্তু তা আমাদের সামনে রং মেখে উপস্থাপন করা হয় যেন আমরা সে সস্তা পাথরকে মূল্যবান পাথর ভাবি এবং তাদের ভণ্ডামি ব্যাবসার যেন প্রসার হয়।

৪।
তাহলে পাথরগুলো বিষ শোষণ করে আপনা-আপনি পড়ে যায় কেন?

সেটার জবাবও আছে। মূলত হাড় নামের কথিত পাথরগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বিষ শোষন করে ফুলে ফেঁপে ওঠে। টিস্যু যেরকম পানি শোষণ করে ভারী হয়ে যায়, ঠিক তেমনই। রক্তের সাথে বিষ শোষণের ফলে একটা সময় পাথরগুলো ভারী হয়ে যায়। তখন আর ভারের কারণে সেখানে আটকে থাকতে পারে না। এমনেই মাটিতে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

খেয়াল করেন, পুরোটাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এখানে কোনো অলৌকিকতা নেই। বাহ্যিক শুষ্ক এবং ছিদ্রযুক্ত বস্তুর টানে বাইরে রক্ত নির্গমন হওয়াকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় 'Capillary Action' (কৈশিক জালিকার ক্রিয়া) বলে যা ইমবাইবিশনের মতোই (কলয়েড জাতীয় শুকনা বা আধা শুকনা পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইমবাইবিশন)।

তারপর সে পাথরটাকে মাটি থেকে তুলে দুধ দিয়ে ধৌত করা হয়, যার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অলৌকিক একটা ভাব আনতেই তেমন করা হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর খবর হলো এ পাথরাকৃতি বস্তুটা উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো বিষই শোষণ করতে পারে না, তবে হালকা শোষণ করে ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। তাছাড়া অনেক সাপুড়ে এ পাথরটাকে প্রথমে দুধে চুবিয়ে নেয়, তারপর তা থেকে পাথরটা সরিয়ে সে দুগ্ধ রোগীকে খেতে দেয়। তারপর ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে প্রবাদটার প্রয়োগ হয় এখানে। মারা গেলে বলা হয় আয়ু ছিল না।

তবুও এ পাথরটাকে প্রারম্ভিকভাবে ফার্স্ট এইড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ এতে রোগীর মনে সাপের ভয়ে মারা যাওয়ার ভয়টা কেটে যাবে অনেকাংশে। প্লাসিবো ইফেক্টের মতো আরকি!

তা নাহলে ভয় পেয়ে উত্তেজিত হয়ে গেলে রক্তপ্রবাহ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে রোগীকে সমস্যায় ফেলে দেবে।

এই হলো সাপের মণির কেচ্ছা।

তো, আরও সাপের মণির পেছনে দৌঁড়ান, আর বনে-বাদারে সাপ বিচ্ছুর কামড় খেয়ে সাপ নামক নিরীহ প্রাণীর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করেন।

কুসংস্কারপিডিয়া

আবু রায়হান

আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার কুসংস্কার যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সেসব নিয়েই আজকের লেখা।

কুসংস্কার (superstition) হলো অযৌক্তিক যে-কোনো বিশ্বাস বা অভ্যাস যা অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয় যার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই এবং যুগ যুগ ধরে সেসব আমাদের মনে তীব্রভাবে জায়গা করে নিয়েছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সেসব বিশ্বাস দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হয়।

SUPERSTITIONS

এখানে অন্তর্ভূক্ত থাকা কিছু কিছু বিষয় কুসংস্কার হলেও তা মেনে চলা উচিত বা নিছকই কথার কথা। তবে সত্য আড়াল করে কুসংস্কার ছড়ানো সমর্থিত নয় কোনোমতেই।
তো চলুন, শুরু করি :

সমাজে প্রচলিত ১৫০টি অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস (কুসংস্কার) :

১. খেতে খেতে মৃদু কাশি মানে কেউ নাম নিচ্ছে:

প্রচলিত একটা কুসংস্কার হলো, কিছু খেতে খেতে গলায় আটকে যাওয়া বা কাশি হওয়ার ঘটনাযর প্রেক্ষিতে বলা হয়, "কেউ হয়তো আমার নাম নিচ্ছে বা গালি দিচ্ছে, তাই এমনটি হলো!" এইসব কথার না আছে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, আর না আছে কোনো বিন্দুমাত্র শক্ত যুক্তি। শক্ত যুক্তিই-বা বলছি কেন? বরং, কোনোরকম যুক্তিই নেই এমন হাস্যকর দাবির। আপনার হোঁচট খাওয়া, গলায় কাঁটা বিঁধে যাওয়া বা কাশি হওয়ার সাথে কারো কথার কীভাবে সম্পর্ক থাকে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত এমন কথা বলে থাকি ও শুনি!

২. দরজায় বাধা পাওয়া:

ঘর থেকে বের হচ্ছেন কোনো জরুরি কাজে। অসাবধানতাবশত হোঁচট খেলেন ঠিক ঘরের দরজাতে! আপনার বাবা-মা বা দাদি বাধা দিয়েছেন, "বাবা, আজ যেতে হবে না। হয়তো বিপদ আছে কোনো!" এমন সমস্যার মুখোমুখি আমরা হয়তো প্রায়ই হই। এখানে একটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, দরজায় হোঁচট খেলেন, আরেকটু সাবধান

হোন। কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে বিপদ বা ভালো কিছু অর্জনের পেছনে দরজায় হোঁচট কোনো প্রভাব রাখবে কীভাবে? আপনি কেন এমন তুচ্ছ ও স্বাভাবিক ঘটনার কারণে যাত্রা বন্ধ রাখবেন? এটা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত কুসংস্কার যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই!

৩. মরা গাছে কাক ডাকা:

অনেকে মনে করেন, মরা গাছে কাক ডাকলে নাকি কারো মৃত্যু সংবাদ আসে। এ ধারণায় বিশ্বাসীরা সঙ্গে সঙ্গে কাক তাড়াতে নেমে পড়েন। কিন্তু কাক তাড়িয়ে মৃত্যুর সংবাদকে কতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায়? এমন পাগলামির কি কোনো যুক্তি আছে? আর আমাদের সমাজে কাক ও কুকুরকে সবসময়ই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটাকে নিছক মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

৪. শেষ রাতে শিয়াল ডাকা:

কাক ডাকা দুঃসংবাদের হলেও শেষ রাতের শিয়ালের ডাককে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়! কারণ তাঁদের মতে শেষ রাতে শিয়ালের ডাক ফসলের ভালো দাম পাওয়ার সংকেত। যাঁরা এমনটাই বিশ্বাসী, তাঁরা বেশিরভাগই কুকুরের ডাককে খারাপ সংকেত ভাবলেও শিয়ালের ডাককে শুভ সংকেত ভেবে থাকেন। শেষ রাতে শিয়ালের ডাক শুনে ফসলের ভালো দাম পাওয়ার স্বপ্নে আশার জাল বুনতে থাকেন। হয়তো কখনো কখনো সকালে উঠে মুরগির ঘরের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখে সেই ভোরের শিয়ালকেই গালি দিতে থাকেন! গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের ভেতরে এই কুসংস্কারের প্রতি ভক্তি খুব ভয়ংকরভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৫. গভীর রাতে প্যাঁচার ডাক:

প্যাঁচা তো রাতেই ডাকবে! তারপরও গভীর রাতে প্যাঁচার ডাককে অনেকে ঝগড়া-বিবাদের সংকেত মনে করেন। প্যাঁচা রাতে মাটি কামড়ে নাকি ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে চায়! বাস্তবে রাতে ইঁদুর শিকারের জন্য প্যাঁচা মাটিতে নেমে আসে, কোনো মানুষের ভিতর ঝগড়া বাঁধাতে নয়।

৬. যাত্রাপথে খালি কলস দেখা:

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যদি সামনে খালি কলস পড়ে বা কেউ খালি কলস নিয়ে গেলে অনেকে যাত্রা বন্ধ রাখেন। কারণ যাত্রাপথের খালি কলস কাজে ব্যর্থ হওয়ার লক্ষণ! আবার অনেকে এটাকে অভাবের আগাম সংকেত হিসেবে ধরে নেন। যেমনটা দরজায় হোঁচট খাওয়া! বাস্তবে এটার সাথে বিপদের কোনো সম্পর্ক নেই।

৭. পেছন থেকে ডাকা:

কেউ যাত্রাপথে পেছন থেকে ডাকলে না কি বিপদ হয়! ভাবুন, আপনার পেছন থেকে কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা দেবে, এমন অবস্থায় কেউ পেছন থেকে আপনাকে ডেকে সতর্ক করে দিল, সেটা কি আপনাকে বিপদে ফেলল না কি উদ্ধার করল? ভিত্তিহীন ও চরম অবৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে এটা একটা।

৮. হাতের তালু চুলকানো:

ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসবে। আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসবে! এমন হাস্যকর বিশ্বাস অনেকের ভেতরে অবস্থান করছে। যখন এটি লিখছি, তখন আমার হাতের তালু চুলকাচ্ছিল, বাম হাতের তালু। বারবার চুলকানো দেখে এক ভাই বলেছিল, বিপদ হতে পারে আমার! তৎক্ষণাৎ চমৎকার কিছু যুক্তি ছাড়া আমার কাছে

কোনো বিপদ আসেনি! আর, বিপদ আসার সম্ভাবনাও দেখি না এই স্বাভাবিক চুলকানির জন্য। মানুষসহ যে-কোনো প্রাণীর কোনো ভালো কিছু অর্জন বা বিপদের জন্য কোনো চুলকানি, কলস কিংবা হোঁচট নয়, বরং তার কর্ম দায়ী।

৯. কথার মাঝে টিকটিকি ডাকা:

দুজনে বসে কথা বলার সময় হঠাৎ টিকটিকির আওয়াজকে 'কথা সত্য' এমন সাক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। অনেকে এটাকে সত্যের ডাক বলে থাকেন। অনেকে তো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে টিকটিকির 'টিক টিক' ডাকটা 'ঠিক ঠিক'-এ অনুবাদ করে বসেন! হাস্যকর!

১০. রাতে বিশেষ কিছু হস্তান্তর না করা:

শুনে অবাক হলেও এটাই সত্যি যে, অনেক এলাকায় রাতের বেলা কাউকে সুঁই-সুতা, টাকা, চুন, হলুদ জাতীয় কিছু না দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

তাই গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে রাতে সেলাই করেন না অনেকে। রাতের বেলা কাউকে চুন ধার দিলে চুন না বলে দই বলা হয়! বরাবরের মতো আরেকটা হাস্যকর কুসংস্কার এটা।

১১. রাতে ঘরের বাইরে পানি না ছোড়া:

গ্রামে রাতের খাওয়ার পর হাত ধোয়ার পানি সাধারণত ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেলা হয় না। কুসংস্কার আছে, রাতে এভাবে পানি ফেলা ঠিক নয়। এতে নাকি অমঙ্গল হয়! কেমন অমঙ্গল? এটা জানতে চেয়েছিলাম এক ভদ্র মহিলার কাছে। তিনি বললেন, "এরূপ করলে ঘরে শয়তানের আনাগোনা বাড়ে। কারণ কুকুর উঠানে উপস্থিত হয়। আর কুকুর খারাপ!" আমি ব্যক্তিগতভাবে যত্রতত্রভাবে এখানে ওখানে পানি ছোড়া পছন্দ করি না, রাত হোক বা দিন। কারণ, সেটা অন্যকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। আর যত্রতত্র পানি কেন, কিছুই ফেলা উচিত না। কিছু ফেলার জন্য যথাযথ স্থান তৈরি করা উচিত। আমরা যদি বাইরে পানি না ফেলতে চাই, সেক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কারণটি মানা উচিত, অদ্ভুত বিশ্বাস না!

১২. মাথা ন্যাড়া করলে চুল লম্বা হয়:

অনেকেই বিশ্বাস করেন, মাথা ন্যাড়া করলে নাকি চুল পরেরবার গজানোর সময় আরও ঘন, কালো আর মোটা হয়ে ফেরত আসে, আর লম্বাও হয় খুব তাড়াতাড়ি! কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত যে আসলে এগুলোর কিছুই ঘটে না। প্রকৃত সত্য হলো, চুলের গোড়ার একটুখানি অংশ বাদে বাকি অংশটুকু পুরোটাই প্রাণহীন। তাই প্রাণহীন চুলের বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে চুল কেটে লাভ নেই। কারণ চুল লম্বা হয় গোড়া থেকে। আর নতুন চুল গজানোর পরে সূর্যের আলো পড়ে তাকে কিছুদিনের জন্য ঘন, কালো বা মোটা দেখালেও বিভ্রান্তি ছাড়া তা আর কিছুই নয়।

১৩. চীনের মহাপ্রাচীর নাকি মহাকাশ থেকে দেখা যায়:

কুসংস্কার না বলে একে মিথ বলা উচিত।

চীনের মহাপ্রাচীর বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সব স্থাপত্যকলার মধ্যে অন্যতম।

রিচার্ড হ্যালিবার্টন নামের একজন ইতিহাসবিদ দাবি করেছিলেন যে এই মহাপ্রাচীর নাকি এতটাই বিশাল এবং আশ্চর্যজনক যে তা মহাকাশ থেকেও দেখা যায়! অবশ্য নাসার মহাকাশযান এই দাবিকে ভুল প্রমাণিত করেছে। বরং বিশ্বের বিভিন্ন বিমানবন্দর আর হাইওয়ে সড়ক কিছুটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

সংক্ষেপে আরও কিছু কুসংস্কারের তালিকা :

১৪. জোড়া কলা খেলে জমজ সন্তান জন্ম নেয়

১৫. সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীরা কিছু কাটলে গর্ভের সন্তান নাক-কান বা ঠোঁট কাটা অবস্থায় জন্ম নেয়

১৬. সন্ধ্যার আগে উঠান ও ঘর ঝাড়ু না দিলে ঘরে দেনা লেগে থাকে।

১৭. কোনো বিশেষ পাখি দেখলে বা ডাকলে আত্মীয় আসবে মনে করা।

১৮. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কালো বিড়াল দেখলে যাত্রা অশুভ।

১৯. খাওয়ার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয় তবে খাবার কুকুরের পেটে চলে যায়।

২০. গোসল করে ভিজা কাপড় নিংড়ানো পানি পায়ে ফেললে অকালে স্ত্রী মারা যায়।

২১. খাওয়ার সময় হেঁচকি উঠলে কেউ স্মরণ করছে বলে মনে করা।

২২. বৃষ্টির সময় রোদ দেখা দিলে শিয়ালের বিয়ে হয়। ব্যাং ডাকলে বৃষ্টি হবে।

২৩. দাঁত দিয়ে নখ কাটলে জীবনে কোনোদিনই উন্নতি হবে না।

২৪. অবলা নারীর সরল বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে বাড়িতে অগ্নিকান্ড ঘটে।

২৫. খালি মুখে মেহমান ফেরত গেলে অমঙ্গল হয়।

২৬. কাউকে শুধু পানি দেওয়া অমঙ্গল।

২৭. পরীক্ষার পূর্বে ডিম খাওয়া যাবে না। খেলে পরীক্ষায় ডিম (শূন্য পায়।

২৮. মুরগির মাথা খেলে মা-বাবার মৃত্যু দেখবে না।

২৯. জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান জন্ম নেবে।

৩০. রাতে গাছ থেকে ফল পাড়া উচিত না।

৩১. রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।

৩২. রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া যাবে না।

৩৩. ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হবে।

৩৪. ঘরের চৌকাঠে বসা যাবে না।

৩৫. ঘুমন্ত ছেলে মেয়েকে কোলে নিয়ে খানা খেলে কোলের সন্তান অকালে মারা যায়।

৩৬. ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসবে। আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসবে।

৩৭. নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুনে সেঁক দিয়ে পরতে হবে।

৩৮. ছাতা, হাতঘড়ি ইত্যাদি ধার দেওয়া যাবে না।

৩৯. চোখে গোটা হলে ছোটো বাচ্চাদের নু* ছোঁয়ালে সুস্থ হয়ে যায়।

৪০. রাতের বেলা কাউকে সুঁই-সুতা দিতে নেই।

৪১. গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতে নেই।

৪২. খালি ঘরে সন্ধ্যার সময় বাতি দিতে হয়। নাহলে ঘরে বিপদ আসে।

৪৩. গোসলের পর শরীরে তেল মাখার পূর্বে কোনো কিছু খেতে নেই।

৪৪.গরু হাঁচি দেওয়ার সময় যাত্রা করলে সে যাত্রার নির্ঘাত মৃত্যু হয়।

৪৫. পাতিলের মধ্যে খানা থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড়ো হয়ে যাবে।

৪৬. বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ দিতে হবে।

৪৭. রুমাল দিলে ঝগড়া হয়।

৪৮. হোঁচট খেলে মনে করা হয় ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে।

৪৯. হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে।

৫০. তিন রাস্তার মাটি বিশেষ কিছু বলে মনে করা।

৫১. নতুন স্ত্রীকে নরম স্থানে বসতে দিলে তাঁর মেজাজ নরম থাকবে। বেশ সুন্দর কথা!

৫২. কাঁচা মরিচ হাতে দিতে নেই। (তাহলে কি মুখে পুড়ে দেবে?

৫৩. তিন রাস্তার মোড়ে বসতে নেই।

৫৪. রাতে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে নেই।

৫৫. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, অমঙ্গল হয়।

৫৬. শকুন ডাকলে মানুষ মারা যাবে।

৫৭. ফলবান বৃক্ষের গোড়ায় প্রসাব পায়খানা করলে মৃত্যুর আগে ভিক্ষা করে খেতে হয়।

কুসংস্কার বলেই কিন্তু কাজটি করা কিন্তু মোটেই উচিত নয়।
৫৮. বিড়াল কাঁদলে মানুষ মারা যাবে।
৫৯. একবার মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয়বার টোকা দিতে হবে, নতুবা শিং উঠবে।
৬০. খানা একবার নেওয়া যাবে না, দুই-তিন বার নিতে হবে।
৬১. গালে হাত দিয়ে ভাবুক হয়ে বসে থাকলে বউ মরে যায়। সর্বনাশ!
৬২. নতুন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে আড়াই দিন অবস্থান করতে হবে।
৬৩. পাতিলের মধ্যে খানা খেলে মেয়ে সন্তান হয়, পেট বড়ো হয়।
৬৪. পোড়া খানা খেলে সাঁতার শিখবে।
৬৫. পিঁপড়া বা জলপোকা খেলে সাঁতার শিখবে।
৬৬. দাঁত উঠতে বিলম্ব হলে সাত ঘরের চাউল তুলে রান্না করে কাককে খাওয়াতে হবে এবং নিজেকেও খেতে হবে।
৬৭. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পূর্বে কাউকে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না।
৬৮. রাতের বেলা কোনো কিছু লেনদেন করা যাবে না।
৬৯. সকালবেলা দোকান খুলে বনি না করে কাউকে বাকী দেওয়া যাবে না।
৭০. দাঁড়িপাল্লা পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে চুমু খেতে হয়।
৭১. দোকানের টাকার বাক্স সকালে চুমু খেতে হয়।
৭২. গাছে উঠে ফল পাড়ার সময় গাছে থেকেই ফল খেলে গাছের ফলে পোঁকা ধরে।
৭৩. ফসলের জমিতে মাটির পাতিল সাদা-কালো রং করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
৭৪. শরীরে তিল থাকলে এটা হয়, ওটা হয়।
৭৫. স্ত্রী নাকে নাক ফুল না রাখলে স্বামী বাঁচে না।
৭৬. দা, কাঁচি বা ছুরি ডিঙিয়ে গেলে হাত-পা কেটে যাবে।
৭৭. গলায় কাঁটা বিঁধলে বিড়ালের পা ধরে মাফ চাইতে হয়। হাহাহা।
৭৮. লেনদেনের জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না। এক লক্ষ হলে একলক্ষ এক টাকা ধার্য করা।
৭৯. দোকানের প্রথম কাস্টমার ফেরত দিতে নেই।
৭৯. পুরুষ/ছেলের রাগ দমন করার জন্য কান ছিদ্র করা।
৮০. মেয়ে সন্তান হয় স্ত্রীর দোষে।
৮১. জন্মের পর বারবার সন্তান মারা গেলে অরুচিকর বা কুৎসিত নাম রাখলে সন্তান বেঁচে যায়।
৮২. ১৩ সংখ্যা অশুভ আর ৭ শুভ।
৮৩. প্লেট চেটে খেলে কন্যা সন্তান হয়।
৮৪. দোকান ঝাড়ু দেওয়ার আগে ভিক্ষা দেওয়া বা বেচাকেনা করা যাবে না।
৮৫. ছোটো বাচ্চা ডিঙিয়ে গেলে লম্বা হয় না।
৮৬. প্রজাপতিকে পানি পান করালে মৃত ব্যক্তিকে পান করানো হয়।
৮৭. কোনো বস্তু/ব্যক্তিকে লক্ষ্মী বা শুভ মনে করা।
৮৮. ডানে শুভ লক্ষণ, বামে কুলক্ষণ নির্ধারণে পাখিকে ঢিল মারা।
৮৯. বদনজর থেকে রক্ষা করতে শিশুর কপালে কালো টিপ দিতে হয়।
৯০. বাচ্চাদের বদনজর থেকে রক্ষার জন্য, 'ষাট ষাট বালাই ষাট' বলতে হয়।
৯১. দিনের প্রথম উপার্জন হাতে পাওয়ার পর তাতে চুমু দেওয়া , গাড়ির স্টিয়ারিং, হাতল বা কোনো অংশে ছোঁয়ানোর পরে বুকে ও চোখে লাগানো।
৯২. বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করতে হয়।
৯৩. কেউ হঠাৎ ভয় পেলে বুকে থুথু দিতে হয়।
৯৪. গোসল করে ফল খেতে হয় না।
৯৫. গর্ভবতী মহিলা সর্বদা লোহা, ম্যাচের কাঠি, রসুন সাথে রাখবে, নতুবা অমঙ্গল হয়।

৯৬. গাছের ফল চুরি হলে গাছে আর ফল ধরে না। (কত চুরি করেছি! পরের বছর আবার চুরি করেছি টেস্ট করতে।

৯৭. রান্না করার জন্য হলুদ ধার দেওয়া যাবে না।

৯৮. জামা গায়ে থাকা অবস্থায় সেলাই করলে অসুখ হয়।

৯৯. মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে অসুখ হয়।

১০০. মানুষ মারা গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়।

১০১. মানুষ মরে গেলে ভূত হয়।

১০২. কুকুর কামড়ালে মানুষের পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়।

১০৩. ছোটো বাচ্চাদের দাঁত পড়লে তা ইঁদুরের গর্তে ফেলতে হয়, নাহলে দাঁত আঁকাবাঁকা হয়।

১০৪. ভাঙা আয়না দিয়ে চেহারা দেখা যাবে না, তাতে অমঙ্গল হয়, চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়।

১০৫. ভাগিনা-ভাগনিকে মারলে মৃত্যুর সময় মামার হাত কাঁপে।

১০৬. আশ্বিন মাসে কোনো নারী বিধবা হলে তার আর কোনোদিন বিয়ে হয় না।

১০৭. সোমবার কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ। হাস্যকর!

১০৮. খালি ঘরে সন্ধ্যায় বাতি দিতে হয়, নাহলে বিপদ হয়।

১০৯. গর্ভবতী মহিলার জন্য কোনো কিছু কাটাকাটি কিংবা জবাই করা নিষিদ্ধ, তাতে ঠোঁট কাটা বাচ্চা জন্ম নেয়।

১১০. রুমাল, ছাতা, হাতঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার দিতে হয় না।

১১১. নতুন বউ কোনো ভালো কাজ করলে তা শুভ লক্ষ্মণ বলে মনে করা।

১১২. ইষ্টি কুটুম পাখি ডাকলে বলা হয় আত্মীয় আসবে।

১১৩. ভাত প্লেটে নেওয়ার সময় কেবল একবার নিতে হয় না।

১১৪. নতুন জামাই বাজার না করা পর্যন্ত এক পদ দিয়ে খাওয়ানো। হাহাহা! জামাইকে না খাইয়ে রাখার ফন্দি!

১১৫. রাস্তায় চলা সময় হোঁচট খেলে পিছিয়ে পুনরায় চলা শুরু করতে হয়।

১১৬. ফলবান বৃক্ষ বা বাগানে মানুষের বদ নজর এড়াতে মাটির পাতিলে সাদা-কালো রং মেখে তা ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

১১৭. স্ত্রীর নাকে নাক ফুল পরিধান স্বামীর জন্য মঙ্গলজনক মনে করা।

১১৮. নতুন ঘরের পশ্চিম পার্শ্বের খুঁটিতে লাল ফিতা বেঁধে রাখা।

১১৯. হঠাৎ বাম চোখ কাঁপলে দুঃখ আসবে মনে করা।

১২০. বাছুরের গলায় জুতার টুকরা ঝুলিয়ে দিলে সেই বাছুরটা মানুষের কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকে।

১২১. শুধু শুধু কাগজ ছিড়লে বা কুটি কুটি করলে ঋণ বাড়ে।

১২১. পর পর কয়েক সন্তান মারা যাওয়ার পর ছেলে হলে সন্তানের মঙ্গলে বড়শি পুড়িয়ে তার কপালে দাগ দেওয়া।

১২২. মৃতের বাড়িতে ৩ দিন পর্যন্ত মাছ-গোশত না খাওয়া, বাধ্যতামূলক নিরামিশ খাওয়া।

১২৩. কবর খোদাইয়ের সময় প্রথম কোপের মাটি রেখে দেওয়া।

১২৪. ঢেঁকির ওপর বসে আহার করলে বউ মারা যায় বলে মনে করা।

১২৫. আঙুলের ইশারায় কবর দেখালে সেই আঙুল পচে যায়।

১২৬. যে নারীর নাসিকাগ্র ঘামে, সে স্বামীকে অধিক ভালোবাসে।

১২৭. ভাঙা কুলায় লাথি মারলে জমির ফসল কমে যায়।

১২৮. পুরুষের বুকে লোম থাকা স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসার পরিচায়ক মনে করা।

৬২৯. কুকুরকে পা দিয়ে বাড়িতে গর্ত করতে দেখলে কারো মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, এটা মনে করা।
৬৩০. মাটিতে আঁকলে বা কিছু লিখলে মেধা কমে যায়।
৬৩১. শিকায় ভাঙ্গা গাড়ি পাতিল ঝুলিয়ে রাখলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে।
৬৩২. ঘরে মাকড়াসার জাল থাকলে গৃহের শান্তি চলে যায়।
৬৩২. পান খেয়ে জিহ্বা উল্টিয়ে দেখলে নারীর কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যায়।
৬৩৩. ভাঙ্গা কলসী ও ঝাটার মুড়া দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল ঘটে।
৬৩৪. ঝাটার শলা দ্বারা দাঁত খিলাল করলে চেহারা বিগড়াইয়া যায়।
৬৩৫. ১৩ সংখ্যাকে অপয়া মনে করা, বিভিন্ন সংখ্যাকে শুভ অশুভ মনে করা।
৬৩৬. বিভিন্ন রংকে শুভ-অশুভ মনে করা।
৬৩৭. বিভিন্ন ধাতুকে শুভ-অশুভ মনে করা।
৬৩৮. রাশিচক্রকে বিশ্বাস করা।
৬৩৯. কালো বিড়ালকে অশুভ মনে করা।
৬৪০. মাছের মাথা খেলে বুদ্ধি বাড়ে। (অন্য অংশ খেলে বাড়ে না?)
৬৪১. হাঁসের ডিম খেলে বাচ্চাদের গলা ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে যায়।
৬৪২. স্ত্রীর ভেজা চুলের পানি গায়ে লাগলে স্বামীর আয়ু কমে যায়।
৬৪৩. দুপুরে খাওয়ার পর গোসল করলে পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়।

কিছু বিদেশি কুসংস্কার :

১৪৪. রাতের বেলা যদি বজ্রপাত:
জাপানে যদি রাতের বেলা বজ্রপাত ঘটে, তাহলে শিশুদের বলা হয় সাথে সাথে তারা যেন তাদের পেট ঢেকে রাখে। তা না হলে 'রাইজিন' (বজ্রপাতের দেবতা) তাদের পেট ভক্ষণ করবে।

১৪৫. কুকুরের বিষ্ঠা চাপা:
ফ্রান্সের অধিবাসীরা মনে করে, রাস্তায় হাঁটার সময় যদি বাম পায়ের নিচে কুকুরের বিষ্ঠা চাপা পড়ে, তাহলে তা সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু যদি ডান পায়ের নিচে হয়, তাহলে তা দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে।

১৪৬. বিয়ের সময় মুখ ঢাকা:
রোমান ইতিহাস অনুযায়ী বিয়ের সময় কনের মুখ ঢাকা থাকা আবশ্যক। এর ফলে সমস্ত অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কারণ মুখ ডাকা থাকায় কনেকে চেনা যাবে না।

১৪৭. পাখির মল গায়ে পড়লে ভালো:
রাশিয়াতে উড়তে থাকা পাখির মল যদি গায়ে অথবা মাথায় এসে পড়ে, তাহলে তাকে শুভ বলে ধরা হয়। এতে নাকি ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়।

১৪৮. লেটুস পাতা খাওয়া:
লেটুস পাতা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। তবে ১৯ শতকে ইংরেজ পুরুষেরা সন্তানের জন্ম দিতে ইচ্ছুক থাকলে লেটুস পাতা খাওয়া এড়িয়ে চলতেন। এতে নাকি সন্তান ধারণে অসুবিধা হতো।

১৪৯. মধ্যরাতে আঙুর খাওয়া:
স্পেনে নববর্ষের সময়ে পরিচিতরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান না। তার বদলে ১২টি করে আঙুর খান স্পেনিয়রা। মনে করা হয়, এতে নাকি ১২ মাসই ভালো কাটবে।

১৫০. রাতে চুয়িংগাম চিবানো:
রাতে চুয়িংগাম চাবানো মানে নাকি মরা মানুষের মাংস চাবানো। দীর্ঘদিন ধরে এমনই কুসংস্কার চলে আসছে তুরস্কে।

এছাড়াও আছে আরও দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মভিত্তিক নানা কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞান যা একত্র করলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তালিকা শেষ হবে না।

সোর্স:
https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/360226.details
https://www.somewhereinblog.net/blog/sajiblobon/29643738
https://www.dailyhunt.in/news/india/bangla/presscard+news-epaper-pressc/aasun+jani+bishber+kayekati+desher+prachalit+kusanskar+guli+samparke-newsid-n152907358

মোবাইল মিথ

জান্নাতুল ফেরদৌস লিয়া, রওনক শাহরিয়ার

ভুল ধারণা ১:
পাবলিক চার্জিং পয়েন্টে ফোন চার্জ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সঠিক তথ্য:
এখন স্মার্টফোনগুলার অপারেটিং সিস্টেমের সিকিউরিটি বাগার করানে তেমন ঝুকির কিছু নেই। তবে পাবলিক চার্জিং পোর্ট ব্যবহার আপনার স্মার্টফোনে থাকা তথ্যকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। যে USB কর্ড আপনি রেস্টুরেন্টে বা এয়ারপোর্টের পাবলিক চার্জিং পয়েন্টে দেখে থাকেন, সেগুলো তথ্য আদান-প্রদানে সমর্থ। এগুলোতে ফোন কানেক্ট করলে হ্যাকাররা আপনার ফোনে থাকা বিভিন্ন কনটেন্ট যেমন: ই-মেইল, টেক্সট, ছবি প্রভৃতি নিয়ে নিতে পারে যদি আপানার ফোন অসাবধাণতা বসত যেটা ট্রান্সফারের পারমিশন দেয়া থাকে। যদি আপনার প্রায়ই বাইরে থাকা অবস্থায় ফোন চার্জ দিতে হয়, তবে পোর্টেবল চার্জার বা পাওয়ার ব্যাংক সাথে রাখা আপনার জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

ভুল ধারণা ২:
নতুন ফোন/ফোনের ব্যাটারি ব্যবহারের পূর্বে ফোনকে টানা ৮ ঘন্টা চার্জ দেওয়া উচিত।

সঠিক তথ্য:
আপনার ফোনে ইতোমধ্যেই কিছু চার্জ দেওয়া আছে এবং শুরুতে টানা ৮ ঘন্টা চার্জ দেওয়ার ধারণাটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির ক্ষেত্রে খাটে না। ফোন কেনার পর চার্জ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে ফ্যাক্টরি থেকে ফোন প্যাকেটজাত করার আগে প্রতিটা পার্টস চেক করা সহ ব্যাটারিকেও চেক করা হয় এবং ব্যাটারির আয়ন সমতায় রাখার জন্য ৫০ শতাংশের আশেপাশে চার্য রাখা হয় । এজন্য ফোন চার্জে না দিয়েই ফোন সেট-আপ ও প্রথমবার ব্যবহারে কোনো সমস্যা হবে না। চার্য ফুড়িয়ে গেলে যথারিতী চার্য দিয়ে নিবেন।

ভুল ধারণা ৩:
পাওয়ার ব্যাংক ও বাইরের অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করলে ব্যাটারির ক্ষতি হয়।

সঠিক তথ্য:
ফোনের মূল চার্জার ব্যবহার করাটা ভালো কারণ সেটা ফোনের সাথে সামঞ্জস্য করেই তৈরি করা । তবে সবসময় যদি ভালো মানের পাওয়ার ব্যাংক বা চার্জারের সাথে ভালো মানের ক্যাবল ব্যবহার করা হয় তাহলে ব্যাটারির কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ এগুলোতে অনেক বেশি সেইফটি ফিচার থাকে যা মূল অ্যাডাপ্টারেও থাকে না।

ভুল ধারণা ৪:
ওভার চার্জিং এ ফোনের ক্ষতি হয়।

সঠিক তথ্য:

আমাদের পুরোনো ফোনগুলোতে ব্যাটারি ফুল চার্জ হওয়ার পর নোটিফিকেশন আসত– "Battery full, remove the charger"। কিন্তু বর্তমানের কোনো ফোনে কি এমনটা দেখা যায়? বর্তমানের প্রায় সব স্মার্টফোনেই হিট এবং চার্জিং সেন্সর ব্যবহার করা হয়। ফোন ফুল চার্জড হয়ে যায় তখন ফোন ট্রিক্যাল চার্জিং (Trickle charging) মুডে চলে যায়, আর অ্যাডাপ্টার থেকে ততটুকু চার্জ গ্রহণ করে যতটুকু চার্জ ফোনে ইউজ হয়। তাই সারা রাত চার্জ দিলেও ব্যাটারির তেমন ক্ষতি হয় না।

ভুল ধারণা ৫:
ফোন একবার চার্জ দিলে এক সাইকেল কাউন্ট হয়। এজন্য বার বার চার্জ দেওয়া উচিত নয়।

সঠিক তথ্য:
ফোনের ব্যাটারির লাইফস্প্যান নির্ণয় হয় ব্যাটারি সাইকেলের ওপরে। এর মানে যখনই ডিসচার্জ ১০০% ছাড়িয়ে যায় তখনই এক সাইকেল কাউন্ট করা হয়। যেমন:
ফোন ৯০% থেকে ডিসচার্জ করে ৩৫% নিয়ে আসা হলো, আবার চার্জ দিয়ে ৮৫% করে আবার ৪০% এ আনলে তবে এক সাইকেল কাউন্ট হবে। ব্যাটারির সাইকেল কাউন্টে তারতম্য হওয়ার প্রতি মাসে একবার ক্যালিব্রেশন করা অর্থাৎ ব্যাটারি ০% ডিসচার্জ করে আবার ১০০% চার্জ করা।

ভুল ধারণা ৬:
টাওয়ারের রেডিয়েশনে নারিকেলের ক্ষতি হয়।

সঠিক তথ্য :
দেশে প্রচলিত একটি গুজব হলো মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের জন্য নারিকেল গাছের ফলন কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডাবের বিকৃত আকৃতি ও ডাবের খোলের ওপরে ফেটে যাওয়ার জন্যও টাওয়ার দায়ী। সমস্যা খতিয়ে না দেখায় বছরের পর বছর প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতে, এটি এক প্রকার মাকড়ের কারণে হয়ে থাকে। মাকড়ের আক্রমণে কচি অবস্থায় নারিকেলের খোলের ওপর ফাটা ফাটা শুকনো দাগ পড়ে এবং কুঁচকে বিকৃত হয়ে পরিপক্ব হওয়ার আগেই তা ঝরে পড়ে। ফলনে দারুণ ব্যাঘাত ঘটে।

সোর্স :

১
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/11/15/dont-let-public-usb-charging-stations-ruin-your-holiday-travels-officials-warn/#528e5261410c

https://banglatech24.com/0411777/smartphone-battery-charge-myths/

২
https://says.com/my/tech/is-it-true-that-we-need-to-charge-our-phone-and-laptop-for-8-hours-before-first-use

https://youtu.be/ebjMnnjCtew

৩

https://www.cnet.com/google-amp/news/best-usb-c-pd-chargers-for-2020/

https://www.pcmag.com/news/charging-your-phone-overnight-battery-myths-debunked?amp=true

৪
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trickle_charging#:~:text=Trickle%20charging%20means%20charging%20a,being%20drawn%20by%20a%20load

https://www.pcmag.com/news/charging-your-phone-overnight-battery-myths-debunked?amp=true

https://computer.howstuffworks.com/laptop-battery-overcharged.htm

৫
https://www.apple.com/batteries/why-lithium-ion/
https://www.pcmag.com/news/charging-your-phone-overnight-battery-myths-debunked

৬
http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%A9/%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%9C%20%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE

কয়টা কলাতে প্রাণ যায়?

মনিফ শাহ চৌধুরী

আমাদের অনেকেই আজকাল কলার রেডিয়েশন নিয়ে জানার পর হিসেব শুরু করে দিই যে, কয়টা কলা খেলে মৃত্যু হতে পারে।

আমরা শুরুতে ধরে নিই, ৩৫০০ mSv রেডিয়েশন আমাদের মেরে ফেলবে। একটা কলাতে রেডিয়েশন আসে পটাশিয়ামের আইসোটোপ থেকে। সেই হিসেব করে বের করা যায় যে, যথেষ্ট রেডিয়েশন শরীরে নিয়ে মেরে ফেলার জন্য ৩৫ মিলিয়ন কলার প্রেয়াজন।

এখানে, আমরা একটা ব্যাপার মোটামুটি ভুলে যাই তা হলো, পটাশিয়ামের নন-রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপও কম ক্ষতিকর নয়। শরীরে পটাশিয়ামের ডোজ বেড়ে গেলে সেটাকে বলে 'Hyperkalemia'। পটাশিয়াম আয়ন রক্তে বেড়ে গেলে সেটা হৃৎপিণ্ডের পেশির সংকোচনে সমস্যা তৈরি করতে পারে, যার কারণে অস্বাভাবিক হার্টবিট এবং মৃত্যুও হতে পারে। একটা কলায় গড়ে ৪২০ মি.গ্রা.পটাশিয়ামথাকে। সাধারণত দিনে ৪,৭০০ মি.গ্রা. এর বেশি খাওয়া উচিত না। অর্থাৎ, প্রায় এক ডজন কলা।

কিন্তু আমাদের কিডনি যথেষ্ট কর্মঠ। সুস্থ থাকলে এরা অতিরিক্ত পটাশিয়াম খুব সহজেই শরীর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু, একবারে ১৮,০০০ মি.গ্রা. পটাশিয়াম বা ৪২টা কলা খেলে সেই কাজ করা অনেক ক্ষতির হয়ে যায়। রক্তে পটাশিয়াম বাড়ে, ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাবেন।

তো, আমরা যা বুঝলাম, রেডিয়েশনে মরার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন কলা না ঠুসে মাত্র ৪০-৪৫টা কলা ঠুসলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আবার আরেকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, একত্রে এতগুলো কলা খেতে গিয়ে দম আটকে মারা যাবেন না তো?

বল পয়েন্ট কলম কীভাবে কাজ করে?

সোহান

মানুষের হাতে স্মার্টফোন আসার আগ পর্যন্ত তার সর্বাধিক ব্যবহৃত টুল ছিল কলম। কলমের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। তবে এই রংচঙা ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংস্করণ নিঃসন্দেহে বল পয়েন্ট কলম। তা কী করে কাজ করে সেটা সম্পর্কে আজ আমরা জানব।

এই কলমের মেকানিজম জানার আগে এর উৎপত্তির সূত্রপাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত করে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। "প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক" প্রবাদটি অনেক ভালোভাবে খাটে বল পয়েন্ট কলমের সফলতার সাথে। বল পয়েন্টের পূর্বসূরি যে কলমগুলো ছিল, হোক তা ফাউন্টেন পেন, কুইল কিংবা ধাতব কাঠি– সবগুলোই ক্যাপিলারি অ্যাকশন ব্যবহার করে কালি চ্যানেল করত। ডার্ক ইন্ডিয়া ইঙ্ক ব্যবহার করায় তা শুকাতে অনেক সময় লাগত আর তাড়াতাড়ি শুকালে কলম জ্যাম হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেত। এর সাথে সব সার্ফেসে লিখতে না পারা, অসম, এবড়ো-থেবড়ো লেখা আসা আর কালি রিফিল করা সহ নানান রকম জটিলতা দেখা দিত। বাঁশ, পাখির পালক ব্যবহারের অসুবিধা

আশা করি বলা লাগবে না। বল পয়েন্ট কলমের কালি ফুরোতে অনেক সময় লাগা, দাম কম হওয়া, সব সার্ফেসে লিখতে পারা ইত্যাদি সুবিধা তার উত্তরসূরিদের কালের অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। তবে কফিনের শেষ পেরেকটা ঠুকেছে কমার্শিয়াল এয়ারলাইনগুলো। ভাবতে পারেন, "বিমানের সাথে আবার কলমের ব্যবহারের কী সম্পর্ক?" সম্পর্ক একটা আছে। সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফটগুলো যখন একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করে তখনই এক বিশাল সমস্যা দেখা দেয়। কলমগুলো (ফাউন্টেন পেন-কুইল) থেকে তখন অতিরিক্ত পরিমাণে কালি চুইয়ে পড়ত। সেটা কতটা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয় পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়ে, ভাবতেই পারেন। এইসব নানাবিধ কারণ এক্সটার্নাল কালির কলমগুলোকে অবসোলিট (অপ্রচলিত) করে দেয় এবং বল পয়েন্ট কলমের স্বর্ণযুগ আসে পৃথিবীতে।

বল পয়েন্ট কলমের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের এমন একটা যন্ত্র দেওয়া যা যথেষ্ট পুরু কিন্তু দ্রুত শুকাবে এমন কালি কাগজ বা অন্য সার্ফেসে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারবে কিন্তু কলমের ভেতর কালি শুকিয়ে যাবে না।সেটি করতে কোনো আলাদিনের চেরাগ ব্যবহার করা না হলেও ব্যবহার করা হয়েছিল ঘূর্ণায়মান বল, যা জাদুর মতোই কাজ করেছে। বলটি পিতল, ইস্পাত কিংবা টাংস্টেন দিয়ে বানানো হয় সাধারণত। বলটি একাধারে
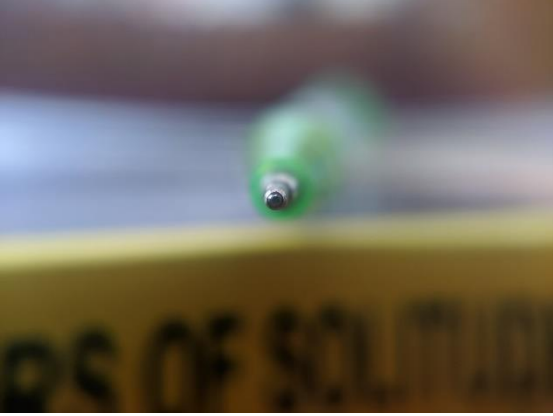
নিরবচ্ছিন্নভাবে কালি শুকানো প্রতিরোধ করার মাধ্যম এবং কাগজ বা অন্য সার্ফেসে কালি ডিস্ট্রিবিউট করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বল আর কালির স্টোরেজ (সাধারণত কলমের শিষ) এর মাঝে সংযোগ তৈরি করতে একটি সকেটের মতো যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয় যার মাঝে বলটি আটকে থাকে। বলটির ব্যাসের চারপাশে অতি সূক্ষ্ম একটি বলয় রয়েছে যা আসলে খালি, এটি বলটির ঘূর্ণনে সহায়তা করে এবং এই খালি ছিদ্রটি দিয়েই কালি নিচে নেমে আসে। কোনো সার্ফেসে এই কলম রেখে একটু চাপ প্রয়োগ করলেই বলটি ঘুরতে শুরু করে এবং গ্র্যাভিটির সহায়তায় তরল কালি বলের গা ঘেঁষে কাগজের সার্ফেসে নেমে আসে এবং বলের গতিপথ যে অভিমুখে, সেই পথে কালি ডিস্ট্রিবিউট হয়। এখানে ক্যাপিলারি অ্যাকশন কলমের কাজ করার পেছনের মূল ড্রাইভিং ফোর্স হলেও প্রধান অনুঘটক হলো গ্র্যাভিটি। আমরা জানি যে, নিচ থেকে ওপরে লেখা যায় না কিন্তু তার সমাধানে প্রেসারাইজড কার্ট্রিজ (কার্তুজ) এর কলম আবিষ্কার হয় যা সকল সার্ফেসে লিখতে পারে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্পেইস প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয়। জিরো গ্র্যাভিটিতে যে বল পয়েন্ট কলম কাজ করে না–এটাও একটা মিথ, কলম ফাংশন করে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে কিন্তু ওপর-নিচ অর্থাৎ উল্টা করে লিখতে পারি না, কারণ তা গ্র্যাভিটির বিরুদ্ধে কাজ করার মতো শক্তিশালী না। এখানে গ্র্যাভিটি প্রভাবক বা অনুঘটক; সরাসরি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। মহাশূন্যে যে জায়গায় গ্র্যাভিটি অনুপস্থিত, সে জায়গায় বল পয়েন্ট কলম পার্ফেক্টলি ফাংশন করে। যে স্পেইস পেনগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোও পৃথিবীতে নিচ থেকে ওপরে লিখতে কাজ করবে কারণ তাতে উচ্চচাপে কালি টিউবে ভরা থাকে, লেখার সময় সেই চাপের কারণে বেড়িয়ে আসে। মহাশূন্যে সেগুলা কেবলই একটা

কলম, অন্য বল পয়েন্ট কলমের সাথে এদের কোনো বিশেষ পার্থক্যই নেই।

বল পয়েন্টের আকার ছোটো হওয়াতে আপনাদের ব্যাপারটা ভিজ্যুয়ালাইজ করতে কষ্ট হতে পারে, তাই আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি যা সহজলভ্য এবং যার মাধমে অতি সহজেই কলমের মেকানিজম বুঝতে পারবেন। সেটি হলো আতর বা রেক্সনার বোতল। বোতল যদি ট্রান্সপারেন্ট এবং আতর

রঙিন হয় তাহলে তা বুঝতে আরও সুবিধা হবে আর রেক্সনার ক্ষেত্রে লিকুইড। দেখবেন, বোতলগুলোর মুখে একটা বলের মতো আটকানো আছে, যখনই বোতলটা শরীরের সাথে লাগিয়ে নাড়াচাড়া করবেন, তখন বলের মুভমেন্ট অনুভব করতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন যে, বল যেদিকে গেছে, কিছু সময়ের জন্য সেই অভিমুখে লিকুইড আতরের ট্রেইল রয়ে গেছে।

টাচ স্ক্রিন কীভাবে কাজ করে?

রওনক শাহরিয়ার

টাচ স্ক্রিনের ইতিহাস পুরোনো। ১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ডে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য প্রথম টাচ স্ক্রিন তৈরি করা হয়এবং ১৯৭৫ সালে কম্পিউটারে টাচ স্ক্রিন তৈরি করা হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো এটি তখনো সহজলভ্য ছিল না।মানুষের ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় কী-বোর্ড ও মাউস বাজার দখল করে নেয়। আগের দশকে কম্পিউটারের এক রেভোল্যুশন ঘটে, যেখানে টাচ স্ক্রিনের ব্যবহারের নতুন দিক উঠে আসে। বর্তমানের প্রায় সকল স্মার্টফোন, ই-বুক রিডার, কিছু এমপি থ্রি প্লেয়ার এই দিকে কাজ করে যাচ্ছে। কিছু ল্যাপটপেও এই পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তবে প্রশ্ন আসে, টাচ স্ক্রিন ব্যবহার আসলে কতটা সহজ এবং এটা কীভাবে কাজ করে?

টাচ স্ক্রিন কী-বোর্ডের থেকে কতটা আলাদা?

একটি টাচ স্ক্রিনকে একটি অদৃশ্য কী-বোর্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটা কীভাবে কাজ করে তা জানার জন্য আগে সাধারণ কী-বোর্ড কীভাবে কাজ করে তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

কী-বোর্ডের প্রতিটা বাটন হলো একটি ইলেক্ট্রনিক সুইচ। যখনই এটা প্রেস করা হয় তখন একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট পূর্ণ হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই কারেন্ট নির্ভর করে কোন বাটনে প্রেস করা হচ্ছে এবং কারেন্টের এই প্রবাহের মাধ্যমে কম্পিউটার বুঝে নেয় যে কী কী লেখা হচ্ছে।

একটু বিস্তারিত বললে বিষয়টা এমন, একটি কী-বোর্ডের মধ্যে দুই লেয়ারের বৈদ্যুতিক পরিচালনে সক্ষম প্লাস্টিক থাকে যার মাঝে একটি অন্তরক প্লাস্টিক থাকে এবং এর মধ্যে একটি ফুটো থাকে। প্রতিটা বাটনেই অন্তরকের মধ্যে এমন ফুটো থাকে। যখন একটি বাটন প্রেস করা হয়, তখন ওপরের পরিবাহী নিচের পরিবাহীর সাথে সেই অন্তরকে থাকা ফুটোর মাধ্যমে পরস্পরকে স্পর্শ করে। তখন একটি কারেন্ট প্রবাহিত হয় যার মাধ্যমে কম্পিউটার জানতে পারে যে কোন বাটন প্রেস করা হয়েছে। আর ছোট্ট একটি স্প্রিং ব্যবহার করা হয় যেন বাটনে প্রেস করার পর আবার সেটা আগের স্থানে ফিরে আসে এবং সার্কিট ব্রেক করে দেয়। টাচ স্ক্রিনও প্রায় একই ধরনের। এটা ঠিক যে এখানে সুইচ ব্যবহার করা হয় না যা স্ক্রিনকে ব্লক
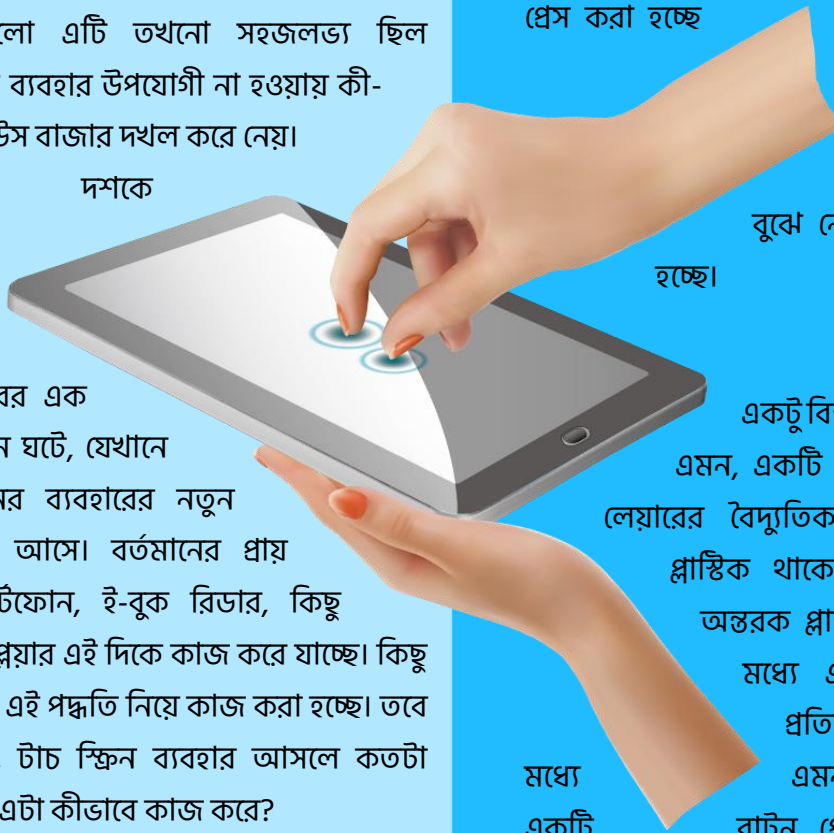
করে দেবে। তবে কীভাবে টাচ করার পরও অদৃশ্যভাবে এটা বুঝে ফেলে?

কীভাবে টাচ স্ক্রিন কাজ করে?

বিভিন্ন ধরনের টাচ স্ক্রিন বিভিন্নভাবে কাজ করে। কিছু স্ক্রিন শুধু একটি আঙুলের অবস্থান বুঝতে পারে এবং দুই আঙুল ব্যবহার করলে সার্কিট কনফিউজড হয়ে যায়, নির্দিষ্ট কোন অংশ প্রেস করা হচ্ছে তা নির্ধারণ করতে। বাকিগুলো সহজেই একটির বেশি আঙ্গুল ধরতে ও নির্ণয় করতে পারে। নিচে কিছু অধিক প্রচলিত টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করা হলো—

রেজিস্টিভ (Resistive):

রেজিস্টিভ টাচ স্ক্রিন হচ্ছে বর্তমানের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযুক্তি। এটি কাজ করে কিছুটা 'স্বচ্ছ কী-বোর্ড'-এর মতো যা স্ক্রিনের ওপর আবৃত থাকে। সেখানে ওপরে বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত একটি নমনীয় প্লাস্টিকের স্তর থাকে, যা নিচের স্তরের একটি অনমনীয় গ্লাসের সাথে একটি অন্তরক মেমব্রেন দ্বারা যুক্ত থাকে। যখনই স্ক্রিনে প্রেস করা হয় তখনই পলিস্টারের স্তর গ্লাসের স্তরের সাথে যুক্ত হয় এবং কী-বোর্ডে প্রেস করার মতো একটি সার্কিট পূর্ণ করে। আর স্ক্রিনে থাকা একটি চিপ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে যেখানে প্রেস করা হয়েছে সেই জায়গার।

ক্যাপাসিটিভ (Capacitive):

এই স্ক্রিনগুলো কয়েক স্তরের গ্লাস দিয়ে তৈরি হয়। ভেতরের স্তরগুলোতে বিদ্যুৎ পরিচালিত হয় এবং বাইরের স্তরেও যেন স্ক্রিন কার্যকরভাবে কাজ করে; যেমনটা দুইটা বৈদ্যুতিক পরিবাহী একটি অন্তরক
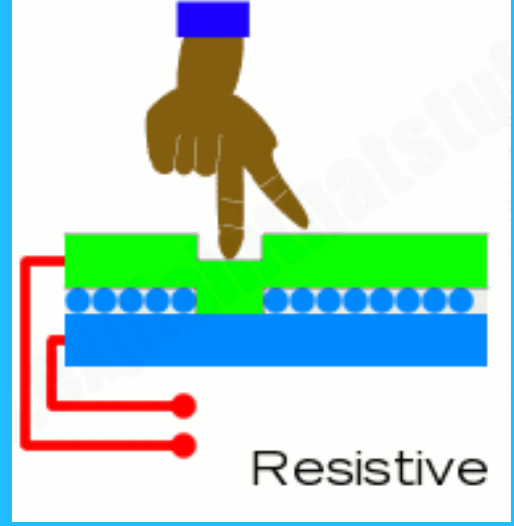
দ্বারা পৃথক হয়ে থাকার ক্ষেত্রে ঘটে। অন্য ভাষায় একে বলা যায় ক্যাপাসিটর। যখনই স্ক্রিনের ওপর আঙুল রাখা হয় তখনই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয় যা আঙুল কোথায় আছে তার ওপর নির্ভর করে। ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিনে একটার বেশি আঙুলের টাচ কাজ করে। এটা অন্য টাচ স্ক্রিনের মতো নয়; কারণ প্লাস্টিকের কোনো স্তর থাকলে স্ক্রিন রেসপন্স করে না।
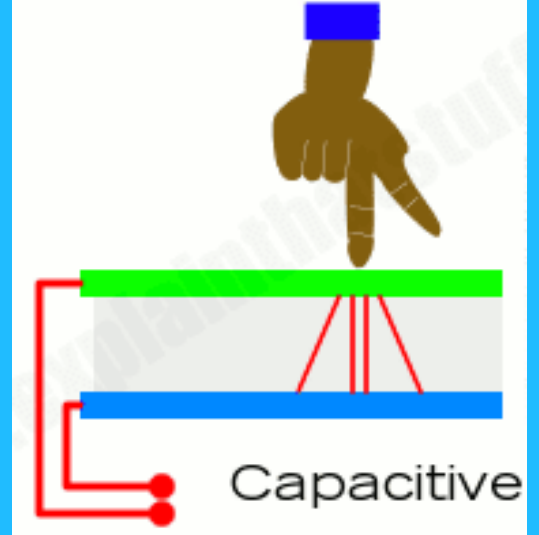
ইনফ্রারেড (Infrared):

ইনফ্রারেড টাচ স্ক্রিনে মূলত ব্যবহার করা হয় এলইডি-এর প্যাটার্ন এবং লাইট ডিটেক্টর ফটো সেল, যা স্ক্রিনের বিপরীত দিকেও থাকে।

এলইডিগুলো থেকে ইনফ্রারেড রশ্মি স্ক্রিনের সামনে জ্বলজ্বল করে, যা দেখতে কিছুটা অদৃশ্য মাকড়সার জালের মতো। স্ক্রিনের কোথাও টাচ করা হলে দুই বা ততোধিক আলোকরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্ক্রিনে একটি মাইক্রোচিপ থাকে। এটি আঙুলের স্পর্শ কোথায় পড়ে আলো চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছে তা নির্ণয় করে। সনি ই-বুক রিডারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
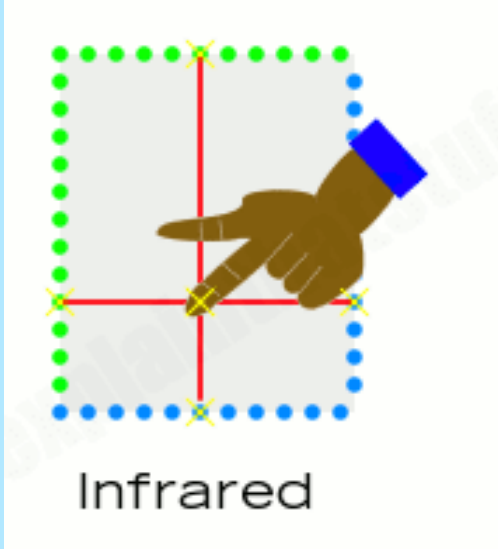
সারফেসের শব্দ তরঙ্গ (Surface Acoustic Wave):

আশ্চর্যজনকভাবে এই টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি আলোর পরিবর্তে শব্দের দ্বারাই আঙুল শনাক্ত করতে পারে। আল্ট্রাসনিক শব্দ তরঙ্গ (মানুষের শ্রবণ শক্তির বাইরে) স্ক্রিনের প্রান্ত থেকে বের হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং এর পৃষ্ঠতল জুড়ে প্রতিফলিত হয়। যখন স্ক্রিনে টাচ করা হয় তখন আঙুলের দ্বারা শব্দ তরঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কিছু শক্তি ক্ষয় হয়। তখন ঠিক কোন বিন্দুতে স্পর্শ করা হয়েছে তা স্ক্রিনে থাকা একটি মাইক্রোচিপ কন্ট্রোলার নির্ণয় করে।

নিয়ার ফিল্ড ইমেইজিং (Near Field Imaging):

তীব্র শব্দ উৎসের কাছে থাকলে দেখা যায় তা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলছে। আমাদের শরীর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা উৎস থেকে আসে। যদি উৎসের কাছাকাছি যাওয়া হয়, তবে এটি শরীরের ওপর আরও বেশি প্রভাব ফেলে। নিয়ার ফিল্ড ইমেইজিং (NFI) ঠিক একইভাবে কাজ করে। যখন স্ক্রিনের কোথাও টাচ করা হয় তখন তা স্ক্রিনের ইলেকট্রিক ফিল্ডকে পরিবর্তন করে, যা দ্রুত টাচ পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারে। এটি অন্য প্রযুক্তি থেকে অনেক শক্তিশালী এবং যে-কোনো খারাপ পরিবেশে কাজ করে। NFI কলম, গ্লাভসসহ জিনিসগুলো শনাক্ত করতে পারে। এই প্রযুক্তি মূলত সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

টাচ স্ক্রিনের সুবিধা:

টাচ স্ক্রিন টেকনোলজির সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো, এটি মানুষ খুব সহজে ব্যবহার করতে পারে। মানুষের যতটুকু তথ্যের দরকার হয়, তার সবটুকু টাচ স্ক্রিন প্রদর্শন করতে পারে এবং যে-কোনো কাজ করতে জটিল প্রসেসে না গিয়ে খুবই সহজ এবং সিস্টেমিক উপায়ে করা যায়। এজন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এর ব্যবহারের প্রচলন চলছে। কারণ কম্পিউটারের স্ক্রিন এবং কী-বোর্ডেও অনেক সময় সমস্যা হয়।

বর্তমানে বেশিভাগ মানুষ অ্যাপল বা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহার করে যেগুলোতে মাল্টি টাচ স্ক্রিন থাকে। এর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো–এই স্ক্রিন তা-ই দেখাতে চেষ্টা করে যা দেখানোর জন্য ইনপুট দেওয়া হয়। যখন ফোন কল করা হয় তখন ডিসপ্লেতে শুধু ০-৯ পর্যন্ত নাম্বরের জন্য কাজ করে। আর মেসেজ টেক্সট করার সময় এটি কী-বোর্ডের জন্য কাজ করে। আবার গেইম খেলার সময় এর অবস্থা আবার পরিবর্তন হয়। টাচ স্ক্রিনগুলো বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যায়, প্রতি মুহূর্তে এটা পরিবর্তিত হয় প্রয়োজন অনুসারে।

আরেকটা বড়ো সুবিধা হলো এতে কোনো মুভিং পার্ট নেই। সাধারণ কম্পিউটারের কী-বোর্ডে শতাধিক পার্টস, সার্কিটস থাকে। তাই কী-বোর্ডে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। স্মার্টফোন, ই-বুক রিডার এবং ট্যাবলেটে টাচ স্ক্রিনের ব্যবহার করা হলেও পিসি ও ল্যাপটপে এখনো টাচ স্ক্রিন খুব কম ব্যবহার করা হয়। তবে মাইক্রোসফট তাদের আপডেটেড অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে টাচ অপশন ও ভার্চুয়াল কী-বোর্ড অপশন রেখেছে। সময়ের সাথে সাথে এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হচ্ছে, যার কারণে প্রচলিত ৬০ হার্জের টাচ রেসপন্সের বাইরে

৯০/৯২০/৯৪৪/২৪০/২৭০ হার্জ পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে যা অত্যন্ত ফাস্ট ও স্মুথ এক্সপেরিয়েন্স দেয়। সময়ের সাথে সাথে এই প্রযুক্তির আরও উন্নত সংস্করণ আসবে এবং এটি ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি।

সোর্স:

https://www.explainthatstuff.com/touchscreens.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen

শূণ্যস্থানে নিউট্রিনো কি আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলে?

নাঈম হোসেন ফারুকি

উত্তর হচ্ছে, না।
২০১১ সালে CERN এর OPERA experiment -এ এরকম দাবি করা হলেও ২০১২ OPERA নিজেরাই তাদের গবেষনা পত্র আপডেট করে জানিয়ে দেয় যে তাদের হিসাবপত্রে ভুল ছিলো। নিউট্রনের ভর সামান্য হলেও স্থিরভর শূণ্য না। সেক্ষেত্রে কোনো মতেই সেটা স্থিরভরহীন কণা অর্থাৎ ফোটন বা আলোর চেয়ে বেশি দ্রুতিতে যেতে পারে না।

এখন যদি বলা হয়, শূন্যস্থানে কার বেগ বেশি? ইলেকট্রনের, প্রোটনের নাকি নিউট্রিনোর?
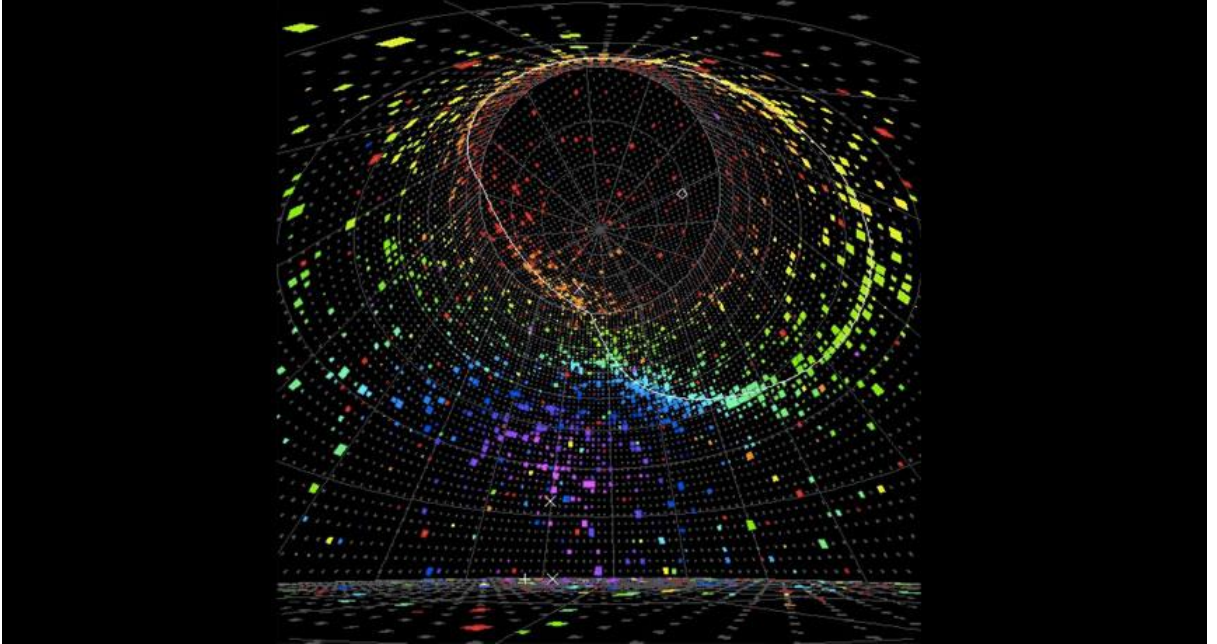
অর্থহীন প্রশ্ন। যে কোন কণার দ্রুতি আলোর যত খুশি কাছাকাছি হতে পারে। শক্তি দিলে, ত্বরণ পাবে, দ্রুতি হবে। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে প্রোটনের বেগ আলোর ৯৯.৯৯৯৯৯% এরও বেশি নেওয়া যায়।

কিন্তু স্থির ভরযুক্ত কাউকে ত্বরণ দিয়েও আলোর দ্রতি কখনো টাচ করানো যায় না। ক্রস করার তো প্রশ্নই আসে না। তবে আলোর দ্রুতির যত খুশি কাছে নেওয়া যায়।

https://www.symmetrymagazine.org/article/inside-the-large-hadron-collider

দুইটা ভেক্টরের ডট গুণনে cosθ আসে কেন?

স্বপ্নিল আচার্য্য

এই প্রশ্ন থাকে অনেকেরই। তো চলুন আজকে সেটার একটা সহজ ব্যাখা করা যাক...

ধরি, কার্তেসিয়ান তলে a ও b দুইটা ভেক্টর। a ভেক্টরের সাথে x অক্ষের ধনাত্মক দিকের কোণ α এবং b ভেক্টরের সাথে x অক্ষের ধনাত্মক দিকের কোণ β এবং a ও b এর মাঝের কোণ, θ = β−α

Let, a = (x1, y1)
= (acosα, asinα)

Let, b = (x2, y2)
=(bcosβ, bsinβ)

আমরা a ও b ভেক্টরকে অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশে ভেঙেছি। তাহলে, x আর y অক্ষ বরাবর উপাংশগুলোর গুণফল থেকেই আমরা তাদের Dot Product পেয়ে যাব।

তাহলে,
a · b
= x1x2 + y1y2
= abcosαcosβ + absinαsinβ
= ab(cosαcosβ + sinαsinβ)
= abcos(β−α)
= abcosθ
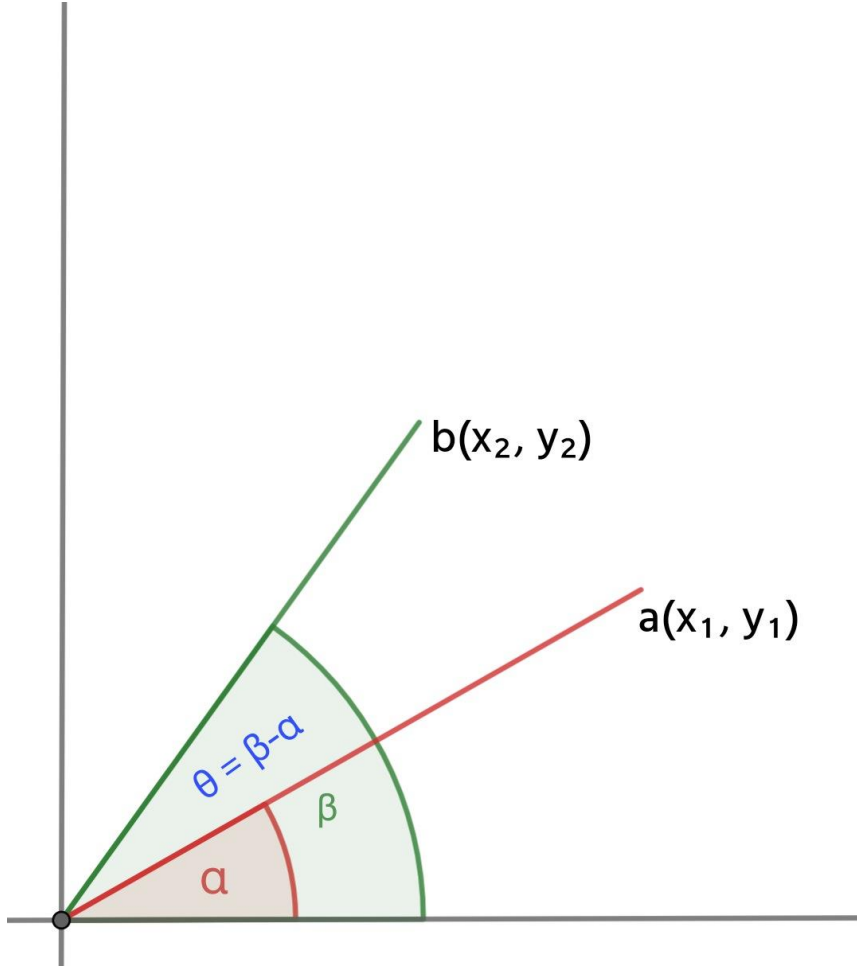
সুতরাং, আমরা পেয়ে গেছি, a ও b এই দুই ভেক্টরের Dot Product হবে abcosθ ।

ঘুমাইতে দিমু না

নাঈম হোসেন ফারুকী

১৯৪০ সাল 🥶
সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা টেস্ট ফ্যাসিলিটি 🥶🥶

৫ বন্দির ওপর একটা চরম অমানবিক পরীক্ষা চালানো হয়। 🥶🤯😰

ত্রিশ দিন তাদের ঘুমাতে দেওয়া হয় না। 😦😦😦
প্রমিজ করা হয়–ত্রিশ দিন না ঘুমালে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। ☹️

নয় দিনের মাথায় এক বন্দি অনবরত চিল্লাতে থাকে। চিল্লাতে চিল্লাতে ভোকাল কর্ড ছিঁড়ে ফেলে। 😯😳😦

আরেকজন যখন চিল্লানো শুরু করে, বাকিরা নিজেদের মলমূত্রকে পেস্ট বানিয়ে সেটা দিয়ে কাগজ লাগিয়ে জানালা ব্লক করে দেয়। 😰😫

কিছুদিনের মধ্যে তারা নিজেদের হাত-পা কাটাকাটি শুরু করে। 😭😢😩। পেট ফুঁড়ে ফেলে। 😰😥😨

...
...
...

থামেন ভাই, আর না বলি।
ওপরের গল্পটা ভুয়া।
ক্রিপিপাস্তায় প্রচারিত আরবান লেজেন্ড।
সত্যি কিছু না।
আজকাল ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলোতে খুব চলছে এসব 🙃। তাই কোনো তথ্য দেখে সরাসরি বিশ্বাস করার পরিবর্তে একটু ভেবে দেখুন, একটু খোঁজ করে দেখুন, একটু যাচাই করুন, তারপর বিশ্বাস করুন।

অ্যাড্রিক অ্যাজিবো সিজলা

নাঈম হোসেন ফারুকী

মূল গল্প:
নাইজেরিয়ার ইবাদান শহরে ১৯৩০ সালে এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে এই মহামানব বিজ্ঞানীর জন্ম। বাবা জ্যাম্মিয়ান সিজলা ছিলেন হসপিটালের ঝাড়ুদার। মানুষের রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছেন। পণ করেন, যেভাবেই হোক বড়ো হতে হবে, দুখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

অ্যাজিবোর পুরোটা জীবন বলা যায় কঠোর পরিশ্রমের একটা উপাখ্যান। ঘুমাতেন মাত্র ৫ ঘণ্টা। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র ছিলেন। সেই সময় পিয়াম নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো মাছি নাইজেরিয়ায় মহামারি ডেকে এনেছিল। এই মাছির লালার সাথে মিশে থাকত ঘাতক প্যাম্পার্স জ্বরের জীবাণু। এই রোগ হলে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে জ্বর আসত মানুষের। মাথা অসম্ভব ভার হয়ে যেত। তিন দিনের মাথায় মারা যেত চল্লিশ ভাগ মানুষ।

সিজলা কাজ করছিলেন এই রোগের ভ্যাক্সিন নিয়ে। নতুন যে ভ্যাক্সিন তিনি আবিষ্কার করেন সেটা কাজ করার সম্ভাবনা ছিল ৫০-৫০। হতে পারে ভ্যাক্সিন নিলে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে। হতে পারে তাদের শরীরে আসলেই অ্যান্টিবডি জন্মাবে। কেউ ঝুঁকি নিতে রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত সিজলা নিজ দেহে পুশ করলেন ভ্যাক্সিন।

তাঁর ভ্যাক্সিনে সামান্য ভুল ছিল। তাই এক সপ্তাহের মাথায় তিনি জ্বরে পড়লেন। দশ দিনের মাথায় মৃত্যু। পরে নেচার জার্নালে প্রকাশিত তাঁরই গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন প্যাম্পার্স জ্বরের সত্যিকারের প্রতিষেধক।

ডিবাঙ্ক:
ওপরেঅ্যাড্রিক অ্যাজিবো সিজলা নামের নাইজেরিয়ান বিজ্ঞানী নিয়ে যেটা পড়লেন সেটা নিয়ে এবার কিছু কথা :

১. নামটা আসলেই আফ্রিকান। তবে এই নামে কোনো জীববিজ্ঞানী আছে বলে জানা নেই।

২. নাইজেরিয়ায় আসলেই ইবাদান নামে একটা শহর আছে। সেখানে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে।

৩. পিয়াম মাছি থাকে ব্রাজিলে। প্যাম্পার্স জ্বর নামে কোনো অসুখ আছে বলে জানা নেই। বাচ্চাদের প্যাম্পার্সের সাথে মিলিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে।

৪. নিজ দেহে ইঞ্জেকশন ঢোকানোর ঘটনা আগেও ঘটেছে। এরকম হিরোইক বিজ্ঞানী আছেন। তবে কাল্পনিক সিজলা সেরকম নন।

৫. ছবিটা সত্যিকারের এক নাইজেরিয়ানের ছবি। তাঁর নাম Babatunde Kwaku Adadevoh এবং তিনি নাইজেরিয়ার শীর্ষস্থানীয় মেটাবলিক চিকিৎসক ছিলেন।

এবার আসা যাক অন্য কথায়। কীভাবে ভালো স্বাদের গুজব রান্না করা যায়?

এর জন্য :
১. বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প লিখতে হবে।
২. একটা ইমোশনাল কাহিনি লিখতে হবে
৩. একজন নায়ক থাকবে।
৪. বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু ভুয়া দুয়েকটা তথ্যসূত্র যোগ করে দিতে হবে।
এজন্য কোনো কিছু বিশ্বাস করার আগে সেটা নিয়ে একটু খোঁজ করা উচিত। দেখলেই বিশ্বাস করে ফেলা উচিত নয়। সেটা নিয়ে একটু গুগল করা বা সংযুক্ত লিঙ্ক আসলেই বিশ্বাস যোগ্য কি না সেটা চেক করা।

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক লিঙ্ক:
https://howtowritelike.com/2019/02/22/how-to-write-a-fake-memoir/
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2015.256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918318210

ডোরেমনের পেছনে সতিকারের ঘটনা

নাঈম হোসাইন ফারুকী

নবিতা সত্যিকারের এক জাপানি ছেলের নাম।
তার মনে অনেক দুঃখ ছিল।
তাকে কেউ ভালোবাসত না। 😔
তার সিজোফ্রেনিয়া ছিল। 😔😔
এই অবস্থায়, সবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের একাকিত্ব কাটাতে সে মনে মনে ডোরেমন চরিত্রটা তৈরি করে। 😍

তাই ডোরেমন হয়ে ওঠে তার নিত্যদিনের সঙ্গী। সে যেসব রিয়েল লাইফে বানাতে পারত না, ডোরেমনের সাহায্যে সে কল্পনায় সেসব বানায়। 🤔😎

কিন্তু ১৬ বছর বয়সে ফ্যামিলি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার তার ঘাড় থেকে ডোরেমনের ভূত তাড়ায়। □

তাই নবিতা বাবার বন্দুক দিয়ে সুইসাইড করে।🙁😥😫😭

এরকম একটা নিউজ ডোরেমনের পেছনের সত্যি ঘটনা হিসাবে বহু দিন ধরে ভাইরাল হয়েছে।
এটা পুরোপুরি মিথ্যা। এ গল্পের কোনো ভিত্তি নেই।
ডোরেমন মাঙ্গা সিরিজের প্রতিটা চরিত্রই Hiroshi Fujimoto এবং Motoo Abiko এর কাল্পনিক চিন্তা থেকে তৈরি।
ফেইক নিউজ ছড়ানোর এক্সারসাইজ হিসাবে এটা ছড়ানো হয়।
ইমোশনাল জিনিস জনগণ একটু বেশি খায়, তাই এসব খুব ছড়ায়।

তথ্যসূত্র:
https://www.procaffenation.com/story-behind-cartoon-nobita-and-doraemon/

The best lies are the ones shrouded in truth

সোয়েব পারভেজ জিম

এই পোস্টের সবচেয়ে চমকপ্রদ information-টাই হয়তো নতুন তিনজন বাচ্চার চেহারা deceased তিনজনের অবিকল। তবে এই information এর কোনো রেফারেন্স কোথাও পাওয়া গেল না।

chris and lori triplets লিখে search দিলে বেশ কিছু article পাওয়া গেলেও কোথাও চেহারা অবিকল একই হওয়ার কথাটি উল্লেখ ছিল না। তাই হয়তো এই তথ্যটাই ভুয়া। কেননা দুর্ঘটনার পরে তাদের triplets হতে পারে, কিন্তু তাদের চেহারা আগের সন্তানদের সাথে মিলে যাবে! এটা বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয়।

Related articles-

https://www.rebeccadavi.com/single-post/miracletriplets

https://www.littlethings.com/coble-triplets-vcom/2

https://www.ocregister.com/2011/04/18/family-who-lost-3-children-in-crash-reach-settlement-with-caltrans/

https://www.facebook.com/groups/bcb.science/permalink/3432199176863727/

ঈগলের দুঃখের জীবন

নাঈম হোসাইন ফারুকী

ঈগল অনেক বছর বাঁচে। ৭০ বছরের মতো 😍

কিন্তু ৪০ বছর বয়স হলে তাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 😐

এই সময় তার থাবা অথর্ব হয়ে যায়। 😵

তার ঠোঁট বাঁকা হয়ে যায় 😐

তার পাখা থ্যাত্থ্যারা হয়ে যায় 😐

তখন তার হাতে দুইটা অপশন থাকে। মরো নাহলে খুব কষ্টের একটা কাজ করো। 😨

ঈগল সেকেন্ড অপশটা বেঁছে নেয়।

সে উঁচু একটা পাহাড়ে উড়ে যায়। তার নিজের ঠোঁট পাথরে বাড়ি মেরে মেরে ভাঙে 😵

আবার যখন নতুন ঠোঁট হয়, সে সেই ঠোঁট দিয়ে নিজের থাবার নখ তুলে নেয়। 😨

এরপর যখন নতুন নখ হয়, সে পুরানা থ্যাত্থারা পালক তুলে ফেলে। 👀

এরপর নতুন পালক, নখ আর ঠোঁট নিয়ে ঈগল উড়াল দেয়। 🐣

এইটা পুরাপুরি ভুয়া গল্প।

ঈগল ৩০ বছরের মতো বাঁচে। ৭০ না।

তার ঠোঁট কেরাটিন দিয়ে তৈরি। সে নিয়মিত ঘষে এটাকে শার্প রাখে। এইভাবে ঠুকরে ঠোঁট ভাংলে সে না খেয়ে মরবে এটা নিশ্চিত। তার থাবার নখও কেরাটিন দিয়ে তৈরি, এরকম অথর্ব হয়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। আর কোন পাগল পাখি নিজের নখ এভাবে তুলতে গেলে রক্তক্ষরণে মারাও পরতে পারে, তাকে অবশ্যই আমাদের থামানো উচিত।

আর পালক নিজে থেকেই কিছুদিন পর পর পরে আর নতুন করে গজায়।

গল্পের মোরাল: এই গল্প পড়ে কেউ যদি নিজের চুল নখ টেনে ছিড়তে চায়, দাঁত হাতুড়ি মেরে ভাংতে চায়, তাকে মানসিক ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত।

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reptilegardens.com%2Fscales-and-tales%2Farticle%2Fthe-real-story-of-an-eagle%3Ffbclid%3DIwAR25x0ebe-c9UEnpDMAJAekr655TQm2KS_LeCj3zt1kxthIeVP80dS_BrKA%23%3A%7E%3Atext%3DGenerally%2520speaking%252C%2520eagles%2520live%2520around%2Cmust%2520make%2520a%2520hard%2520decision&h=AT3JcYlkvmDQIzzxTS8myA60KDNCBmfyzjp6wZ1OKEDcoB3eg0gHSmkPKvU-SaG3rAUV0fOW9wHZ7IQ9ul1FAPYhErFp_KHt41RI7weT8R-lHMgTmM3zN5DDED0FLA4GeMb23IC5Czc6iDe_dqaT_Qo

তেলাপোকা মনুষ্যবিদ্বেষী

রুদ্র অরণ্য

তেলাপোকাকে স্পর্শ করার পর পালিয়ে যাওয়ার কারণ মূলত এটা তাদের সরল নার্ভাস সিস্টেম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আর তারা অন্য প্রাণীদের মতোই বাঁচতে চায়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আমাদের ছায়া দেখলে পালিয়ে যায়। এছাড়া আমরা যখন কোনো তেলাপোকাকে স্পর্শ করি তখন আমাদের শরীরে থাকা তেল ওই তেলাপোকার গায়ে লেগে যায়। আমাদের কাছে এই তেল তেমন সমস্যার মনে না হলেও তেলাপোকাদের জন্য এটি বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তেলাপোকারা সাধারণভাবে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে না, যদি তাদের শরীরে বাইরের কোনো তরল পদার্থ লেগে থাকে। এছাড়া তাদের অ্যান্টেনা খাবারের ঘ্রাণ নিতে সাহায্য করে। কিন্তু এই তেল লেগে থাকার ফলে তাদের ঘ্রাণ নিতে অসুবিধা হয়। ফলে খাবার খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা বিবর্তনের ফলে সময়ের সাথে নিজেদের পরিষ্কার করতে শিখে গেছে। মূলত তারা মুখের মাধ্যমে তাদের অ্যান্টেনা এবং পা পরিষ্কার করে। দৌড়ানোর সময়ও তারা এটা করতে পারে। কিন্তু এতে তাদের দৌড়ানোর গতি কমে যায়। ফলে এক জায়গায় স্থিরভাবে থাকা অবস্থায় তারা এই কাজটি করতে পছন্দ করে। কিন্তু অবশ্যই তারা লক্ষ রাখে যে সেই অবস্থায় তারা সুরক্ষিত আছে কি না। অন্যান্য পোকা যেমন : মাছি, পিঁপড়া এদের ক্ষেত্রেও একই ধরনেনের কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়।

References:

https://pestlockdown.com/are-cockroaches-disgusted-by-humans
https://en.wikipedia.org/wiki/Cockroach
https://www.huffpost.com/us/entry/2631956/

ছোটো বিড়াল

নাঈম হোসেন ফারুকী

এই বিড়াল ৭ সে.মি. লম্বা ছিল না, সেটা ছিল এর উচ্চতা। এ ছিল লম্বায় প্রায় ১৯ সে.মি. (৭.৫ ইঞ্চি)। বিড়ালের বাচ্চার সমান, কিন্তু মোটেও তেলাপোকার সমান নয়। ছবিটা রিয়েল নয়, বোঝাই যাচ্ছে। গিনেজ বুকের সাইটে কোনো ছবি নেই।

এ বিড়াল মারা যায় ১৯৯৭ সালে, ৬ বছর বয়সে।

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/smallest-cat-ever

টেস্টিং সল্ট কতটা নিরাপদ?

তানভীর রানা রাব্বি

টেস্টিং সল্ট, যেটাকে MSG (Monosodium Glutamate) বলে আর এর e-number হলো E621।

তো, তারপর আসা যাক মূল কথায়। MSG নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে বেশ বহু বছর ধরেই যে, এটা asthma, headaches এমনকি brain damage করতে পারে বলে ধারণ করা হয়। যদিও কিডনি ড্যামেজের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় না, তবে বাংলাদেশে তো গুজব ছড়ায় দ্রুত, তাই বাংলাদেশের সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্টে সেই সাথে কিডনি ড্যামেজও সংযুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ অফিসিয়াল সোর্স বলে, পরিমাণমতো MSG নিরাপদ। কিন্তু সেটার দিকে না চোখ না দিয়ে চলুন আমর দেখি MSG এর কার্যকলাপ।

MSG কী?

MSG বা Monosodium Glutamate বা E621, যেটাই বলি না কেন–এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুটামেট বা গ্লুটামিক অ্যাসিড থেকে উদ্ভূত, যেটা আসলে প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া অ্যামাইনো অ্যাসিড। গ্লুটামিক অ্যাসিড একটি non-essential অ্যামাইনো অ্যাসিড, অর্থাৎ শরীর এটা উৎপাদন করতে পারে তাছাড়া এই অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রায় সব খাবারেই পাওয়া যায়।

MSG আসলে সাদা রঙের ক্রিস্টালাইন (স্ফটিক) পাউডার যেটা দেখতে লবণ বা চিনির মতো। এটা সোডিয়াম এবং গ্লুটামিক অ্যাসিড একত্রিত করে তৈরি, যেটা বাজারে সোডিয়াম লবণ নামেও পরিচিত। MSG-এর গ্লুটামিক অ্যাসিড স্টার্চ ফার্মেন্টেশন করে তৈরি করা হলেও এটা বিভিন্ন খাদ্যে উপস্থিত গ্লুটামিক অ্যাসিডের মতোই।

যদিও MSG-তে থাকা গ্লুটামিক অ্যাসিড শরীর সহজেই শোষণ করতে পারে, কারণ এটা যেহেতু স্টার্চ ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি, তাই এটা কোনো বড়ো প্রোটিন অণুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যার ফলে শরীরকে সেই প্রোটিন অণু আলাদা করে ভাঙতে হয় না, সহজেই শোষিত হয়ে যায়।

funfact: জাপানে সবচেয়ে বেশি MSG ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

MSG কি ক্ষতিকর?

গ্লুটামিক অ্যাসিড মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। যেহেতু এটি একটি excitatory নিউরোট্রান্সমিটার, যার মানে এটি তার সংকেত

রিলে করার জন্য স্নায়ুকোষকে উদ্দীপিত করে। কিছু লোক দাবি করেন যে, মস্তিষ্কে অতিরিক্ত গ্লুটামেট স্নায়ুকোষে অতিরিক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যার ফলে MSG কে এক্সাসিটোটক্সিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্সাসিটোটক্সিন: যেসকল নিউরোট্রান্সমিটার নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হলে নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতি করতে পারে।

১৯৬৯ এর দিকে এক গবেষণায় দেখা যায় যে, সদ্য জন্ম নেওয়া বা নবজাতক ইঁদুরের মধ্যে MSG-এর বড়ো ডোজ ইনজেক্ট করলে ক্ষতিকর স্নায়বিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

এটা সত্য যে গ্লুটামেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে, তাছাড়া MSG বড়ো ডোজ রক্তে গ্লুটামেটের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, MSG-এর একটি মেগাডোজ রক্তে গ্লুটামেটের মাত্রা 556% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। তবে খাদ্যে পরিমাণমতো গ্লুটামেট মস্তিষ্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না যেহেতু এর অল্প পরিমাণ blood–brain barrier (BBB) অতিক্রম করতে পারে না। (verified)

সামগ্রিকভাবে, স্বভাবিক পরিমাণে MSG এক্সাইটোটক্সিন হিসাবে কাজ করে এমন কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। সেজন্য বলা যেতে পারে, পরিমাণমতো MSG বা Monosodium Glutamate বা E621 খাওয়া মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি করে না।

তাহলে কি সব ভুল?

না, এখানে কিছু কথা আছে। কিছু মানুষ MSG খাওয়ার ফলে কিছু বিরূপ প্রভাব অনুভব করতে পারে। এটাকে 'Chinese restaurant syndrome' বা MSG symptom complex বলে।

একটা গবেষণায় দেখে গেছে যে, যারা নিজেরা বলেছে তাদের MSG-র জন্য স্বাস্থ্যে বিরুপ প্রভাব পড়েছে তাদের মধ্যে হয় কেউ ৫ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশি MSG গ্রহণ করেছে, অথবা প্লাসিবো ইফেক্টের ফল। যেখানে ৩৬.৯% MSG আর ২৪.৬% প্লাসিবো, বাকিটা অন্য কারণে।

থ্রেসহোল্ড ডোজ বা যতটুকু নিলে বিরূপ লক্ষণ দেখা যাবে সেটা হলো প্রতি খাবারে প্রায় ৩ গ্রাম। আর মনে রাখবেন, প্রতি খাবারে ৩ গ্রাম কিন্তু অনেক বেশি। যদি আমাদের দেশের কথা চিন্তা করেন, তাহলে মিলিগ্রাম পর্যায়ে থাকে, যদিও এখন অনেকে MSG বর্জন করছেন।

এখন MSG-এর থ্রেসহোল্ড ডোজ ঠিক কোন কারণে এরকম বিরূপ প্রভাব ফেলে সেটা এখনও আনক্লিয়ার। তবে কিছু গবেষক অনুমান করেন যে MSG-এর বড়ো ডোজ blood–brain barrier (BBB) অতিক্রম করতে পারে এবং নিউরনের সাথে ইন্টারেক্ট করে মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে।

কেউ কেউ দাবি করেন যে, MSG কিছু মানুষের মধ্যে অ্যাজমা অ্যাটাকও ঘটায়। তো, ৩২ জনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৪০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী MSG-এর বড়ো ডোজের কারণে অ্যাজমা অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন। তবে পরে আর কোনো গবেষণায় স্পেসিফিকভাবে এমনটা

হতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ MSG আর অ্যাজমা অ্যাটাকের সাথে কোনো সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

ওজন বৃদ্ধির সাথে অনেকে MSG-কে দায়ী করে, কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ মেলেনি।

আপনি কাকে জিজ্ঞাসা করেছেন তার ওপর নির্ভর করে MSG পুরোপুরি নিরাপদ না কি বিপজ্জনক

নিউরোটক্সিন। তবে সত্যটা এর মাঝে বরাবর। গবেষণা নির্দেশ করে যে MSG মডারেট পরিমাণে খাওয়া নিরাপদ। তবে, মেগাডোজ ক্ষতি করতে পারে। তবে আপনার MSG খেলে যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহলে আপনার উচিত খাওয়া বন্ধ করা। তাছাড়া এমনিতেও টেস্টিং সল্ট বা MSG ফাস্টফুড/Junk Food এ ব্যবহার করা হয়। সেগুলা এমনেতেও পরিহার করা উচিত।

ভূতুরে ওয়ালপেপার ডিবাঙ্ক

তানভীর রানা রাব্বি

মে-জুন মাসের দিকে একটা ওয়ালপেপার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ মাতামাতি হয়েছিল। মূলত, ৩১শে মে বিখ্যাত লিকার Ice Universe এর একটা টুইটের মাধ্যমে জিনিসটা ভাইরাল হয়।

সমস্যাটা কি সত্য?

হ্যাঁ, এটা আসলেই সত্য। কিন্তু এর পেছনের কারণ হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের গুগল কালার ইঞ্জিন। ডিসপ্লে প্যানেলের পিক্সেল বার্নিং না। সম্পূর্ণ সফট্ওয়্যারের কালার প্রসেসিং ইস্যু (তাই বলে শুধু GPU এর না)। স্যামসাং আর গুগল পিক্সেল পার্টিকুলারলি তাদের ফোনের অ্যান্ড্রয়েডে গুগলের কালার ইঞ্জিন ব্যবহার করে। সেজন্য সেসব ডিভাইসে প্রবলেম হয়েছে। তাছাড়া গুগলের কালার ইঞ্জিন যেসব কোম্পানির ফোন ব্যবহার করে সেগুলোতেই সমস্যা হবে। আর OnePlus, iPhone সহ বেশ কিছু ডিভাইসে কাজ করেনি কেন?

প্রথমত, OnePlus কিন্তু CyanogenMod কাস্টম রম থেকে ইন্সপায়ার্ড, আর সেখানকার ডেভেলপারকে নিয়ে করা। CyanogenMod এর মতো OnePlus এরও কালার ইঞ্জিন মোডিফাই করা, সেজন্য কোনো সমস্যা হয়নি। আর iPhone XR-এ টেস্ট করা হয়েছে। সেটা iOS হওয়ায় সেটায় সেই সমস্যা হয়নি। আবার, Huawei Mate 20 Pro-তে চেষ্টা করা হয়েছে। হয়তো EMUI এরও কালার ইঞ্জিন আলাদা, তাই কিছু হয়নি। কিন্তু যখনই স্যামস্যাং ফোনে দেওয়া হয়েছে (স্যামস্যাং গ্যালাক্সি নোট ১০), তখনই শুরু হয়েছে কালার রি-ক্রিয়েটিং লুপ। যাহোক, এখন দেখা যাক এর পেছনের সবকিছু। তবে তার আগে ওয়ালপেপার সম্পর্কে জেনে আসি।

ওয়ালপেপার:

ভাইরাল হওয়া ওয়ালপেপারটি কিন্তু ডিজিটালি জেনারেটেড কোনো ওয়ালপেপার নয়। এটা আসলে Nikon D850-এ তোলা Glacier National Park এর Saint Mary Lake এর একটা ছবি থেকে ক্রপ করে নেওয়া। এটা সেট করার ফলে ক্র্যাশ করার কারণ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করা যাক।

কালার:
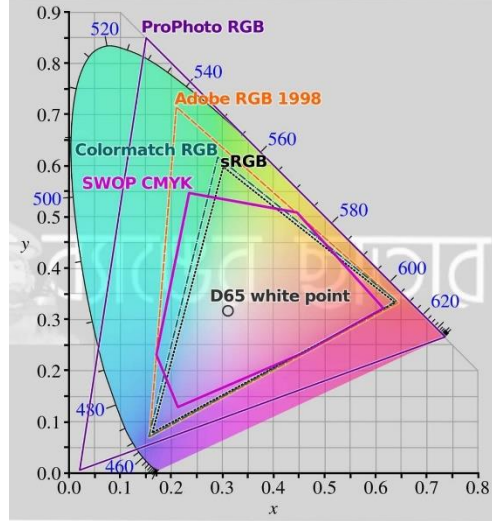
প্রথমে একটু কালার নিয়ে কথা বলা যাক। ই উপরের চিত্রেরবেন এখন জনপ্রিয় একটা কালার মডেল হচ্ছে RGB (Red, Green, Blue; যেহেতু এই তিনটা রং দিয়েই সব রং তৈরি করা সম্ভব)। আর সকল ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসসহ প্রচলিত ফটোগ্রাফি ডিভাইস এই RGB কালার মডেল ব্যবহার করেই কাজ করে। তো এই RGB কালার মডেলের আবার কয়েকটা কালার প্রোফাইল আছে। যেটাকে ICC (International Color Consortium) প্রোফাইলও বলা হয়। এই কালার প্রোফাইল মূলত তথ্যের ডেটা, যেটা ডিভাইসের কালার ইনপুট-আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করে। RGB-তে প্রচলিত ২০টির মতো কালার প্রোফাইল আছে। কিন্তু আজকে আমরা কথা বলব sRGB আর ProPhoto RGB নিয়ে।টোআরও ই আছে যেটা ছবিতে দেখতে পারছেন

কালার প্রসেসিং:

এখন আসি এসবের কাজ কী? তো Android-সহ অনেক ডিভাইস প্রাইমারিলি sRGB-ই ব্যবহার করে। ওয়েবে থাকা সব মিডিয়াও sRGB-তেই দেখি।, তো যখন আমরা কোনো sRGB কালার প্রোফাইলে কোনো কিছু দেখি তখন সেটা ওই স্পেইসে অবস্থিত কালার দিয়েই তৈরি। আমাদের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত ছবি মূলত অনেকগুলো পিক্সেলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটা পিক্সেলে একসাথে একটা কালারই শো করতে পারে। যখন আমরা Android ফোনে কোনো ফটো দেখি, তখন একটা পিক্সেলের কথা ধরলে, সেটা তখন sRGB কালার স্পেইসের যে-কোনো একটা কালার দেখাবে। এভাবেই মূলত ফোনের ডিসপ্লেতে কালার শো করে অর্থাৎ, যেহেতু Android শুধু sRGB কালার দেখাতে পারে, সেহেতু যখন কোনো ছবি দেখানো হয়, তখন কালার ইঞ্জিন সেই হিসেবে ফোনের ডিসপ্লের পিক্সেলগুলোকে কালার শো করতে বলে যার ফলে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখতে পারেন।

সমস্যা কোথায়?
এবার মনে হচ্ছে, সমস্যা কোথায়? সমস্যাটা আসলে ছবিতে। যে মূল ছবিটা তুলেছে, সে আসলে ছবিটা saturated করতে কালার প্রোফাইল sRGB থেকে ProPhoto RGB -তে পরিবর্তন করেছে। ProPhotoউপরের ই RGB কালার স্পেইস আসলে অনেক বড়ো। সেটা আরও বেশি কালার দেখাতে পারবে যেটা sRGB পারে না। তো দেখা গেছে যে ProPhoto RGB কালার প্রোফাইলের ছবি sRGB-তে প্রসেসে প্রবলেম হয়। কিন্তু Android-কে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যে এটা যে-কোনো কালার প্রোফাইলের কালারই শো করতে পারে। এর জন্য সে সেই কালার প্রোফাইলকে sRGB-তে কনভার্ট করে নেয়। মানে ProPhoto RGB- -কে Android শো করতে পারে sRGB- -তে কনভার্ট করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এই ওয়ালপেপার ফটোর ক্ষেত্রে প্রবলেমটা [হয়] আসলে কনভার্সনের সময়।

চলুন, একটু গভীরে যাই। Davide Bianco (@HrX2003) -এরর তথ্যমতে, এই ওয়ালপেপার সেট করার ফলে ফোন ক্র্যাশ শকরার জন্য দায়ী একটা মাত্র পিক্সেল।

গুগল কালার ইঞ্জিন এই পিক্সেলের কালার sRGB- -তে কনভার্ট করার সময়েই ঝামেলায় পড়ে। কারণ ওই পিক্সেলে থাকা কালারে Luminance (নির্দিষ্ট দিকে প্রতি ইউনিট ক্ষেত্রফল থেকে নির্গত হওয়া আলোর তীব্রতা)। Luminance ব্যাপারটার জন্য মানুষের চোখ রেড কালার টোন থেকে গ্রিন কালার টোন ভালো দেখে। আবার ব্লু থেকে রেড কালার টোন বেশি দেখে। গুগল কালার ইঞ্জিনের চালিত Android পিক্সেলের luminance ঠিক হয় নিচের ফমুর্মুলা দিয়ে :

0.2126×রেড+0.7152×গ্রিন+0.0722×ব্লু

যেহেতু, প্রতিটি RGB পিক্সেল ডিভাইসে 8 (আট)-বিটের luminance ভ্যালু 0 থেকে 255 -এর মধ্যে হতে পারবে। এখানে রেড, গ্রিন, ব্লু' -র প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ ভ্যালু 255 পর্যন্ত হতে পারবে। আমরা যে পিক্সেলকে এতক্ষণ দোষারোপ করছিলাম সেটা আসলে রেড, গ্রিন, ব্লু তিনটারই হাই ভ্যালুতে ব্যবহার করে। হিসেবমতে, ওই নির্দিষ্ট পিক্সেলটির রেড ভ্যালু = 255, গ্রিন = 255, ব্লু = 243 ।

তো আমারা যদি মানগুলো আগের সমীকরণে বসাই তাহলে দেখব,,

0.2126×রেড+0.7152×গ্রিন+0.0722×ব্লু
=> 0.2126×255+0.7152×255+0.0722×243
=> 254.1336

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 254.1336>255। এতে সমস্যা।

হওয়ার কথা না। কারণ এট 8(আট)-বিটের luminance ভ্যালুর মধ্যেই তো আছে। তবে এখানেই আসলে গুগল কালার ইঞ্জিনের বাগ। গুগল কালার ইঞ্জিনের এই কনভারশনের প্রাপ্ত পিক্সেলটির luminance -কে পাকনামি করে 0.2126×255 = 54.213 না ধরে, ধরে 55।
0.7152×255 = 182.376 না ধরে, ধরে 183 এবং 0.0722×243 = 17.5446 না ধরে, ধরে 18। এখন। এ তিনটাকে যোগ করলে 55+183+18 = 256 হয় যেটা 255 থেকে বড়ো, এখানেই ঘটনা ঘটে। তখন সেটা error হয়ে যায়। যার ফলে ডিভাইস সেই পিক্সেলে বারেবারে সেই কালারটি শো করতে যায় কিন্তু প্রতিবারে সেই error এর মুখোমুখি হয়ে পড়ে, যার ফলে একটা লুপের মধ্যে পড়ে যায়। অর্থাৎ বারবার রেন্ডর করতে গিয়ে ফেইলড। এতে সেইফ মুড, কর্শ্যোশের মতো ঘটনা ঘটে। তখন রম ফ্ল্যাশশ বা ফ্যাক্টরি রিসেট করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

কোনোভাবে সমস্যায় পড়লে সমাধান:

যদি এখন সবগুলো ডিভাইসের এই ইস্যুটি সমাধান হয়ে গেছে। তবুও তখনকার সমাধান চিলো ফ্যাক্টরি রিসেট। রিকোভারি থেকে রিসেট দিলে অথবা, ADB দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে রম/ওএস ফ্ল্যাশ করলেই হতো। শুধু আপনার ফোনে থাকা ডেটা হানিয়ে যেতো। তাছাড়া কোনো সমস্যা হতো না।

এখন যদি ঔ সময় ছবিটি ব্যবহার করতেই চাইতেন, তাহলে কিছু ব্যাপারগুলো অনুসরণ করলেই হতো

১. যে--কোনো ফটো এডিটিং প্রোগ্রামে ছবিটা নিয়ে কালার প্রোফাইল sRGB করে দিয়ে ব্যবহার করা।

২. যে-কোনো সোশ্যাল সাইটে আপলোড করে, তারপর সেটা ডাউনলোড করে ব্যবহার করা। কারণ, তখন সেসব সাইটগুলো স্বয়ক্রিয়ভাবে ফটোটাকে sRGB-তে কনভার্ট করে নিবে। পরে সেটা ডাউনলোড করে সেট করলে কোনো সমস্যা তৈরি করতো না।

৩. ফোনের গ্যালারিতে ছবিটা নিয়ে একটা স্ক্রিনশট মেরে তারপর সেটাকে সেটা ওয়ালপেপার করলেও হতো। কারণ, স্ক্রিনশট নিলে নতুন একটা ছবি তৈরি করতো, যেটা sRGB-তে হবে আর সেই পিক্সেল ইস্যুটি আর তৈরি হতো না।

এখন এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, গ্যালারিতে ওপেন করলে কিছু হতো না কিন্তু ওয়ালপেপার দিলে হবে কেন? এর উত্তর হচ্ছে, গ্যালারি একটা অ্যাপ (ফার্স্ট পার্টি হোক বা থার্ড পার্টি হোক) সেটার কালার প্রসেসিং আলাদা। কিন্তু যখন ওয়ালপেপার হিসেবে সেট করেন; তখন সেটা Android মেইন মুল অপারেটিং সিস্টেম নিজে রেন্ডার করে, সেজন্যই প্রবলেমটা হয়।

ডার্ক ওয়েব মিথ

মাহতাব মাহদী

ডার্ক ওয়েব নিয়ে আমরা সচরাচর অনেক কথা শুনে থাকি। কিন্তু আমরা অনেকেই সার্ফেস ওয়েব, ডার্ক ওয়েব, ডিপ ওয়েবকে রীতিমতো ভুল বুঝি। চলুন আগে সেটা খণ্ডন করে আসা যাক।

সার্ফেস ওয়েব:

সহজ কথায় সার্ফেস ওয়েব হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের যে অংশ গুগল, বিংয়ের মতো সার্চ ইঞ্জিনে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেগুলো আপনি গুগল, বিংয়ের মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করে খুঁজে বের করতে পারেন। worldwidewebsize.com-এর হিসাবমতে, নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত গুগল এবং বিং সার্চ ইঞ্জিনে মোট 5.63 বিলিয়ন ওয়েব পেইজ ইনডেক্স বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে হিসেবে সার্ফেস ওয়েবের মোট সংগ্রহ এতটুকুই বলা যেতে পারে, যেহেতু এরাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। 5.63 বিলিয়ন কিন্তু কম নয়। তবে ধারণা করা হয়, এটা মোট ওয়েবের মাত্র ৯০ শতাংশ!

ডিপ ওয়েব:

সহজ কথায় ডিপ ওয়েব হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের যে অংশ গুগল, বিংয়ের মতো সার্চ ইঞ্জিনে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। অর্থাৎ, এসব ওয়েব পেইজগুলো সার্চ ইঞ্জিনে ইনডেক্স করা থাকে না। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, পেইজগুলো সার্চ ইঞ্জিনে ইনডেক্স করে কে? উত্তর হলো, যে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে, সে। বিভিন্ন ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন টুল অফার করে কাজটি করার জন্য। সেই টুল ব্যবহার করে ডেভেলপার তার সাইট গুগলের মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করে।

মূল কথায় আসা যাক। যেহেতু সার্চ ইঞ্জিনে অন্তর্ভুক্ত করা থাকে না, সেহেতু সেসব ওয়েব পেইজ এক্সেস করার জন্য আপনাকে সেই পেইজের URL বা সাইটের IP address জানতে হবে। আবার প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ডও লাগতে পারে; এটা উক্ত সাইটের ওপর নির্ভর করে। তাহলে আপনি সেটা এক্সেস করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে ধরুন toru-lota-gulmo.cf সাইটটি। এটা কোনো সার্চ ইঞ্জিনে অন্তর্ভুক্ত করা নেই বা আপনি সার্চ করে পাবেন না। এখানে মোট ৯৫-৯৬টা ওয়েব পেইজ আছে যেগুলা কোনো সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে পাবেন না। অতএব, এটা ডিপ ওয়েবের অংশ, আপনি সাইটটি শুধু toru-lota-gulmo.cf অথবা এর IP address (172.67.168.176, 104.27.156.216, 104.27.157.216) ব্যবহার করে খুঁজে পাবেন যেহেতু সাইটের এক্সট্রা কোনো প্রটেকশন দেওয়া নেই।

ডার্ক ওয়েব:

ডার্ক ওয়েব হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের এমন একটি অংশ যেখানে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার, কনফিগারেশন এবং অথেনটিকেশন প্রয়োজন হয়। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের অংশ হলেও friend-to-

friend (F2F) peer-to-peer (P2P) protocol এর মতো overlay network ব্যবহার করে কমিউনিকেশন করে, যেটা সার্চ ইঞ্জিন বা URL জানা থাকলেও সাধারণ ব্রাউজারের কনফিগারেশন দিয়ে প্রবেশ করা যায় না। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন overlay network protocol ব্যবহার করে বিভিন্ন সার্ভিস তৈরি হয়েছে এবং এদের সিকিউরিটি অত্যন্ত শক্ত। এর ফলে ভালো, খারাপ, গোপন বিভিন্ন কাজে সেগুলো ব্যবহার হয়ে এসেছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ডার্ক ওয়েব নেটওয়ার্ক হচ্ছে Tor (Onion routing)। এছাড়াও I2P, Freenet, AnoNet, GNUnet, IPFS, সরকারি ডার্ক নেট সিস্টেম Riffle উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আগে StealthNet, WASTE, Turtle F2F এর মতো বিভিন্ন সার্ভিস ছিল, যেগুলো এখন আর নেই। মজার ব্যাপার হলো আপনি নিজেও নিজস্ব anonymous network তৈরি করতে পারবেন।

বর্তমানে ডার্ক ওয়েব নিয়ে প্রচলিত বহু মিথ বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হলো, আসলে সেগুলো কি সত্য? অনেক ক্ষেত্রেই না। এখানে আমি প্রথমে ডার্ক ওয়েব নিয়ে প্রচলিত মিথ ও ভুয়া তথ্য নিয়ে আলোচনা করব এবং এর ডিবাঙ্ক করব। আর্টিকেলের শেষদিকে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ডার্ক ওয়েব আসলে কী।

ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করা বেআইনি

এটা অনেক প্রচলিত একটা মিথ। ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করা কখনোই বেআইনি ছিল না এবং পরবর্তীতে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। ডার্ক ওয়েব আসলে আমরা যেমনটা ভাবি সেরকম নয়। ডার্ক ওয়েবে অনেক ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ডার্ক ওয়েবের মাত্র 45% ওয়েবসাইট বেআইনি, বাকি সব অফিশিয়াল এবং সবার জন্য উন্মুক্ত। বাকি সবগুলো ওয়েবসাইট বেআইনি হওয়ার কারণও কিন্তু বেআইনি কর্মকাণ্ড করা নয়। আর আপনি চাইলেই বেশিরভাগ সাইটে প্রবেশ করতে পারবেন না, কারণ সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া যেসকল অবৈধ সাইট বর্তমান সময়ে গোপনে সচল রয়েছে বা নতুন কোনো অবৈধ সার্ভিস শুরু হয়েছে, সেগুলো যেহেতু সাধারণ মানুষ জানে না তাই সেসকল অবৈধ সাইটে কোনোমতে প্রবেশও করতে পারবে না।

ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করা বিপজ্জনক, কারণ এটাতে প্রবেশ করলে আপনার কম্পিউটার হ্যাক হয়ে যাবে

না, এমনটা কখনোই হবে না। এটা ভুয়া একটা কথা। কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলেই কখনো কম্পিউটার হ্যাক হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাকে অ্যালাউ পারমিশন দেন। আপনি যদি সেই ওয়েবসাইটে

সন্দেহজনক এক্সেস না দেন ও কোনো ফাইল ডাউনলোড না করেন, তবে আপনার কম্পিউটার হ্যাক হওয়ার কোনো উপায় নেই।

এটা শুধু ক্রিমিনালদের জন্য

ডার্ক ওয়েবে সব ক্রিমিনালদের বাস, এখানে হ্যাকাররা থাকে, খুনি ভাড়া পাওয়া যায় ব্লা ব্লা ব্লা। নারে ভাই, এত সোজা না জিনিসগুলো। এখানে ইন্টারনেট সিকিউরিটিরও বিষয় আছে। ডার্ক ওয়েবেও অনেক ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০৬৫ সালে এমন গুঞ্জন জোড়ালো হয়েছিল যে ডার্ক ওয়েবে ভাড়া করা খুনির দ্বারা অনেকে খুন হচ্ছে–যার কোনো সত্যতা পুলিশ পায়নি। আর শুধু হ্যাকাররা এখানে থাকে না। হ্যাকিংয়ের জন্য বেশ কিছু সাইট আছে এটা সত্য, কিন্তু বেশিরভাগই ইথিকাল হ্যাকিংয়ের। ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাররা ডার্ক ওয়েবে কোনো দোকান খুলে বসেনি যে যে-কেউ এক্সেস করতে পারবে। তারা সেখানে থাকলেও তাদের কমিউনিটি জানবে, আপনি আমি জানব না। সো, প্রবেশও করতে পারব না।

ডার্ক ওয়েবে রেড রুম আছে

রেড রুম তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠা পায় ২০৬৩ সালের দিকে। এর থিওরিটা হলো–এটা একটা লাইভ interactiveইন্টার‌্যাক্টিভ ভিডিয়ো যেখানে আপনি লাইভ কারো দ্বারা কোনো খুন করতে পারবেন বা কাউকে টর্চার করতে পারবেন।

আসলে কথাটার কোনো ভিত্তি নেই এবং এটা হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ ডার্ক ওয়েবে এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্ল্যাটফর্মের খোঁজ মেলেনি। আর ইন্টারনেটে খুনি ভাড়া করার যে মিথটা শোনেন, ওটাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেন জানেন? রেড রুম মানে একটা লাইভ ভিডিয়ো। অর্থাৎ, আপনাকে লাইভ স্ট্রিমিং করতে হবে। আর কোনো না কোনোভাবে সেটা জনসম্মুখে আসতই, যেমনটা বিভিন্ন ড্রাগ ট্র্যাফিকের ডার্ক সাইট এসেছে। সে হিসেবে বলা যায়, রেড রুমের কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা শুধু একটা ইন্টারনেট গুজব।

ডার্ক ওয়েব জগৎ পুরোটাই অন্ধকার

না! এটা আসলে অন্ধকার না। যদি আপনি শুধু Tor বা Onion network এর কথাই ধরেন, এখানে সবই যে শুধু লোকাল ওয়েবসাইট তা কিন্তু নয়। এখানে অনেক অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে। ফেসবুকেরও অফিশিয়াল .onion সাইট আছে। সেটাতে প্রতি মাসে ১ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ভিজিট করে। অনেক সাধারণ মানুষ আসে এখানে। শুধু যে বেআইনি কাজ হয়, তা কিন্তু নয়। ৭০% ওয়েবসাইট পাবলিক ও পার্সোনাল সার্ভিস, যেগুলো বৈধ। ডার্ক ওয়েবের জন্য ব্যাংকিং সিস্টেম আর ইমেইল সিস্টেমও আছে। এটা পাবলিকলি ওপেন। এটার নামে ডার্ক আছে মানেই যে এটা অন্ধকার জগৎ, সেটা কল্পনা করলে আপনি ভুল করবেন।

ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করা খুব কঠিন

না, ব্যাপারটা একদমই সেরকম নয়। আপনি নির্দিষ্ট ডার্ক ওয়েব নেটওয়ার্কের জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে খুব সহজেই ঢুকতে পারেন। যেমন: আপনি যদি Tor protocol বা Onion network-এ প্রবেশ করতে চান, তাহলে আপনার প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী torproject.org/download ডাউনলোড করে ইনস্টল করে এক ক্লিকে onion routing-এ কানেক্ট হয়ে যান। তারপর যে-কোনো সাইটের URL দিয়ে দিয়ে ঢুকে যান। যেমন: ফেসবুকের জন্য অ্যাড্রেসবারে facebookcorewwwi.onion লিখে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন। আপনি যদি আরেকটি ডার্ক ওয়েব নেটওয়ার্ক I2P-তে ঢুকতে চান, তাহলে geti2p.net/en/download থেকে আপনার প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী সফটওয়্যার ডাউনলোড করে, ইনস্টল করে এক ক্লিকে কানেক্ট হয়ে যান। তারপর URL দিয়ে প্রবেশ করুন। যেমন: FireRabbit এর I2P সাইটে প্রবেশ করতে লিস্ট থেকে firerabbit.i2p সিলেক্ট করে খুব সহজেই ঢুকতে পারবেন।
এভাবে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন তথাকথিত মিস্ট্রিয়াস ডার্ক ওয়েবে।

ডার্ক ওয়েবে সবাই গোপন থাকতে পারে

আপনি চাইলেই হ্যাকিং করছেন, পর্নোগ্রাফিক সাইট চালাচ্ছেন, খুন করে যাচ্ছেন, কেউ কিছু বলবে না? ইশ্! ডার্ক ওয়েবে আপনি অ্যানোনিমাস থাকেন এটা সত্য, তবে সুদূর পরিকল্পনা করে চাইলেই আপনাকে ধরা সম্ভব। ২০১৭ সালের দিকে Tor ডার্ক ওয়েবের সবচেয়ে বড়ো ব্ল্যাক মার্কেট সাইট, যার নাম ছিল silk road। এর প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ তিনি অবৈধ বিজনেস করছিলেন। ২০১১-২০১৫ সালে ৩০০ মানুষকে ডার্ক ও ডিপ ওয়েবে বেআইনি কাজকর্ম করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে হিসেবে সহজেই বলা যায়, পরিকল্পনা করে এগোলে ডার্ক ওয়েব থেকেও ক্রিমিনালদের ধরা সম্ভব।

Tor সহ বিভিন্ন ডার্ক ওয়েবে এফবিআই এরও কিছু সাব ডোমেইন আছে। তারা ম্যালওয়্যার ইউজ করে ডার্ক ওয়েব হ্যাকারদের থেকে নিজেদের তথ্যকে সুরক্ষিত রাখতে।

তাই আপনি চাইলেই যা ইচ্ছা করে ফেলবেন তা কিন্তু নয়। Tor আপনার আইপি অ্যাড্রেস দেখায় না মাত্র। তবে আপনাকে ট্রেস করার হাজারো সূত্র আপনি ফেলে আসেন। সেগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আপনাকে ধরে ফেলবে, এটা অসম্ভব না।

ডার্ক ওয়েবে চাইলেই আপনি যে-কোনো কিছু কিনতে পারবেন

'মানি হেইস্ট' টিভি সিরিজের মতো ব্ল্যাক মার্কেট থেকে বোমা, অস্ত্র কিনে ফেলা সম্ভব কি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। ডার্ক ওয়েবে কিছু অফিশিয়াল মার্কেটিং সাইট আছে Alibaba, ebay-এর মতো। এরা নিশ্চয়ই বেআইনি জিনিস অ্যালাউ করবে না। বেআইনি জিনিস বিক্রির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ব্ল্যাক মার্কেট, যেটা একসময় সিল্ক রোড লিড করত। অ্যামেরিকান সার্ভিস প্রোভাইডার ও ইন্টারনেট সিকিউরিটি সার্ভিস মিলে তা বন্ধ করে দেয়। সিল্ক রোডের পরেও ২টা সাইট ৭ মাস ধরে তাদের বিজনেস কন্টিনিউ করতে পেরেছে, তবে ২০১৮ সালে সে দুটো সাইটও রিমুভ করে দেওয়া হয়। এখানে আপাতত সে অর্থে ব্ল্যাক মার্কেট সাইট নেই, আর থাকলেও সেটা পাবলিকলি ভিজিবল নয়।
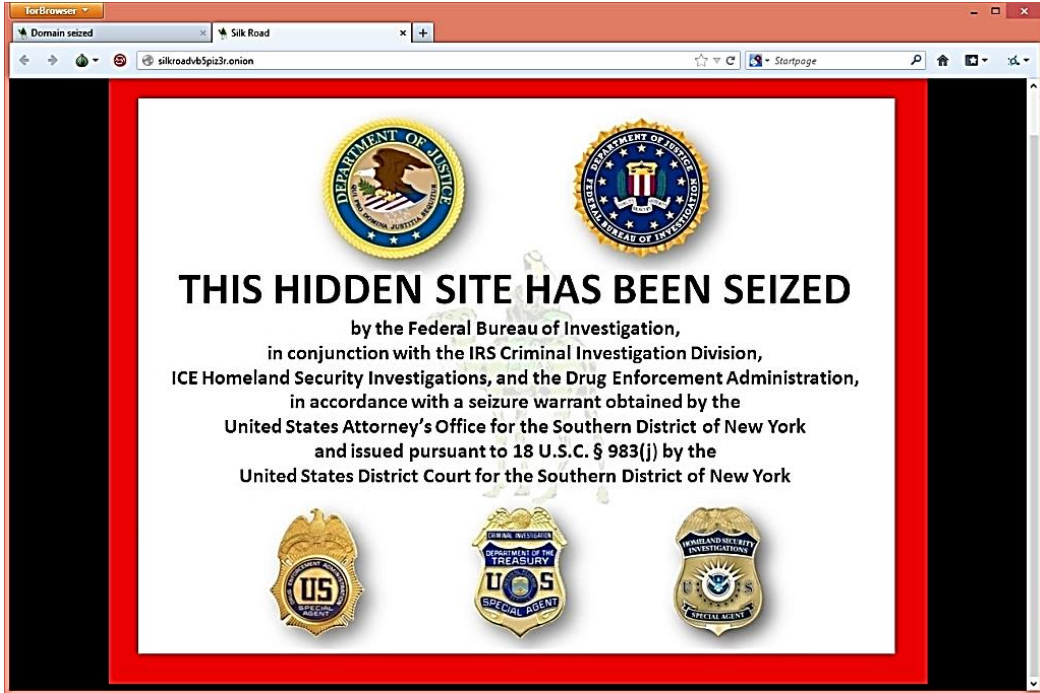
পরিশেষে, আপনি যদি একটু বেশি প্রাইভেসি চান, এটা ব্যবহার করতে পারেন–কোনো সমস্যা নেই। তবে হ্যাঁ, সাধারণ ওয়েবের চাইতে এখানে অফেন্সিভ কন্টেন্ট বেশি। ডার্ক ওয়েবকে বলা হয় 'A space beyond the control of individual states.' এখানে কারো ভয় ছাড়াই আপনি নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন–শুধু এটুকুই।

ডার্ক ওয়েব নিয়ে আর কোনো মিথ আসুক বা চলমান থাকুক তা অবশ্যই কাম্য নয়। লোকজনের বিভিন্ন অতিরঞ্জিত কথার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে এটা ভয়ের ও আতঙ্কের নামে পরিণত হয়েছে। তাই আমাদের উচিত সত্যটা জানা ও সবাইকে জানানো।

আরিফ আজাদ সমীপে

মনজুরুল ইসলাম রিফাত

আরিফ আজাদ সাহেব বাংলাদেশের একজন বেস্টসেলার লেখক। সম্প্রতি উনার আরজ আলি সমীপে বইয়ের শেষের অধ্যায়টি পড়েছি, "বিবর্তন" নিয়ে লেখা অংশটুকু। তিনি যেরকম আক্রমনাত্মক ভঙ্গিমায় লিখেছেন, তাতে আমি বিস্মিত, শিহরিত। ফ্লাট আর্থ সোসাইটির লোকেরা যেভাবে নাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে, উনার লেখাগুলোও ঠিক সেরকম, বিবর্তনের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন যাচাই বাছাই ছাড়াই মানুষজন সেগুলো গ্রহণও করে। এজন্যই কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সময় কম, তাই সবচেয়ে দৃষ্টিকটু অংশগুলো নিয়েই লিখছি।

তিনি লিখেছেন, "আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা এবং প্রতারণার নাম বিবর্তনবাদ"

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি যে বিষয়ে কাজ শুরু করেছি সেটা বলি। Caenorhabditis elegans নামের নেমাটোডা পর্বের একটি ক্রিমির উপরে আমার কাজ। একই পরিবেশ, তাপমাত্রা ও খাদ্যের প্রভাবে c. elegans এর locomotion অর্থাৎ চলাফেরা কিভাবে বিবর্তিত হয় এটা দেখার জন্য ২৪০ টি প্রজন্ম পর্যন্ত প্রজনন করা হয়েছে। প্রতি প্রজন্মে দশ হাজার করে ক্রিমি উৎপাদন করা হয়েছে। এরমধ্যে মেইন পপুলেশন হিসেবে নেয়া হয়েছে এক হাজার। এভাবে ৭ বছরে ২৪০ টা প্রজন্ম। আর এই ওয়ার্মগুলো কিভাবে তুলে জানেন? রীতিমত একটা একটা করে তুলতে হয়, অনেক শ্রমসাধ্য কাজ। এই ভিডিও দিলাম, দেখে নিতে পারেন। আর আপনি বলেন এগুলো প্রতারণা? প্রতারণার জন্য মানুষ এত শ্রম দেয়? এত কষ্ট করে?

আপনি বলেছেন, "বিবর্তনের পক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।" অথচ এর প্রমাণ এত বেশি যে লিখতে চাইলে আস্ত একটা বই লেখা যাবে। এই লিঙ্কে গিয়ে পড়ে নিন, কত প্রমাণ চান।

এরপর আপনি বলেছেন "পশ্চিমা বিশ্বে পদোন্নতি পেতে হলে, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান পেতে হলে চোখ বন্ধ করে বিবর্তন বিশ্বাস করতে হয়। একজন বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলেও সেটা প্রকাশ করতে পারেন না তার সম্মান, মর্যাদা, ইত্যাদি হারানোর ভয়ে।"

সিরিয়াসলি ভাই? একথা শুনলে নারায়ণের কর্তৃপক্ষও লজ্জা পাবে। যেদেশে ফ্লাট আর্থ সোসাইটির মহাসম্মেলন হয় সেদেশে ভয়ে বিবর্তন বিশ্বাস করবে? সদ্য সাবেক হওয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আপনার কি মনে হয়? ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ইন্টারভিউয়েই স্বীকার করেছেন যে বিশ্বাস করেন না। আপনি এই আজগুবি তথ্য কোথায় পেয়েছেন ভাই?

আপনি এর স্বপক্ষে "অনুজীব বিজ্ঞানী" জোনাথন ওয়েলসের উক্তি দিলেন। উনি বলেছেন, বিবর্তনের বিপক্ষের প্রমাণগুলো অদৃশ্য করে ফেলা হয়,

ধামাচাপা দেয়া হয়। তো আমি এই অণুজীব বিজ্ঞানীর প্রোফাইল ঘাটাঘাটি করে দেখলাম। উনার মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছিলো রিলিজিয়াস স্টাডিসে। তিনি অনেক আগে থেকেই এন্টি ইভুল্যুশনিস্ট। এরপর ১৯৯৪ সালে তিনি মাইক্রোবায়োলজিতে সেকেন্ড পিএইচডি নিয়েছেন, উনার পাবলিকেশন তিনটি, মাত্র একটিতে ফার্স্ট অথর। অর্থাৎ ডিগ্রি নিতে যতটুকু কাজ করতে হয় ততটুকু। অথচ এই ডিগ্রি নিয়ে এরপর তিনি যোগ দিয়েছেন ডিসকভারি ইন্সটিটিউটে, যারা ক্রমাগত বিবর্তনের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করে। এরপর গবেষণার সাথে নূন্যতম সম্পর্ক নেই, কোথাও কোন কাজের খবর নেই, অথচ তিনি নাম প্রকাশ করছেন অণুজীব বিজ্ঞানী হিসেবে। অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন? উনার প্রথম পিএইচডির ডিসারটেশন টপিক দেখেন,

"Wells, John Corrigan. 1986. CHARLES HODGE'S CRITIQUE OF DARWINISM: THE ARGUMENT TO DESIGN (EVOLUTION, THEOLOGY). Ph.D. Dissertation, Yale University, 265 pages."

ডিসারটেশন পেপারের কিছু অংশ পড়ে দেখেছি। পরতে পরতে ঘৃণা, ঠিক আপনি যেমন প্রকাশ করেছেন সেরকম।

পেপারমথের উদাহরণটি প্রমাণ করে আপনি বিবর্তনের কিছুই বোঝেননি। "প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে পরিবর্তিত হওয়া" এটি ল্যামারকের হায়পোথেসিস। বিবর্তনের মেইন বেসিস হচ্ছে রিপ্রোডাকশন। সাম্প্রতিক করোনাভাইরাস নিয়ে উদাহরণ দিই।

ধরেন, করোনাভাইরাসের আক্রমণে দুর্বল সব মানুষ মারা গেলো। এরপর যারা সুস্থ হলো, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মে কিছুই হবে না। কারণ তাঁদের ইমিউন সিস্টেম বিবর্তিত হয়েছে। এভাবে অতীতের অনেক ভয়াবহ রোগ পরিণত হয়েছে আজকের সাধারণ সর্দিকাশিতে। এটা বিবর্তনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

এরপর বললেন, কোন মিউটেশন উপকারী নয়। সিরিয়াসলি ভাই? আপনি এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এর কথা শোনেননি? প্যাথোজেনরা কিভাবে শক্তিশালী হয় জানেন না? ইদানীং মশার কয়েলে মশা মরে না, এটা দেখেন না? কো-এভুলিউশনের চমৎকার উদাহরণ হতে পারে হিউম্যান-প্যাথোজেন রিলেশনশীপ। একদিকে মানুষের যেমন সাধারণ রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ছে, অন্যদিকে ভাইরাস মিউটেটেড হয়ে ফেরত আসছে। করোনাভাইরাস কিন্তু অনেক আগে থেকেই ছিলো। কভিড-১৯ একটি নতুন স্ট্রেইন।

"কোন মিউটেশনই উপকারী নয়" এই কথার রেফারেন্স দিয়েছেন B.G Ranganathan এর। উনার শিক্ষাগত যোগ্যতা? তিনি ব্যাচেলর্স ডিগ্রি নিয়েছেন বাইবেল স্ট্যাডিজের উপরে এবং মাইনর ছিলো বায়োলজি, ব্যাস। মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত নেই। অথচ উনি মন্তব্য করেছেন ইভুল্যুশনারি বায়োলজির কোর একটি টপিক নিয়ে, মিউটেশন, অতি চমৎকার!

আপনি বলেছেন, "দীর্ঘ সময় ধরে বিবর্তনবাদীরা মাছির উপরে মিউটেশনের কাজ চালিয়ে মাছির একটি নতুন প্রজাতি তো দূরের কথা, একটা নতুন এনজাইমও এখন পর্যন্ত তৈরি করে দেখাতে

পারেনি।" বিশ্বাস করেন আরিফ আজাদ ভাই, একথা যদি আমার ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষের কোন ছাত্রও শুনে তাহলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাবে। প্রমাণ দেয়ার আগে প্রজাতির বায়োলজিক্যাল সংজ্ঞাটা বলে নিই,

"A biological species is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile and viable offspring."

লক্ষ্য করুন, এখানে দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রজননে সক্ষম এবং সুস্থ স্বাভাবিক সন্তান জন্মদান করতে পারতে হবে। এজন্য দৈহিক গঠনে অনেক পার্থক্য থাকার পরও গ্রেইট ডেন এবং পুডলস কুকুরকে আমরা একই প্রজাতি বলি, অথচ সিংহ এবং বাঘকে একই প্রজাতি বলিনা। কারণ? বাঘ-সিংহের মিলনে লাইগার জন্ম নিলেও সে প্রজননে সক্ষম হয় না।

এখন ফিরে আসি মাছির ক্ষেত্রে। গবেষণায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, drosophila melanogaster। কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে ল্যাবে এই মাছি থেকে উৎপন্ন করা হয়েছে drosophila synthetica. এই আর্টিকেলটি পড়ে নিতে পারেন।

আর বললেন, কিছুই পরিবর্তন করতে পারে নি? আপনার কথা সত্য হলে আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিশাল একটা ফিল্ড, "জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং" মূল্যহীন হয়ে যায়। জিনেটিক মার্কারের নাম শুনেছেন সম্ভবত। আমরা drosophila melanogaster বা c. elegans এর পুরো জিনোম সিকুয়েন্স জানি। তো আপনি গবেষণার সময় কোনটা কোন মাছি চিনবেন কিভাবে? এজন্য জিন একটু পরিবর্তন করে চোখ লাল করে দেয়া হয়, কখনো পাখা ট্রান্সপারেন্ট করে দেয়া হয়। c. elegans এর রঙ ফ্লোরিসেন্ট করে দেয়া হয় যেন জ্বলজ্বল করে। আপনি যদি মনে করেন সব ষড়যন্ত্র, আমাদের ল্যাবে আপনাকে আমন্ত্রণ, কফি খেতে খেতে সব ঘুরে দেখাবো।

এখানে আপনি Michel Pitman রেফারেন্স দিয়েছেন। আবার ঘাটাঘাটি করে দেখলাম তিনি ক্যামব্রিজের একজন স্কুলশিক্ষক, যিনি ক্লাসে বায়োলজি পড়ান। প্রত্যাশিতই ছিলো। মাইকেল পিটম্যানকেও আমার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাবেন মিউটেশন কিভাবে ঘটে সেটা নিজ চর্মচক্ষে দেখার জন্য।

এরপর আসি আপনার ফসিল গবেষণায়। আপনার লেখা অনেকটা এরকম যে বিজ্ঞানীরা অনেক কষ্টে একটা করে ফসিল নিয়ে আসে এবং সাধারণ পাবলিকের কাছে ধরা খায়। আপনার উল্লেখিত ফসিলের ঘটনা ব্যাখ্যা করেই শুরু করি।

পিল্টডাউন ম্যান: ১৯১২ সালে চার্লস ডওসন নামক একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ জালিয়াতির মাধ্যমে পিল্টডাউন ম্যান তৈরি করেন। এই জালিয়াতির কারণ কি? নিজেকে বিখ্যাত করে তোলা। যদিও শুরু থেকেই গবেষকরা এটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৯১৩ সালেই লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক David Waterston ন্যাচার জার্নালে তার সন্দেহ প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে ফ্রেঞ্চ প্রত্নতত্ত্ববিদ Marcellin Boule একই কথা বলেন। এরপর

আমেরিকান প্রাণীবিজ্ঞানী Gerrit Smith Miller ও সহমত প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে জার্মান গবেষক Franz Weidenreich.

ফসিল পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এটি আধুনিক মানুষের ক্রেনিয়াম ও ওরাংওটাং এর চোয়ালের সমন্বয়ে বানানো।

অবশেষে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে Kenneth Page Oakley, Sir Wilfrid Edward Le Gros Clark and Joseph Weiner অফিশিয়ালি প্রমাণ করেন যে এই পিল্টডাউন ম্যান সাজানো। এইযে এতগুলো মানুষ, সবাই কিন্তু বিবর্তন গবেষক, সবারই অসামান্য অবদান আছে বিবর্তন গবেষণায়। তাহলে কেন তাঁরা পিল্টডাউন ম্যানের জালিয়াতি ফাঁস করলেন? এই সূত্র থেকে দেখে নিতে পারেন।

নেব্রাস্কা ম্যান: এই নেব্রাস্কা ম্যান ছিলো Dr. Henry Osborn এবং Dr. William D. Matthew এর অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই নেব্রাস্কা ম্যান গবেষকদের কাছে কখনোই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিলো না, যতটা বিবর্তন বিরোধীরা এটা নিয়ে মাতামাতি করেন। এটা দেখে নিতে পারেন।

ও ভালো কথা আপনি যে William Bryan এর গবেষনার কথা বললেন, উনি মোটেও কোন গবেষক ছিলেন না। উনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ও ধর্মপ্রচারক, যিনি বিবর্তনবিরোধী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত। ১৯২৫ সালে স্কুলে বিবর্তন পড়ানো বন্ধের জন্য করা কুখ্যাত Scopes Trial এ তিনি প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রদান করেন। উনার জীবনী উইকিপিডিয়াতেই পাবেন।

ওটা বেংগা: “বিবর্তনবাদীরা ওটা বেংগাকে শেকল দিয়ে ধরে নিয়ে আসে” এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। ওটা বেংগাকে কে নিয়ে আসে জানেন? Samuel Phillips Verner নামের একজন খ্রীস্টান মিশনারি। চিড়িয়াখানায় পয়সা কামানোর আশায় তাঁকে অন্যান্য প্রাণীর সাথে প্রদর্শন করা হয় যার সাথে বিবর্তন গবেষকদের দূরবর্তী সম্পর্ক পর্যন্ত ছিলো না। অথচ মজার ব্যাপার, খ্রীস্টান ধর্মযাজকরাই তখন ডারউইনের পেছনে উঠে পড়ে লাগেন। জেমস গরডন নামক একজন পাদ্রী বলেন,

“The Darwinian theory is absolutely opposed to Christianity, and a public demonstration in its favor should not be permitted.”

অথচ আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী বা গবেষক বলেননি যে আমাদের homo গণের অন্য কোন প্রজাতি গত চল্লিশ হাজার বছরে জীবিত ছিলো। সেখানে বিবর্তন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন এমন কেউ ওটা বেংগাকে মানুষ ও উল্লুকের মধ্যবর্তী বলবেন সেটা অবিশ্বাস্য।

এর মধ্যে আপনি আরেকটি তথ্য গোঁজামিল দিয়েছেন। ওটা বেংগাকে ওই চিড়িয়াখানা থেকে উদ্ধার করেন গরডনই। তাঁকে ইংরেজি শেখানো হয়, তার জন্য ফান্ড তোলা হয়, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার দেশে ফেরার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। প্রবল ডিপ্রেশনে পড়ে সে আত্মহত্যা করে

১৯১৬ সালে, চিড়িয়াখানায় প্রদর্শনের বারো বছর পর।

ওটা বেংগাকে চিড়িয়াখানায় প্রদর্শন নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য একটি কাজ। কিন্তু আপনি এজন্য বিবর্তন বিজ্ঞানীদের দোষ দিচ্ছেন, যা রীতিমত হাস্যকর।

এরপর আপনি নিয়ে আসলেন আরও দুটি ফসিল, এবং এর মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করলেন যে বিবর্তন মিথ্যা। এইযে নীচের লিস্টসহ ছয় হাজারের বেশি ফসিল সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ হয়তো, শ্রেণীবিন্যাসে ভুল হতে পারে, পরীক্ষানিরীক্ষায় পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে সবগুলো মিথ্যা, জোচ্চুরি! আর এই ভুলগুলো কোন ধর্মযাজক কিন্তু বের করেননি, বের করেছেন জীববিজ্ঞানীরাই! রোগ নির্ণয়ের সময় কি ভুল হয় না? তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞান মানেই ভুয়া?

Java Man (Homo erectus) (1891)
Heidelberg Man (Homo heidelbergensis) (1907)
Peking Man (Homo erectus) (1921)
Rhodesian Man (Homo rhodesiensis) (1921)
Taung Child 1 (Australopithecus africanus) (1924)
Galilee Man (Homo heidelbergensis) (1925)
Mojokerto child (Homo erectus) (1936)
Mrs. Ples (Australopithecus africanus) (1947)
Saldanha man (Homo rhodesiensis) (1953)
nutcracker man (Paranthropus boisei) (1959)
Chellean Man (Homo erectus) (1960)
Tautavel Man (Homo erectus) (1971)
AL 288-1 (Lucy) (Australopithecus afarensis) (1974)
Dali Man (Homo erectus or Homo heidelbergensis or early Homo sapiens) (1978)
Turkana Boy (Homo ergaster) (1984)
Wushan Man (Homo erectus) (1985)
Altamura Man (Homo neanderthalensis) (1993)
Scladina (Homo neanderthalensis) (1993)
Ardi (Ardipithecus ramidus) (1994)
Eurydice (Paranthropus robustus)(1994)
Boxgrove Man (Homo heidelbergensis) (1994)
Ceprano Man (Homo cepranensis /Homo heidelbergensis)(1994)
Daka (Homo erectus) (1997)
Madam Buya (Homo heidelbergensis or Homo erectus) (1997)
Obi-Rakhmat (Homo neanderthalensis) (2003)
Hobbit (Homo floresiensis) (2003)

এখানে গুটিকয়েক লিস্ট দিয়েছি। নামকরণ হয়েছে ৬০০০ এর কিছু বেশি, গবেষণাগারে আছে এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। মহাকাশ গবেষণা শুনলেই যেমন আমাদের মাথায় আসে NASA, তেমনি বিবর্তন গবেষণায় আসে Smithsonian institute. লিংক দিলাম, লিংকে ঘুরে দেখে

আসুন এ পর্যন্ত কি কি ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, কতটুকু আমরা জানতে পেরেছি, কতটুকু আমরা জানি না, এখনো ওপেন রিসার্চ কোশ্চেন কি কি, সব দেখতে পারবেন। So, Please!! Educate yourself!! এখন থেকে সুত্র দেখে নিকে পারেন।

এরপর আপনি Solly Zuckerman এর গবেষণার কথা বলেছেন। প্রথমত, অস্ট্রালোপিথেসাইনরা কখনোই দু'পায়ে হাঁটতো না, এই তথ্যটি ভুল। আপনার দেয়া, বইটি লিবজেন ও সাই হাবে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না। এক জায়গায় শুরুর কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে মনে হয়েছে এটি মূলত পলেটিক্যাল সায়েন্সের বই। বইয়ের পুরো নাম, "Beyond the ivory tower: the frontiers of public and private science"

যেহেতু আমি বইটি পড়তে পারিনি, তাই এটা নিয়ে মন্তব্য করবো না। কিন্তু কোথায় পনেরো বছরের গবেষণার ব্যাপারে পড়তে পারবো কাইন্ডলি বলবেন আমাকে? কিংবা বইটিতে যেখানে গবেষণার কথা লেখা আছে সেই পৃষ্ঠার ছবি?

তবে আমি এটুকু জানি, Solly Zuckerman এর ক্লেইমটা ১৯৭০ সালেই ভুল প্রমাণিত হয়েছিলো, সেটা লুসিকে (australopithecus afarensis) খুঁজে পাওয়ার আগেই।

এরপরে আসি, Charles E. Oxnard এর বিষয়ে। আপনি কি Oxnard এর ১৯৭৫ সালের পেপার নিজে পড়েছেন? উনি কোথায় অকপটে বলেছেন যে দুই পায়ে হাঁটতো না? আমি এক্স্যাকটলি উনার কোটেশনটি দিচ্ছি,

"while probably bipedal, australopithecines did not walk identically to modern humans"

উনি অন্য কোথায় অন্য কথা বলে থাকতে পারেন, সেটি জানি না। তবে উনার মেইন আর্গুমেন্ট ছিলো, অস্ট্রালোপিথেকাসের সাথে মানুষের চেয়ে এইপের সাদৃশ্য বেশি, যেটার বিপক্ষে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই অবস্থান নিয়েছেন। কেননা, Oxnard এর গবেষণা মূলত ছিলো মাল্টিভ্যারিয়েট এনালাইসিস ও সিমুলেশন নির্ভর, যেখানে অনেক কমপ্লেক্স ফ্যাকটরকে তিনি ইগ্নোর করেছেন।

এখন আমি আসি আপনার "১৯৯৪ সালে Holly Smith এর নিখুঁত গবেষণা" নিয়ে। আমি শিউর এই পেপারটিও আপনি নিজে পড়ে দেখেননি।

এইযে আমি সংযুক্ত করলাম সাইহাবের লিংক, পুরো পেপারটি এখান থেকে ফ্রিতে পড়তে পারবেন।

উনি এক প্রান্তে হোমো সেপিয়েন্স রেখে অপরপ্রান্তে আফ্রিকান এইপসদের রেখে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক মানুষের সাথে সাদৃশ্য বেশি erectus এবং neanderthal দের। অপরদিকে habilis এবং Australopithecus afarensis এর সাদৃশ্য বেশি এইপদের দিকে। কিন্তু পুরো পেপারের কোথাও তিনি বলেননি, homo habilis হোমোই না।

আমি রীতিমত ভিমড়ি খেয়েছি হোমো ইরেকটাসের কনফারেন্সের আষাঢ়ে গল্পে। নিজে যখন লিখেছিলেন তখনো এই কথা বিশ্বাস করেছিলেন ভাই? ১৮৯১ সালে Pithecanthropus erectus

আবিষ্কার হওয়ার পর ১৯৯১ সালে এই আবিষ্কারে একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে হোমো ইরেক্টাসের রিসার্চ নিয়ে Senckenberg international conference হয়। আর আপনি বলেছেন হোমো ইরেকটাস আছে কি নাই এ নিয়ে বিতর্ক হয়? বিজ্ঞান কি বিতর্কের জায়গা? যে সম্মেলনে বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত নিবে যে হোমো ইরেক্টাস বলে কিছু ছিলো না? মানে ভোটের মাধ্যমে বিল পাশ হবে যে হোমো ইরেকটাস আছে কি নেই? সিরিয়াসলি?

এইযে ধরেন আপনার Senckenberg এর আদি ও আসল ওয়েবসাইট। বের করে দেখান কোথায় লেখা আছে যে "বিশ লক্ষ বছরে একমাত্র হোমো সেপিয়েন্সই অন্তর্ভুক্ত?"

আপনি লিখেছেন, "বিবর্তনবাদী দৃশ্যপটের প্রত্যেক পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ধাপ্পাবাজি আর জালিয়াতির গল্প"

কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন ভাই? আপনার প্রত্যেকটি তথ্যই বিভ্রান্তিমূলক। এরপরেও আপনাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিলাম, হয়তো যেখান থেকে জেনেছেন সেই উৎসটি ভুল। কিন্তু নিজের কাছে সৎ হয়ে, নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, আপনি যা লিখছেন তা কি পুরোপুরি জেনে-বুঝে লিখছেন? আপনার অসংখ্য অনুসারী বাংলাদেশে, যারা আপনার কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করে। তাদের কাছে সঠিক তথ্যটি পৌঁছানো কি আপনার নৈতিক দায়িত্ব নয়?